স্মৃতিকথা

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৮

তিন টাকা আট আনা

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি এম. লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত; ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, বাণী-শ্রী প্রেস
শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত; শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রচ্ছদপট চিত্রিত।

রায় বাহাদুর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস, ও. বি. ই.

বন্ধুবরেষু

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের নিকট 'স্মৃতিকথা' দ্বিতীয় পর্বের জন্য ভূমিকা চাহিলে তিনি বলেন, বর্তমান দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বের সহিত এক স্রোতস্বিনীরই প্রবাহ, সুতরাং স্বতন্ত্র ভূমিকার প্রয়োজন নাই; প্রথম পর্বে প্রকাশিত ভূমিকা দ্বিতীয় পর্বের পক্ষে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

'দেশ' পত্রে প্রকাশিত সমালোচনায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"সুদক্ষ উপন্যাস লেখকের রসদৃষ্টিতে তাঁর বাল্যস্মৃতির এলোমেলো টুকরা অবিচ্ছেদ্য কাহিনীর মতো রমণীয় সমগ্রতা পেয়েছে।...যে কালের কথা তিনি লিখেছেন সে কালের অবসান ঘটেছে বহু দিন। এই 'সম্পন্ন অতীত' দিনগুলি এই স্মৃতিকথায় রোমান্সের সন্ধ্যারাগ নিয়ে ফুটে উঠেছে। বিগত কালের সেই প্রশান্ত দিনে জীবনে যে প্রীতিযোগ সুলভ ছিল, যে আনন্দ-আয়োজন সহজ ছিল, সে কথা আমাদের শুধু মন কেমন করায়।... সমগ্র স্মৃতিকথাটি একটি গল্পগুচ্ছের মতো।...বইটি নিশ্চয়ই অসামান্য।"

আমাদেরও মনে হয়, প্রথম পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্ব পর্যন্ত সমগ্র 'স্মৃতিকথা'টি একটি সমগ্র রত্নমালার ন্যায় রসিক পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হইবে। রত্নমালায় একটি মাত্র সূতা বিভিন্ন রত্নগুলিকে রুচিসঙ্গত সৌহার্দ্যে পাশাপাশি এক করিয়া সাজাইয়া রাখে, যে অংশই দেখা যাক না কেন, সেই অংশই চক্ষুকে মুগ্ধ করে। উপেন্দ্রনাথের 'স্মৃতিকথা'র বিষয়েও ঠিক সেই একই কথা খাটে। ডাঃ সেন কথিত "রমণীয় সমগ্রতা"র সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন কাহিনীগুলি লইয়া যে সুদীর্ঘ স্মৃতিকথা, তাহার যে অংশটুকুই পড়া যাক না কেন, তাহা চিত্তকে

বিমুগ্ধ করিবেই। বহু হইয়াও স্মৃতিকথা এক, এবং এক হইয়াও বহু। শুরু এবং সারার নাটকীয় আবর্তনে 'স্মৃতিকথা' সত্যিই বিচিত্র।

'স্মৃতিকথা'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত করিয়া বাংলা দেশের সুধী পাঠক শ্রেণী হইতে যে আশাতীত সাড়া আমরা পাইয়াছি, 'স্মৃতিকথা'র দ্বিতীয় পর্বের নিবেদনে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে কথার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করিলাম।

পাঠক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁহার যে বিশিষ্ট বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে উপহার দিয়াছেন, 'স্মৃতিকথা'র কয়েকটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, 'স্মৃতিকথা' পাঠকালে সময়ে সময়ে তাহা বুঝা যাইবে। বর্তমানে রায় বাহাদুর দাস দেওঘরে গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়ী অধিবাসীরূপে বাস করিতেছেন।

কলিকাতা
১৩ আশ্বিন, ১৩৫৮

শ্রীগোপালদাস মজুমদার

স্মৃতিকথা

দ্বিতীয় পর্ব

—এই লেখকের বই—

মায়াবতী পথে	৩॥০
স্মৃতিকথা—১ম পর্ব	৩॥০
স্মৃতিকথা—২য় পর্ব	৩॥০
অভিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)	৫৲
অস্তরাগ (২য় সংস্করণ)	৪॥০
বিদুষী ভার্য্যা (৩য় সংস্করণ)	৩।০
যৌতুক (২য় সংস্করণ)	৪৲
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)	৫॥০
অমলা (২য় সংস্করণ)	৩॥০
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)	৪॥০
রাজপথ (৫ম সংস্করণ)	৪৲
ছদ্মবেশী (৩য় সংস্করণ)	৩৲
অমূল তরু (৩য় সংস্করণ)	৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)	৪॥০
আশাবরী (২য় সংস্করণ)	৪৲
রাতজাগা (২য় সংস্করণ)	১॥০
রাজপথ (নাটক)	২৲
নাস্তিক	৩৲
কমিউনিস্ট প্রিয়া	২৸০
নবগ্রহ	১॥০
বৈতানিক	১॥০
গিরিকা	১॥০
ভারতমঙ্গল (নাটিকা)	১।০

স্মৃতিকথা

দ্বিতীয় পর্ব

১

ভাগলপুরের বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালীটোলার গাঙ্গুলী-পরিবার তথাকার একটি প্রাচীন বংশ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমার পিতামহ রামধন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তথায় আগমন ক'রে বসবাস আরম্ভ করেন। বাঙালীটোলার অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর পূর্বে মাত্র একটি পরিবার তথায় বাসস্থাপন করে।

ভাগ্যান্বেষণের জন্যই হোক, অথবা অপর কোনো কারণ বশতই হোক, প্রথম যুগে যে-সকল বাঙালী ভাগলপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, স্বজাতি বৃদ্ধির প্রতি স্বতঃই তাঁদের প্রবল আগ্রহ এবং উদ্যম দেখা যেত। সুযোগ-সুবিধা ঘটলেই বাংলা দেশ থেকে তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসতেন এবং স্থায়ীভাবে যাতে তাঁরা ভাগল-পুরে বসবাস করতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থাদিও ক'রে দিতেন। এমন কি স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাঁরা অল্পদিনের মেয়াদে ভাগলপুরে আসতেন, তাঁদেরও স্থায়ীভাবে আটকে ফেলবার জন্য তদানীন্তন প্রবাসী বাঙালীগণের চেষ্টা-চরিত্রের ত্রুটি দেখা যেত না। বসত-বাটির জন্য আমার পিতামহ বাঙালীটোলায় গঙ্গার অতি নিকটে বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ভূমির দক্ষিণ দিকের বেশ খানিকটা অংশ মাত্র চোদ্দ টাকার বিনিময়ে তিনি একটি বাঙালী

ব্রাহ্মণ-পরিবারকে দিয়েছিলেন, শুধু তাঁদের স্থায়ী প্রতিবেশীরূপে পাবার প্রলোভনে। সে চোদ্দ টাকাকে উক্ত ভূমির মূল্য ব'লে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে, ভূমি গ্রহণ-করা রূপ পুণ্য কার্যের দক্ষিণা স্বরূপই ছিল ঐ চোদ্দ টাকা।

ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের দল বাড়াবার কার্যে সর্বদা সচেতন থাকতেন বটে, কিন্তু সে কার্য তেমন কিছু কঠিন ছিল না। কোনো গতিকে ভাগলপুরের চতুঃসীমার মধ্যে একবার এসে পড়লে, ভাগলপুরের অতীব স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু এবং প্রচুর ও সুলভ খাদ্যসম্ভার পিছনে ফেলে বাংলা দেশে ফিরে যাওয়াই ছিল আগন্তুকের পক্ষে কঠিন কার্য। তখন আগন্তুক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কোনো প্রকারে ভাগলপুরে টিকে থাকবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হতেন এবং স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ফলে সে উপায় খুঁজে বার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হ'ত না।

ভাগলপুর অবশ্য এখনও বিহারের উৎকৃষ্টতম স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম, কিন্তু এখনকার তুলনায় পূর্বের স্বাস্থ্য আরও অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। দার্জিলিং প্রবর্তিত হবার পূর্বে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র শাসক লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল প্রতি বৎসর তিন মাসের জন্য বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভাগলপুরে গমন করতেন। তাঁর সঙ্গে যেত তাঁর খাস দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিবৃন্দ। ভাগলপুরের খঞ্জনপুর অঞ্চলে উপস্থিত যেখানে প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের 'ঝাউয়াকুঠি' নামক অট্টালিকা অবস্থিত, শুনতে পাওয়া যায়, সেই বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রাসাদ। ভাগলপুরের জল-বায়ুর সুনামে আকৃষ্ট হ'য়ে শুধু যে ছোটলাটই ভাগলপুরে আসতেন তা নয়, ম্যালেরিয়া পীড়িত সারা বাংলা দেশের ধারণা

ছিল যে, তিন দিন ভাগলপুরের জল পান করলে সুকঠিন যকৃত গলতে আরম্ভ করে এবং তিন দিন তথাকার বায়ু সেবন করলে জমাট প্লীহাও পক্ষ বিস্তারের উপক্রম দেখায়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের যুগে ভাগলপুরে খাদ্যদ্রব্যাদি কিরূপ সুলভ ছিল, সে কথা শুনলে আজ বিশ্বাস করা কঠিন হবে। কিন্তু ঠিক তার এক শত বৎসর পরের, অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের, সামান্য একটি ঘটনাকে যদি ভিত্তি করা যায়, তা হ'লে সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অনুমান করলে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের কথা যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদন ক'রেও একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হবে না।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমার সেজদাদা ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত একটি মকদ্দমা উপলক্ষে আমি বাঁকায় গিয়েছিলাম। ভাগলপুরের অন্যতম সাব-ডিভিশন বাঁকা ভাগলপুর থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। একদিনেই মকদ্দমা শেষ না হ'য়ে পরদিনও যদি খানিকটা সময় নেয়, তা হ'লে বাঁকায় আমাদের রাত্রি-যাপন করতে হবে ভেবে আমরা সঙ্গে শয্যা এবং বস্ত্রাদি নিয়েছিলাম। বেলা তিনটে নাগাদ যখন বোঝা গেল যে, প্রয়োজন হ'লে খানিকটা অতিরিক্ত সময় এজলাস ক'রেও সেই দিনই হাকিম মকদ্দমা শেষ করতে তৎপর হয়েছেন, তখন সেজদাদা তাঁর পুরাতন ভৃত্য ভজুয়ার মারফৎ একটা টমটম ক'রে আমাদের জিনিসপত্র মাইল সাতেক দূরবর্তী এক জমিদারের কাছারি-বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কাছরিতে নৈশ আহার সমাপন ক'রে আমরা রাত্রি যাপন করব এবং পরদিন প্রাতে চা-পানাদির পর ভাগলপুরের পথে অগ্রসর হব। যাবার সময়ে সেজদাদা ভজুয়াকে ব'লে দিলেন, আমাদের জন্যে আনা ছয়েকের দুধ কিনে রাখিস।"

মকদ্দমা শেষ হ'তে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। মকদ্দমায় আমাদের

পক্ষের বাঁকার উকিল ছিলেন শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় চৌধুরী। তাঁর গৃহে সোপকরণ চা-পান ক'রে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলাভিমুখে রওয়ানা হলাম। কাছারি-বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় রাত্রি আটটা হ'ল।

আহারে ব'সে দুই 'কটোরা'য় দুজনের দুধের বহর দেখে আমাদের তো চক্ষুস্থির! ভজুয়াকে ডেকে তিরস্কারের কণ্ঠে সেজদাদা বললেন, "তোর মতো বেহুদা (নির্বোধ) তো আর দেখি নি। আমরা কি দুধে আচমনও করব যে, এত দুধ কিনেছিস ?"

এই অকারণ অনুযোগে বিস্মিত হ'য়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভজুয়া বললে, "আপনি দু আনার দুধ কিনতে বলেছিলেন, আমি দু আনার দুধই কিনেছি। কসুর তা হ'লে কোথায় হ'ল ?"

উত্তর শুনে সেজদাদা ভজুয়াকে আর কিছু বললেন না, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ইঙ্গিতসহকারে মৃদুস্বরে বললেন, "ক-দন্ত্য স-য়ে হ্রস্ব উ-র (কসুর) কোথায় হয়েছে জানো ? ডবলিউ-এ-টি-ই-আর (water) মেশাবার বে-আন্দাজে। পিওর মিল্কের হাফ নিজের জন্যে রেখে, বেটা আমাদের দুধে বে-আন্দাজ ডবলিউ-এ-টি ই-আর ঢেলেছে।"

খেতে গিয়ে কিন্তু দেখি, গাভীমাতার স্তন হ'তে ক্ষরিত হওয়ার পর সে দুগ্ধে এক বিন্দুও ডবলিউ-এ-টি-ই-আর পড়েছে ব'লে বিশ্বাস হয় না। ঘন মিষ্ট সুস্বাদু উপাদেয় দুধ।

সকৌতূহলে ভজুয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দু আনায় কতটা দুধ পেয়েছিস ভজুয়া ?"

ভজুয়া বললে, "দু সের।"

সের অর্থে কলকাতার আশি তোলার সের মনে করলে ভুল হবে; ভাগলপুরের এক শো এক তোলার সের। সুতরাং দু সের অর্থে কলকাতার আড়াই সেরেরও সামান্য কিছু বেশি।

১৯১৮ সালে যে বাঁকায় টাকায় ষোল সের দুধ পাওয়া যেত, ১৯৫১ সালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে সেখানে বড় জোর সের দুই পাওয়া যায়। ১৯১৮ সালের 'টাকায় ষোল সের' যদি ১৯৫১ সালে 'টাকায় দু সের'-এ দাঁড়িয়ে থাকে, তা হ'লে ১৮১৯ সালের 'টাকায় কত সের' ১৯১৮ সালে 'টাকায় ষোল সেরে' দাঁড়িয়েছিল,—সে গোলমেলে অঙ্ক না হয় নাই কষলাম; কিন্তু কেউ যদি দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ১৮১৯ সালে ভাগলপুরে টাকায় আড়াই মণ দরে দুধ পাওয়া যেত, তা হ'লে সে কথায় আপত্তিই বা করি কোন্ হিসেবের জোরে?

১৮১৯ সালে পিতামহের আমলের কথা না হয় ছেড়েই দিই। আমাদের বাল্যকালে ভাগলপুর শহরে পাওয়া যেত টাকায় বারো-তেরো সের খাঁটি দুধ, সওয়া সের বিশুদ্ধ ঘি, তিন আনায় এক সের রুই মাছ, দু পয়সায় এক সের চুনো মাছ, আট আনায় এক শত ভুতো বোম্বাই, আর চার আনায় একটা দশ-সেরি তরমুজ, যার আধখানার শাঁসে আর জলে পনেরো-ষোল জন মানুষের একটা সমগ্র পরিবার পরিতৃপ্তির সহিত শরবত খেতে পারত।

সুতরাং আজ হ'তে এক শত বত্রিশ বৎসর পূর্বে উৎকৃষ্ট জল-বায়ু এবং অতি সুলভ বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের মণি-কাঞ্চন-যোগের প্রভাবে অচির-কালের মধ্যে ভাগলপুরে যে বাঙালীর বৃহত্তম উপনিবেশ গ'ড়ে উঠতে পেরেছিল, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? যখনকার কথা বলছি, তখন ভাগলপুরে রেল হয় নি;—হালিশহর থেকে নৌকাযোগে ভাগলপুরে পৌঁছতে প্রায় এক মাস সময় লাগত।

বাংলা দেশে আমাদের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্তী হালিশহর গ্রামে। নিবাস ছিল বললে কতকটা ভুল হয়, কারণ এখনও সেখানে পৈতৃক বাড়ি এবং কিছু জমি-জমা আছে।

উপস্থিত সে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন আমাদের খুড়তুত ভাই সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা দেশকর্মী শ্রীমান বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্তমান কালে হালিশহর রীতিমত শহরেই পরিণত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু প্রাচীন কালেও সুবৃহৎ এ গ্রামখানি ভদ্র এবং বিদগ্ধ সমাজ অধ্যুষিত নাগর-মর্যাদাসম্পন্ন একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। এখানে গণ্ডগ্রাম শব্দ অবশ্য আমি গণ্ডগ্রামের প্রকৃত অর্থে, অর্থাৎ 'বৃহৎ জনাকীর্ণ গ্রাম' অর্থে ব্যবহার করছি। গণ্ডগ্রাম শব্দটি কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্র নগণ্য 'অজ পাড়াগাঁ' অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বহু খ্যাতনামা লেখকও তাঁদের লেখার মধ্যে ঐ অর্থেই গণ্ডগ্রাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুর্দৈবের কোন্ প্রথম দিবসে কিরূপ বিপাকের অবস্থায় প'ড়ে 'গণ্ডগ্রাম' তার মহিমার শাল-দোশালা থেকে রিক্ত হ'য়ে দৈন্যের দোলাই গায়ে দিতে আরম্ভ করলে, সে ইতিহাস নিশ্চয়ই কৌতুকপ্রদ। গণ্ড শব্দের একটা অর্থ বুদ্বুদ। এই তুচ্ছার্থবোধক অর্থটিই গণ্ডগ্রামের গণ্ডের উপর আরূঢ় হ'য়ে তার মহিমাচ্যুতি ঘটিয়েছে কি না কে বলতে পারে?

সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালিশহরে জন্মগ্রহণ এবং জীবনযাপন করেন। শুনেছি ভজু গাঙুলী নামে আমাদের এক পিতৃপুরুষ রামপ্রসাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। প্রতিদিন বেলা সাড়ে নটা দশটার সময়ে আমাদের শিবের গলির বাড়িতে রামপ্রসাদ এসে হাজির হতেন। তিনি আসামাত্র মেয়েরা একটা বাটি ক'রে আধ পোয়াটাক সরিষার তৈল সম্মুখে ধ'রে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'য়ে যেত কয়েকজনে মিলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে সর্বাঙ্গে তৈল ভ্রক্ষণ এবং তেল মাখতে মাখতেই আরম্ভ হ'ত প্রথমে মৃদুস্বরে ক্রমশ উচ্চরোলে গান ও নৃত্য। বলা বাহুল্য গান অর্থে শ্যামাসঙ্গীত।

তেল মাখার পালা শেষ হ'লে ক্ষণকাল গৃহাঙ্গণে নৃত্য-গীতের পর

সকলে বাহির হ'য়ে পড়তেন পথে। নিয়মিত জনতা তথায় যথারীতি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকত। রামপ্রসাদকে পাওয়ামাত্র তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে সকলে উল্লসিত চিত্তে নৃত্য এবং গীতে যোগদান করত। গ্রামের পথে চলতে চলতে জনতা স্ফীত থেকে স্ফীততর হ'তে হ'তে ক্রমশ বিপুল আকার ধারণ করত। শত শত কণ্ঠের গীত-রবে সমস্ত গ্রাম মুহুর্মুহু চকিত হ'তে থাকত। অবশেষে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময়ে সকলে উপনীত হতেন ভাগীরথীর উপকূলে।

তখন রামপ্রসাদ তাঁর কয়েকজন স্নানার্থী সঙ্গীসহ নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অর্ধ পোয়া সর্ষপ তৈল লোমকূপ হ'তে নিষ্কাশিত ক'রে জল-স্রোতে মুক্তিদান করতে সকলের ঘণ্টা দুই সময় লাগত। জল ছেড়ে তীরে উঠে গা মুছতে আর সবুর সইত না,—পাকাশয়ে তখন দুর্দান্ত ক্ষুধার দাবানল জ্বলেছে। মাথা মুছতে মুছতে সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে দৌড় মারতেন, গৃহে উপনীত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে ব'সে পড়তেন সব্যঞ্জন এক থালা বাড়া-ভাতের সম্মুখে।

প্রতিদিন চলত ঠিক এই একই পদ্ধতির অনুবর্তন।

পশ্চিম-বঙ্গের হালিশহরে এসে বসবাসের খোঁটা গাড়বার পূর্বে আমাদের নিবাস ছিল পদ্মানদীর পূর্ব পারে খাস পূব-বঙ্গের বিদ্বজ্জনসমৃদ্ধ কোনো এক সুবিখ্যাত গ্রামে। বিহারেই বাস করি আর পশ্চিম-বঙ্গের ভাষাতেই কথা কই, মূলত আমি যে পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসী, দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে একবার সে কথার একটা 'ঝেলো' প্রমাণ দেবার কারণ ঘটেছিল। কাহিনীটা শুনলে এ কথা সুস্পষ্ট হ'তে পারবে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। বিখ্যাত লছমীপুর মামলায় প্রতি-বাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে ভাগলপুরে এসেছেন

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদীদের পক্ষে আছেন প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এবং সার্ (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ— কলিকাতা হাইকোর্টের দুই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার। পূর্ব হ'তেই আমি রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে উকিল ছিলাম, দাশ সাহেব আসার পর থেকে আমি তাঁর অধীনে জুনিয়ারের কাজে ব্যাপৃত হয়েছি।

মকদ্দমায় বাদীপক্ষ সমগ্র লছমীপুর এস্টেট দাবি করেছেন। কোর্ট-ফিস ও জুরিস্‌ডিক্‌শনের হিসাবে মামলার মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে চল্লিশ লক্ষ টাকা; কিন্তু বহু মূল্যবান খাদ-খনি-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গলে সমৃদ্ধ সমগ্র জমিদারির মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশি। এই বৃহৎ ও জটিল মামলায় বিচারের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে চল্লিশটি বিভিন্ন ইস্যু। সুদীর্ঘ আট মাস কাল অতিবাহিত হয়েছিল সেই চল্লিশটি ইস্যুর দুর্গম পর্বত-প্রান্তর এবং দুস্তর নদী-নালা অতিক্রম ক'রে সমাপ্তির সীমান্ত রেখায় উপনীত হ'তে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে আরম্ভ হ'য়ে মকদ্দমা শেষ হয়েছিল ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

পূজোর ছুটি আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ভাগলপুরে উপস্থিত হলেন। পূজোর ছুটিতে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে মায়াবতী যাবেন এবং অবসরকাল তথায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করবেন, এমন ব্যবস্থা পূর্বেই চিঠিপত্রে ঠিক হয়েছিল, ইনি এসেছেন মায়াবতী যাত্রার ঠিক দিনটি অবগত হ'তে এবং চিত্তরঞ্জন যদি প্রয়োজন বোধ করেন তা হ'লে ভাগলপুর থেকে তাঁদের অনুগমন করতে। চিত্তরঞ্জনের নিকট ইঙ্গিত লাভ ক'রে গণেন মহারাজ মায়াবতী যাবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন;—মৌখিক নয়, সুস্পষ্ট আন্তরিকতারই সহিত। ছুটিতে কলিকাতা যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ব'লে

মায়াবতী যাওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রবলতর ইচ্ছার কাছে কি প্রকারে নিজের ইচ্ছাকে হার মানিয়ে শেষ পর্যন্ত মায়াবতী যেতে হয়েছিল, সে সকল কথা অন্যত্র সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছি। পুনরায় সে বিষয়ে বেশি কিছু বলতে গেলে পুনরুক্তির অপরাধে অপরাধী হ'তে হবে। সুতরাং এক দৌড়ে মায়াবতী পৌঁছানোই যাক।

কাঠগুদাম রেল-স্টেশন থেকে নব্বই মাইল দূরে আলমোরা জেলায় এক নিভৃত প্রদেশে হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে অপরূপ লাবণ্যময়ী মায়াবতী অবস্থিত। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রম ব্যতীত সেখানে আর কোনো-কিছুর অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মনুষ্য-সমাজ আর তার সাধারণ ক্রিয়াকলাপ সেখানে অবর্তমান ও অপরিজ্ঞাত। পূর্ণ-কুম্ভে জল যেমন কুম্ভের সমস্ত অবকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, অদ্বৈত আশ্রম তেমনি মায়াবতীর সমস্ত অবকাশকে পূর্ণ ক'রে আছে।

অনুচরবর্গ ব্যতীত মায়াবতীর দলে আমরা ছিলাম সবসুদ্ধ আট জন—চিত্তরঞ্জন, বাসন্তী দেবী, অপর্ণা ও কল্যাণী দুই কন্যা, পুত্র চিররঞ্জন, বাসন্তী দেবীর সম্পর্কীয় ভাই সতীন্দ্রনাথ, ল ক্লার্ক ললিতমোহন সেন ও আমি। দুই বেলা আমরা একত্রে আহারে বসতাম, এবং প্রায় প্রত্যহই মেয়ে দুটি বাসন্তী দেবীকে অনুরোধ করত, "মা, একদিন মরিচ-ঝোল কর।"

মরিচ অর্থে লঙ্কা। মায়াবতীতে এক রকম লঙ্কা পাওয়া যায় যা সাধারণ লঙ্কার ন্যায় লম্বা নয়, গোল। তাই ব'লে গোলমরিচও নয়। লঙ্কাগুলি বৃহদাকার এবং কাঁচালঙ্কার ভুরভুরে সুগন্ধে মনোরম।

এই লঙ্কার ঝোলের জন্যই মেয়েরা সর্বদা পীড়াপীড়ি করত। শীঘ্র একদিন করবেন ব'লে বাসন্তী দেবী নিত্যই তাদের আশ্বাস দিতেন;

কার্যত কিন্তু হ'য়ে উঠছিল না। পুরুষেরা অবশ্য পীড়াপীড়ি করতেন না, কিন্তু মেয়েদের প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের যে সাগ্রহ সমর্থন ছিল, সে কথা ভাবে ইঙ্গিতে বুঝতে অসুবিধে হ'ত না।

আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য বাসন্তী দেবীর দুই জন সুদক্ষ বাবুর্চি ছিল, কিন্তু তাদের দিয়ে মরিচ-ঝোল প্রস্তুত করাবার কথা কেউ বোধ হয় চিন্তাও করত না। যে বিশেষ-একটা মৃদু স্বাদ এবং সুরভির জন্য মরিচ ঝোল খাবার এত আগ্রহ, বাবুর্চিদের মোগলাই হাতের ফাঁক দিয়ে ঝোলের বাইরে কোথায় তা পথ হারাবে, তাই বোধ হয় ছিল সকলের আশঙ্কা। ভাল মৃদঙ্গ বাজাতে পারার গুণেই ভাল ডুগ্‌ডুগি বাজাতে পারা যায় না—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

অবশেষে একদিন বহু-আকাঙ্ক্ষিত মরিচ-ঝোল প্রস্তুত হ'ল। বলা বাহুল্য, রেঁধেছেন বাসন্তী দেবীই। ছেলেমেয়েদের উৎসাহের অন্ত নেই,—আজ অর্ধেক অন্ন মরিচ-ঝোল দিয়েই সাবাড় করতে হবে!

আমরা আট জনেই একটা বড় টেবিলের দু-দিকে একত্রে খেতে বসতাম। সাত জনে বসেছি; বাসন্তী দেবী পাতে পাতে বাটি বাটি মরিচ-ঝোল পরিবেশন করছেন; ছেলেমেয়েরা মরিচ-ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে 'হা-হু, হু-হু' করছে, আর বলছে "বেশ হয়েছে মা!" "খাসা হয়েছে মা!" "চমৎকার হয়েছে মা!" চিত্তরঞ্জন 'হা হু'ও করছেন না, কোন মন্তব্যও ছাড়ছেন না, কিন্তু তাঁর খাবার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মতেও চমৎকারই হয়েছে।

আমাকে বাদ দিয়ে বাকি সাতখানা পাতে মরিচ ঝোল পরিবেশন ক'রে বাসন্তী দেবী নিজে বসবার উপক্রম করছেন দেখে ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে আমি বললাম, "আমার মরিচ-ঝোল কই?—আমাকে দিলেন না। তো?"

বসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বাসন্তী দেবী স্মিতমুখে চিত্তরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ভাবটা, দেবো না-কি একটু ?

ব্যস্ত হ'য়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না না, মরিচ-ঝোল আপনাকে দেওয়া হবে না। ও আমাদের বাঙালে খাওয়া,—আপনি সহ্য করতে পারবেন না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম, "বাঃ। সে কি কথা! এতদিন ধ'রে 'মরিচ-ঝোল' 'মরিচ-ঝোল' শুনছি,—সেই মরিচ-ঝোল যদি হ'ল,—আমি খেতে পার না কি রকম ?" বাসন্তী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "খুব সহ্য করতে পারব। আপনি দিন।"

আহার্য বস্তু প্রার্থনা করলে মেয়েরা সহজে সে প্রার্থনা রোধ করতে পারেন না, বিশেষত সে আহার্যবস্তু যদি স্বহস্ত-প্রস্তুত হয়। ঝোল ভাগ করবার সময়ে আমার ভাগেও বোধ হয় একটা বাটি পড়েছিল, তাড়াতাড়ি বাসন্তী দেবী পাশের ঘর থেকে এক বাটি ঝোল নিয়ে এসে আমার সম্মুখে স্থাপন করলেন।

প্রথমে সামান্য একটু ঝোল ভাতে মেখে ভয়ে ভয়ে চেখে দেখলাম,—তারপর হঠাৎ ক'রে সমস্ত ঝোলটা ভাতের ওপর ঢেলে নিয়ে বেশ ক'রে ঝোলে-ভাতে মেখে সপাসপ লাগিয়ে দিলাম। সত্যিই চমৎকার হয়েছে! খাসা হয়েছে! যেমন সুতার আস্বাদ, তেমনি ভুরভুরে গন্ধ!

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হাত নেড়ে আমার আহারে বাধা দিয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "থামুন একটু। খাবেন অখন। আগে বলুন তো কোথায় বাড়ি ? ভাড়াবেন না, সত্যি ক'রে বলবেন।"

বললাম, "কেন ? আপনি তো জানেন ভাগলপুরে।"

"তার আগে ?"

"তার আগে চব্বিশ পরগনায় হালিশহরে।"

"তার আগে ?"

"তার আগে দস্তুরমতো ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বাইগ্যা গ্রামে। জানেন, আমরা বেগের গাঙুলী ?"

উল্লসিত কণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "তা হ'লে নির্ভয়ে খান,—কোনো চিন্তা নেই। আপনি যখন ঢাকার বাঙাল, তখন তো আমরা এক জেলার মানুষ।"

বললাম, "কিন্তু আমার মধ্যে এখন আর বাঙালত্ব আছে কি কিছু ? ভাগলপুরে তো এক শো বছর হ'ল, তার আগে তিন শো বছর হালিশহরে। চার শো বছরের প্রবাস-জীবনের পর আমাদের বাঙালত্বের এক ছিটে-ফোঁটাও কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে ?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "কেন ? পাওয়া তো গেছে আজ মরিচ-ঝোলের মধ্যে। ও-জিনিস একেবারে লুপ্ত হবার নয়—গোত্রের মতো পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে আসে। বাঙালদের আছে দুটো গোত্র—এক ঋষিদের কাছে পাওয়া গোত্র, আর মরিচ-গোত্র। চার শো বৎসর পূর্ব-বঙ্গ ছাড়া হ'লেও মরিচ-গোত্র রক্তের মধ্যে প্রবাহিত থাকে।"

চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য শুনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন।

এর পর প্রায়ই মাঝে মাঝে মরিচ-ঝোল রাঁধা হ'তে লাগল; আর আমার পাতেও পড়তে লাগল নির্বিবাদে সকলের সঙ্গে। 'ঝেলো' প্রমাণের দ্বারা বাঙাল দেশের মানুষ ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে গিয়েছিলাম, বোধ করি সেই কারণেই।

'ঝেলো' প্রমাণের অর্থ এখন বোধ হয় কারো কাছে আর অস্পষ্ট নেই।

২

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমার পিতামহ হালিশহর হ'তে ভাগলপুরে আসেন, এ কথা পূর্বে বলেছি। আমার বিশ্বাস, ভাগলপুরে তিনি অবিবাহিত অবস্থাতেই এসেছিলেন। কিছুকাল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাস করার পর স্থায়ীভাবে তথায় বাসস্থাপনের বাঞ্ছনীয়তার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'য়ে তদ্বিষয়ে প্রয়োজন-মতো ব্যবস্থাদি ক'রে সম্ভবত তিনি বাংলা দেশে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন।

আমার বড় জেঠামহাশয় ও মেজজেঠামহাশয় হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অথবা ভাগলপুরে, সে কথা বলতে পারি নে, কিন্তু ভাগলপুরে আসার আঠারো বৎসর পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র, আমার পিতা, মহেন্দ্রনাথ ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, এই আঠারো বৎসরের কতকটা সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অর্থাৎ ভাগলপুর আসার পর, আমার পিতামহের বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ছিল বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী ছিলেন অভয়া দেবী। বিশ্বেশ্বরের পুত্র দুর্গাচরণ, দুর্গাচরণের স্ত্রী ভগবতী। দুর্গাচরণের পুত্র ছিলেন আমার পিতামহ রামধন গঙ্গোপাধ্যায়। আমার পিতামহীর নাম ছিল গোবিন্দমোহিনী। রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের পাচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ, মধ্যম দীননাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ, চতুর্থ অমরনাথ এবং কনিষ্ঠ অঘোরনাথ। কেদারনাথের দুই পুত্র—ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস; এবং তিন কন্যা—দাসী (ডাকনাম),

ভুবনমোহিনী ও ক্ষান্তমণি। কন্যাত্রয়ের মধ্যে ভুবনমোহিনী ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে জননী।

কেদারনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা দাসী, আমাদের বড়দিদি, সংসারের প্রথমা কন্যা ছিলেন ব'লে তিনি সকলের অপরিসীম আদর-যত্নের অধিকারিণী হয়েছিলেন। পিতামাতা থেকে আরম্ভ ক'রে আত্মীয়-পরিজন, এমন কি চাকর-চাকরাণী পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত স্নেহধারা এই আদরিণী কন্যাটিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হ'ত। নিজের অনন্যভাজ্য একচেটে সুযোগের প্রভাবে আনন্দের বিশেষ একটা দিকের তিনি ছিলেন একমাত্র চাবি-কাঠি।

কিন্তু যে চাবি-কাঠি বহুদিন ধ'রে আনন্দের প্রস্রবণই উন্মুক্ত ক'রে এসেছে, এমনই দুর্দৈব, অকস্মাৎ একদিন তা উন্মুক্ত করতে আরম্ভ করলে মর্মান্তিক বেদনার নির্ঝর। বিবাহের অল্প কিছুকাল পরে যেদিন বড়দিদি অসম্ভাবিত বৈধব্যের নেত্রবিদারক মূর্তি নিয়ে শ্বশুর-গৃহ থেকে ফিরে এলেন, সেদিন আনন্দবক্তিম গাঙ্গুলী-পরিবার একটা শক্ত আঘাতের মর্মন্তুদ বেদনায় নীলাভ হ'য়ে উঠল।

এই দুর্বিষহ দুঃখ ও শোকের বিরুদ্ধে যা হোক-একটা-কোনো উপায় অবলম্বন করবার উদ্দেশ্যে বড়দিদির প্রতি সকলের যত্ন আদর এবং মনোযোগ চতুর্গুণ স্ফীত হ'য়ে উঠল; সংসারের কর্তৃপক্ষ সকল বিষয়ে তাঁকে সর্বময়ী ক'রে তোলবার উপক্রম করলেন। তাতে আর যাই কিছু হোক না কেন, শোকসন্তপ্ত জীবনপাত্রে দুঃখ ও আদরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বড়দিদির অন্তরের একটা নিভৃত অঞ্চলে অতি-সচেতন অভিমানের একটা উৎস সৃষ্টি লাভ করলে। কথায় কথায় ছুতায় নাতায় সেই উৎস-মুখে দুর্মদ অভিমান উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তার জারক রসে সকলের চেয়ে অধিক জর্জরিত হন বড়দিদি নিজেই। সেই দুর্বার

অভিমান কি অবস্থায় একদিন তাঁকে জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার সামান্য ইতিহাসটুকু বললেই বড়দিদির প্রসঙ্গ শেষ হয়।

আমাদের গৃহে নারায়ণের নিত্যসেবার ব্যবস্থা তো ছিলই, তা ছাড়া নানাবিধ অতিরিক্ত পূজাপাঠ সর্বদা লেগেই থাকত। দেবার্চনার জন্য পুষ্প-সংগ্রহ পুরাঙ্গনাদের পক্ষেও যাতে সহজ হয়, সেইজন্য অন্দর-মহলের সংলগ্ন একটি নাতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যান ছিল। নিত্যপূজার পুষ্পচয়নের দ্বারা প্রতিদিন জীবনের সূত্রপাত করবার পবিত্র কর্তব্যভার ছিল বড়দিদির। অতি প্রত্যুষে, প্রায় সকলের আগে শয্যা ত্যাগ ক'রে সাজি হস্তে তিনি ফুলের বাগানে প্রবেশ করতেন। তারপর বহুক্ষণ ধ'রে বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নানাবিধ পুষ্পে সাজিখানি পূর্ণ ক'রে উদ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেন।

একদিন প্রত্যুষে পুষ্পচয়নের নিয়মিত কার্যে রত আছেন, এমন সময়ে পায়ে একটা-কিছু দংশন করলে। সারা অঙ্গের মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎশিহরণ খেলে গেল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখেন একটা বিষধর সর্প, তখনো তার ক্রোধের বিস্ফারিত ফণা সঙ্কুচিত হয় নি, অনিষ্টটি সম্পন্ন ক'রে লীলায়িত মন্থরগতিতে আত্মগোপন করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। চিৎকার ক'রে উঠলেন, "ওগো! আমাকে সাপে কামড়েছে!"

নিকটেই একজন পুরানো চাকর কাজ করছিল, বড়দিদির আর্তনাদ শুনে সে তাড়াতাড়ি একটা দড়ি নিয়ে ছুটে এসে পায়ের ডিমের খানিকটা তলায় দৃঢ়ভাবে একটা বাঁধন দিলে। যারা ইতিমধ্যেই ঘুম ভেঙে উঠে ছিল, কলরব শুনে তারা এল ছুটে; যারা তখনো শেষ নিদ্রার সুখ-স্বপ্নে মগ্ন ছিল, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে তাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হ'ল। একটা উৎকট আতঙ্কের তাড়নায় সমস্ত বাড়িটা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠল।

সুতীব্র উদ্বেগে এবং উত্তেজনায় বড়দিদির সারা দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছিল। পাগলের মতো ছুটে এসে জেঠামহাশয় কেদারনাথ বড়দিদির পায়ের ডিমের উপর আর একটা শক্ত বাঁধন দিলেন, তারপর একটা চেয়ার এনে তার উপর বড়দিদিকে বসিয়ে গৃহমধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই চেয়ারের উপরেই বড়দিদি ব'সে রইলেন।

দু-চার মিনিট নিবিষ্টভাবে বড়দিদির অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ব্যগ্র কণ্ঠে তাঁকে আশ্বাস এবং অভয় দিয়ে জেঠামহাশয় ছুটলেন সিভিল সার্জেনকে নিয়ে আসবার জন্যে। জেঠামহাশয় প্রস্থান করবার কিছু পর থেকে বড়দিদির অবস্থার কিছু যেন উন্নতিই পরিলক্ষিত হ'তে লাগল। কাঁপুনি গেল থেমে, সহজভাবে অল্প-স্বল্প কথা কইতে আরম্ভ করলেন, এমন কি, মাঝে মাঝে এক-আধটা হাস্য-পরিহাসও চলতে লাগল। বড়দিদিকে পরিবৃত ক'রে যে উৎকণ্ঠিত জনতা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অবস্থান করছিল, তার শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন কতকটা সহজ হ'য়ে এল। ইতিমধ্যে সারা পল্লীতে বড়দিদির সর্পদংশনের সংবাদ রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। পাড়ার দু-চারজন মাতব্বর বৈঠকখানায় এসে বসেছেন, দু-চারজন গৃহিণী ভিতরে রোগিণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বড়দিদির অবস্থার উন্নতির দ্বারা ভ্রান্ত অথবা উৎসাহিত হ'য়েই হোক, সম্ভবত কপট অনুযোগের সাহায্যে বড়দিদির মনে আশ্বাসকে প্রবলতর ক'রে তাঁকে আরও খানিকটা চাঙ্গা ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে, ঈষৎ বিদ্রূপমিশ্রিত কণ্ঠে মতিদাদা (শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়) বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নয়, খোঁচা-টোচা লেগেছে। সকালবেলা অনর্থক এতগুলো মানুষকে অস্থির ক'রে তুলেছেন দিদি!"

ক্ষণকাল পূর্বে যে বিষধর সর্প বড়দিদিকে দংশন করেছিল, তারই মতো ফণা বিস্তার ক'রে একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অভিমান নিমেষের মধ্যে মাথা

চাড়া দিয়ে উঠল। চোখের উপর দিয়ে অত বড় সাপটা যে এঁকে-বেঁকে চ'লে গেল, সেটা তা হ'লে কিছুই নয়? সেটা তা হ'লে সর্বৈব মিথ্যা? অধরপ্রান্তে ঝিলিক মারলে সাঙ্ঘাতিক অভিমানের একটা তীক্ষ্ণ শীতল হাসি। মতিদাদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বড়দিদি বললেন, "ও! সাপ-টাপ নয়? খোঁচা-টোচা? তা হ'লে বাঁধন-টাধনেই বা কিসের দরকার?" ব'লে অতর্কিতে নিমেষের মধ্যে পটপট ক'রে দুটো বাঁধনই দিলেন আলগা ক'রে।

হাঁ-হাঁ ক'রে কয়েকজন ছুটে এল,—তাড়াতাড়ি বাঁধন দুটো দিলে আরও শক্ত ক'রে বেঁধে। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার, তার আর বাকি ছিল না কিছু। যে দুরন্ত উগ্র বিষ বাঁধনের তলায় আবদ্ধ হ'য়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় উর্ধ্বমুখে অবস্থান করছিল, বাঁধন আলগা পেয়ে নিমেষের মধ্যে তা রক্তপ্রবাহের উপর সওয়ার হ'য়ে বড়দিদির মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে ছুট দিয়েছে। দেখতে দেখতে মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে কথা জড়িয়ে দৃষ্টি হ'য়ে গেল ঝাপসা, মাথা পড়ল চেয়ারের পিছন দিকে এলিয়ে। গভীর নৈরাশ্যে ও দুঃখে আত্মীয়বর্গ 'হায় হায়' করতে লাগল। আধ-ঘণ্টাটাক পরে সিভিল সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে জ্যেঠামশায় যখন হন্তদন্ত হ'য়ে প্রিয়তমা কন্যার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন বড়দিদি পরপারের যাত্রী, টিকিট কেনা হ'য়ে গেছে, জাহাজের বাঁশীর শব্দে কান পেতেছেন। দুই হাত শিথিল বিলম্বিত; দৃষ্টি স্থির অপলক; মুখ-গহ্বরে ফেনোচ্ছ্বাস। মুমূর্ষু অবস্থা।

কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে জ্যেঠামহাশয় মস্তকে করাঘাত ক'রে রোদন করতে লাগলেন। ইংরেজ সিভিল সার্জেন সজোরে একবার বড়দিদির নাড়ী টিপে পরীক্ষা করলেন, চোখের পাতা উল্টে দেখলেন, তারপর বুকের উপর ক্ষণকাল স্টেথোস্কোপ বসিয়ে নিবিষ্টভাবে হৃৎ-

পিণ্ডের গতিনির্ণয়ের নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। জেঠামহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার কন্যা সকল চিকিৎসার অতীত হয়েছেন। ওঁর ক্ষত-স্থানে ছুরি বসিয়ে আর কোনো ফল হবে না।" তারপর ভিজিটের টাকার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

ব্যাগ থেকে ছুরিকা বার না ক'রে সাহেব ডাক্তারের বিদায় গ্রহণের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে মেয়েপুরুষের কারো বাকি রইল না। একটা গভীর বেদনার আর্তনাদে সারা গৃহ মুখরিত হ'য়ে উঠল। জেঠামহাশয় স্বভাবত ধীর গম্ভীর সংযত প্রকৃতির মানুষ,—তিনিও শোকে অধীর হলেন।

ইতিমধ্যে বহির্বাটিতে পাড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছিলেন। সিভিল সার্জেনকে অত শীঘ্র গৃহত্যাগ করতে দেখে এবং গৃহমধ্যে বিলাপধ্বনি শুনতে পেয়ে তাঁদের মধ্যে তিন চারজন অন্তঃপুরে উপস্থিত হলেন। জেঠামহাশয়কে সম্বোধন ক'রে একজন বললেন, "শুনুন গাঙুলী মশায়, সাপে কামড়ানো রুগীর প্রাণের সাড়া ডাক্তার-কবিরাজে যখন খুঁজে পায় না, তখনো কিছুক্ষণের জন্যে প্রাণটা দেহের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। সুতরাং কান্নাকাটিতে সময় নষ্ট না ক'রে একবার আড়েহাতে চেষ্টা দেখা যাক। চলুন, মাকে নিয়ে যাই গঙ্গার তীরে। সেখানে মাকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে দিই।"

এই প্রস্তাব শোকাকুল পরিজনবর্গকে, সুদূর হ'লেও, একটা নূতন আশার আসবে কিঞ্চিৎ সঞ্জীবিত ক'রে তুললে। অন্তত, দুঃসহ দুঃখকে ক্ষণকালের জন্য নিবর্তিত ক'রে রাখার একটা উপায় পাওয়া যাবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে।

আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা এক মিনিটেরও পথ নয়। ইঙ্গিত মাত্র দুজন বলিষ্ঠ যুবক চেয়ারের দু পাশ ধ'রে সন্তর্পণে কিন্তু দ্রুতগতিতে বড়দিদির দেহ বহন ক'রে নিয়ে চলল। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময় নেই। দেহের কোন্ গোপন শাখায় প্রাণবিহঙ্গ লুকিয়ে ব'সে আছে কে জানে! হঠাৎ এক সময়ে মহাব্যোমের মধ্যে পক্ষ-বিস্তার করলে সমস্ত গঙ্গার জল উজাড় ক'রে ঢাললেও দেহপিঞ্জরে আর তাকে ফিরিয়ে আনা চলবে না।

জল আর তটের দুই প্রান্তরেখা যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই মহাসন্ধিস্থলে বড়দিদির চেয়ার স্থাপিত করা হ'ল। চেয়ারের পিছনের দুই পায়া রইল জলে, সম্মুখের দুই পায়া স্থলে। বিসর্জনের সময়ে প্রতিমার যেমন থাকে, তেমনি বড়দিদির মুখ রইল স্থলের দিকে। এও গাঙুলী-পরিবারের একটি প্রতিমাই বিসর্জিত হ'তে চলেছে।

বড়দিদির চেয়ার স্থাপিত হওয়া মাত্র তাঁর চৈতন্যহীন মস্তকের উপর গঙ্গাজল ঢালা আরম্ভ হ'য়ে গেল,—নিরলস নিরবসর ঢালা,—তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কেউ ঘড়া নিয়ে এল, কেউ ঘটি নিয়ে এল, কেউ গামলা নিয়ে এল, কেউ হাঁড়ি নিয়ে এল। নিজ নিজ পাত্র ভ'রে ভ'রে সকলে ঐকান্তিক চিত্তে অবিচল উদ্যমের সহিত জল ঢেলে চলল। যে সকল স্নানার্থী এবং স্নানার্থিনী সে সময়ে গঙ্গার উপকূলে উপস্থিত ছিল, তারাও নিজেদের পাত্র পূর্ণ ক'রে ক'রে জল ঢালতে আরম্ভ করলে। কিন্তু জীবনের কোনো লক্ষণই ফিরে আসতে চায় না। নিষ্ফল গঙ্গাজল বড়দিদির দেহ সিক্ত ক'রে ক'রে গঙ্গায় ফিরে যেতে লাগল; যে অনপনেয় বিষ বড়দিদির দেহকে অধিকার ক'রে রেখেছিল, তার একটি কণিকাও তারা নিষ্কাশিত ক'রে নিয়ে যেতে সমর্থ হ'ল না। অতি-সেচনের

ফলে ক্রমশ চামড়া হ'য়ে এল কুঞ্চিত, বর্ণ হ'য়ে এল পাণ্ডাশ। শেষ পর্যন্ত সকলেই বুঝতে পারলে—

পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার,
'দুখময়' নীড় প'ড়ে আছে তার।

অগত্যা সৎকারের আয়োজন আরম্ভ হ'ল। একদিনের দুঃখের বন্যায় জলে অনাগতকালের প্রতি দিবসের দুঃখকে টেনে নিয়ে বড়দিদি চ'লে গেলেন।

৩

আমার জ্ঞানোন্মেষকালে ভাগলপুরের গাঙ্গুলী পরিবার তিন কর্তা, পাঁচ গৃহিণী এবং তাঁদের পুত্রকন্যাদের দ্বারা গঠিত একটি বৃহৎ এবং কতকটা জটিল সংসার। পাঁচ কর্তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ অঘোরনাথ জীবিত আছেন, বাকি দুজন দীননাথ এবং অমরনাথ পরলোক গমন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের জন্ম পর্যন্ত এই পরিবার দুই পুরুষের পরিবার ছিল। তৃতীয় পুরুষের অর্থাৎ দৌহিত্র-পৌত্র পর্যায়ের প্রথম সন্তান দৌহিত্র শরৎচন্দ্র।

১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; আমার জন্ম ১২৮৮ সালের ২৬শে আশ্বিন। সুতরাং আমি যখন পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের বালক, শরৎচন্দ্র তখন দশ-এগারো বৎসর বয়সের কিশোর। সে সময়ে গাঙ্গুলী-পরিবারের একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। 'প্রাচীনেরা তখনো সংসার তরণীর হাল ধ'রে আছেন, দাঁড়ে বসেছেন নবীনেরা। তাতে গতি বেড়েছে, কিন্তু দুর্গতি বাড়ে নি। বাইরে তখনো চণ্ডীমণ্ডপে কর্তারা পাশা খেলা নিয়ে ডাকাত পড়াপড়ি করছেন, অন্দরে নবীনেরা খুলেছেন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের পাতা।" সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিকালে গাঙ্গুলী পরিবারের মতো একটি বৃহৎ ও জটিল সংসারে মানুষ হওয়ার ফলে শরৎচন্দ্র জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, উত্তরকালে সাহিত্য-সাধনার প্রতিপদে যা তাঁর উপকারে এসেছিল।

"তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের অবয়বে হঠাৎ এক-এক

সময়ে দেখতে পাই, প্রাচীন গাঙ্গুলী-পরিবারের কর্তা-গৃহিণী বউ-ঝিদের সুস্পষ্ট ঝিলিক। মাতুলালয়ের অনেক কাহিনী অনেক ঘটনা সামান্যমাত্র পরিবর্তিত হ'য়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে। শুধু 'শ্রীকান্তে'ই নয়, অন্যান্য বহু গ্রন্থেও। মাতুলদের নাম দিয়ে উপন্যাসের পাত্রদের নামকরণ করতে তিনি ভালবাসতেন। 'বড়দিদি'তে "সুরেন্দ্র", 'পরিণীতা'য় "গিরীন্দ্র", 'চরিত্রহীনে' "উপেন্দ্র" (উপীন) এবং 'বিপ্রদাসে' "বিপ্রদাস" এ কথায় সাক্ষ্য দেবে।"

গাঙ্গুলী-পরিবারের ঘটনা শরৎচন্দ্র সময়ে সময়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতেন, তার একটি দৃষ্টান্ত 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত ছিনাথ বহুরূপীর কাহিনী। ছিনাথ বহুরূপীর মূল কাহিনীটি বলবার আগে একটু পূর্বাভাস দিলে ভাল হয়।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমাদের ভাগলপুরের বাড়ি চার মহলে বিভক্ত। রাজপথ থেকে প্রথমে যে মহলে প্রবেশ করতে হ'ত, সে মহলকে আমরা 'চাপরাসী বাড়ি' বলতাম। আমাদের অভিভাবকেরা পুরুষানুক্রমে ভাগলপুরের কালেক্টারিতে চাকরি করতেন। আমাদের বাড়ির হেপাজতের জন্য তাঁরা কালেক্টারির চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় চাপরাসীকে বাড়িতে সর্বদা আশ্রয় দিতেন। তারা সকালে ভাত 'পাকাতো', দিনমানে কাছারিতে কাজ করত, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ভাং ঘুঁটতে ঘুঁটতে গীত গাইত, তারপর রাত্রে বড় বড় রোটি অথবা চাপাটি 'বানাতো'। তা ছাড়া তারা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখত যাতে চোর ছ্যাচোড় অথবা আজেবাজে লোক তাদের অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করতে না পারে।

এই দ্বিতীয় মহল ছিল চণ্ডীমণ্ডপের মহল। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি বৎসর নিয়মিত জগদ্ধাত্রীপূজা হ'ত। তা ছাড়া ছোট কাকামহাশয় একবার

ক্রমান্বয়ে চার বৎসর দুর্গাপূজাও করেছিলেন। মানত থাকলে সময়ে সময়ে কালীপূজাও হ'ত। তা ছাড়া প্রতিদিন বৈকাল হ'তে এই চণ্ডীমণ্ডপে পল্লীর মাতব্বরদের বৈঠক বসত।

সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের দুই পাশে দুটি ঘর, সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। পশ্চিম দিকের ঘরে পূজার সময়ে ভোগ সাজানো হ'ত। এই ঘরের উত্তর দিকে তৃতীয় মহলে ছিল ভোগ-রন্ধনের ঘর। তার সম্মুখে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে গোশালা, মরার (মরাই) এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনের ব্যবস্থা। এই তৃতীয় মহলের নাম ছিল ভোগের ঘরের মহল। এই মহল থেকে দক্ষিণমুখে প্রবেশ করতে হ'ত চতুর্থ অর্থাৎ অন্দর মহলে। অন্দর মহলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পুষ্পোদ্যান, যেখানে বড়দিদির সর্পাঘাত হয়।

সারা বৎসর চণ্ডীমণ্ডপের পূর্বদিকের ঘর পরিপূর্ণ থাকত সেই সকল সামগ্রীতে, কদাচিৎ যাদের ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়। পূজার সময়ে প্রতি বৎসর এই ঘরটি খালি করা হ'ত, এবং বাড়ি মেরামত ও চুনকাম করবার সময়ে আমাদের সনাতন রাজমিস্ত্রী হোসেনি এই ঘরটি নিয়েই সর্বাধিক বিব্রত বোধ করত। জিনিসপত্র সরানোর পর প্রতিবারই দেখা যেত, বড় মাঝারি এবং ছোট ফাঁদের বিশ-পঁচিশটি গর্তে ঘরটি একেবারে ঝাঁঝরা হ'য়ে আছে।

হোসেনি বলত, 'চুহার' (ইঁদুরের) গর্ত, ছেলের দল আমরা কিন্তু মনে করতাম, ইহ বাহ্য,—আসলে এগুলি কেউটে-গোখরোর বায়ু-পরিবর্তনের প্রবাসকক্ষ। বর্ষার জলে এঁদের বাসগৃহগুলি নিমগ্ন হ'য়ে গেলে এঁরা গঙ্গাতীরস্থিত ঝাউবন, রায়বাবুর নিবিড় ঘন আমবাগান প্রভৃতি নিকটবর্তী খাস-মহল থেকে শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করেন এবং চুহার গর্ত অবলম্বন ক'রে ঠেলে ওঠেন এই তাঁদের প্রাবৃটনিলয়ে। এখানে

তাঁরা নিরাপদ এবং আরামদায়ক 'ডেরা'ই শুধু পান না, সুকোমল চুহা-মাংসের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেও সমর্থ হন। ইচ্ছামতো গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্গত হ'য়ে প্রিয় খাদ্য দু-চারটে ব্যাঙ ধ'রেও উদরপূর্তি ক'রে থাকেন। বর্ষা ঋতু অন্তে অল্পকালের জন্য খাস-মহলে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর শীত পড়বার পূর্বেই পুনরায় ফিরে এসে পূর্বদিকের ঘরের উষ্ণ এবং মনোরম বিবরগুলিতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন। এই ছিল আমাদের মনের একান্ত বিশ্বাস।

হোসেনির সঙ্গে আমরা মত মিলিয়ে বলতাম, "চুহার গর্তই বটে; কিন্তু যেহেতু পূজার দিনে এই ঘরে নৈবেদ্য রাখা হয় এবং যেহেতু নৈবেদ্যের চাল-কলা চুহার পক্ষে অতিশয় প্রিয় খাদ্য, চুহার পথ তুমি বেশ ভাল ক'রে বন্ধ কর।" আমরা নিজেদের স্বার্থে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বেশ শক্ত ইট-পাথরের দ্বারা হোসেনিকে দিয়ে চুহার পথ বন্ধ করাবার ছলে চুহাখাদকদেরই পথ বন্ধ করাবার চেষ্টা করতাম। নিজেদের স্বার্থে কেন, সেই কথাটা এবার বলি।

চণ্ডীমণ্ডপের পূর্বদিকের এই ঘরটি চোর-কুটুরি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত সারা বৎসরই বন্ধ থাকত ব'লে বোধ হয় একে চোরা অর্থাৎ গুপ্ত বলা হ'ত; আর কটুরি হচ্ছে হিন্দী কোঠরি শব্দের বাংলা অপভ্রংশ, অর্থ কক্ষ। চোর-কুটুরিতে শুধু চুহাই (আমাদের মতে সর্পও) থাকত না, সময়ে সময়ে আমরাও থাকতাম। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে নিশ্চয়ই নয়, বাধ্য হ'য়ে। আমাদের আচরণের মধ্যে কখনো তেমন অশিষ্টতা প্রকাশ পেলে দণ্ডস্বরূপ আমাদিগকে চোর-কুটুরিতে আবদ্ধ ক'রে রাখা হ'ত। চোর-কুটুরির দণ্ড আমরা অভিভাবকদের হাত থেকে যত-না পেতাম, তার অনেক বেশি পেতাম সংসারের দুজন পুরাতন ভৃত্য —মাণিক ও মুশাইয়ের হাত থেকে। মাণিক তবুও খানিকটা সদাশয়-

প্রকৃতির মানুষ ছিল; মুশাইয়ের তীক্ষ্ণ চক্ষু ও খাড়া নাসিকার মধ্যে দয়ামায়ার কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না।

চোর-কুটুরিতে আমরা মাণিক কিংবা মুশাইয়ের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি সংবাদ পেলে মেয়েরা চিন্তিত হ'য়ে উঠতেন। কর্তাদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলতেন, "ওগো, ছেলেটাকে শেষে কি সাপে খাবে? খুলে দিতে বল।" কর্তারা এমন অনুরোধে বিশেষ কর্ণপাত করতেন না; বলতেন, "না, না, এই সেদিন ভাল ক'রে মেরামত করা হয়েছে, সাপ আসবে কেমন ক'রে? দেবে অখন একটু পরে খুলে।" সমীচীন মনে ক'রে মাণিক-মুশাই যা করেছে, সহজে কর্তারা তার উপর হস্তক্ষেপ করতেন না।

অগত্যা দরবার করতে হ'ত স্বয়ং মুশাইয়েরই কাছে। অপ্রসন্ন কণ্ঠে মুশাই বলত, "দিচ্ছি খুলে। কিন্তু তোমরা যদি এমনি ক'রে আস্কারা দাও, তা হ'লে ছেলেদের দুরস্ত করি কি ক'রে?"

এই ছিল বছর ষাটেক আগেকার কাল। মাণিক-মুশাইরা বহুকাল হ'ল লুপ্ত হয়েছে ও চোর-কুটুরিতে আবদ্ধ করা এখন ফৌজদারি ধারার অন্তর্গত, এখন যদি ছেলের বাপ চোর-কুটুরির পরিবর্তে সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে ক্ষণকালের জন্য ছেলেকে আটকে রাখে, তা হ'লে পরদিনের সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে হয়, খোকা বাপ! অন্যায় করেছি, অনুতপ্ত হয়েছি। তোমার জননী শয্যাগত। বাড়ী ভাতে ব'সে পড়বে এস।

তখনকার ছেলেরা কিন্তু মাণিক-মুশাইয়ের দণ্ডবিধান নীরবে নির্বিরোধে মাথা পেতে নিত।

কথায় কথায় মূল কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, গৌরচন্দ্রিকা হ'য়ে গেছে দীর্ঘ,—এবার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ছিনাথ বহুরূপীর মূল কাহিনীটা বলি।

৪

আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে 'চাপরাসী মহল' থেকে চণ্ডীমণ্ডপের মহলে প্রবেশ করতে হ'লে দশ-এগারো হাত দীর্ঘ একটি গলিপথ অতিক্রম করবার প্রয়োজন হ'ত। এই গলিপথের এক দিকে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ মহলের পূর্বদিকের কক্ষ এবং বারান্দা; অপর দিক ছিল উচ্চ দেওয়ালের দ্বারা চাপা; আর, উর্ধ্বদিক ছিল পূর্বোক্ত কক্ষ এবং বারান্দার সহিত সমানভাবে আচ্ছাদিত। সুতরাং দুই দিকের দুই প্রান্ত ব্যতীত গলিতে আলোক প্রবেশ করবার তৃতীয় পথ ছিল না। সেজন্য দিনের বেলা অবশ্য কোনো অসুবিধা হ'ত না। সন্ধ্যা থেকে কিন্তু গলির ভিতর অন্ধকার জমাট বাঁধতে আরম্ভ করত।

প্রতিকারস্বরূপ গলির মধ্যস্থলে একটা কাঁচের চতুষ্কোণ সাবেক-কেলে বাতি জ্বলত; কিন্তু তার দ্বারা অন্ধকার কমত অথবা বাড়ত, তা সব সময়ে ঠিক বোঝা যেত না। বাতিটার চারপাশে কাঁচের ব্যবস্থা, উপরের অংশ আর তলার দিক টিন দিয়ে নির্মিত। ভিতরে জলত একটা নিষ্প্রভ-শিখর তেলের ডিবে। তা থেকে যেটুকু রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'ত তার প্রায় সবটাই অপচায়িত হ'ত গলিপথের উর্ধ্বাংশ আলোকিত করবার অপকার্যে। বাতির তলার দিকের টিনের আবরণ অতিক্রম ক'রে সামান্য যেটুকু আলোক নীচের দিকে নামত, তার মধ্যে আলোকের প্রসাদগুণ থাকত না। যে গুণ থাকলে শ্রবণ মাত্র অর্থগ্রহ হয়, তাকে ভাষার কিংবা কাব্যের প্রসাদগুণ বলে। সুতরাং যে গুণ থাকলে দর্শন মাত্র বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান হয়, তাকেই বলছি আলোকের প্রসাদগুণ। অর্থাৎ, যে সামান্য আলোক তলার দিকে পৌঁছে আমাদের কাজে লাগত

তার মধ্যে মাণিককে দর্শন মাত্রই সব দিন মাণিক ব'লে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাত না। সে যে একজন মানুষ—এমন কি পুরুষ মানুষ, তা অবশ্য বোঝা যেত ; কিন্তু সে মুশাই নিশ্চয়ই নয়, মাণিক—দর্শন মাত্র এ ধারণা উৎপন্ন হবার জন্য উজ্জ্বলতর আলোকের প্রয়োজন থাকত।

যে কাহিনী বলতে উদ্যত হয়েছি, তার একটি গুরুতর অংশ এই গলিপথের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তাই এখানকার আলো-অন্ধকারের রহস্য একটু বিস্তারিতভাবে বিবৃত করলাম।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। পাড়ার মাতব্বরদের বৈঠক ক্ষণকাল পূর্বে ভেঙে গিয়ে যে-যার আপন-আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা নেয়ারের খাটিয়ায় শয়ন ক'রে নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে জেঠামহাশয় কেদারনাথ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছেন।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপের ঘরের ভিতর চোর-কুটুরির কাছ ঘেঁষে একটা উঁচু ডেল্‌কোর (কাঠের পিলসুজের) উপর বড় একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলচে। তার চতুর্দিক ঘিরে ছেলের দল যথারীতি লেখাপড়া করছে। ছেলের দল, অর্থাৎ বড়দাদা, মেজদাদা, সেজদাদা, দাদা, ছোড়দাদা প্রভৃতি অগ্রজদের দল। এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল—ফোঁস্।

অব্যবহিত পার্শ্বেই সেই কুখ্যাত চোর-কুটুরি, যার স্থানমাহাত্ম্যের সহিত এই ফোঁস্ শব্দের একটা ক্রিয়াকারণগত যোগ সহজেই আশঙ্কা করা যেতে পারে। চোর-কুটুরি এবং চণ্ডীমণ্ডপ কক্ষের মধ্যে একটা আম-কাঠের তক্তার দরজা আছে বটে, এবং সে দরজায় একটা লোহার মজবুত তালা লাগানো আছে তাও সত্য, কিন্তু সে তালার কল্যাণে চোর-কুটুরিতে চোরের অনায়াস প্রবেশের পক্ষে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়ে

থাকলেও আমকাঠের তক্তার সহজ বক্রতাশীলতার গুণে দরজার দুই পাল্লার মধ্যে, বিশেষ ক'রে একেবারে তলার দিকে, যে ফাঁক বর্তমান, তার মধ্য দিয়ে মেজো সেজো আকারের তো কথাই নেই, বড় আকারের ফোঁস্-শব্দকারীদেরও চোর-কুটুরি হ'তে চণ্ডীমণ্ডপে মুক্তিলাভের পক্ষে কোনো অসুবিধাই ছিল না। সুতরাং ফোঁস্ শব্দ শুনে ত্রস্ত ছেলের দল পড়ায় বিরতি দিয়ে চকিতনেত্রে ক্ষণকাল পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

মিনিট খানেক আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সুতরাং, সামান্য একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ছেলেরা পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করলে। কিন্তু মিনিট দুয়েক যেতে-না-যেতে আবার ফোঁস্! এবার আরও জোরে, আর যেন বেশ-খানিকটা কাছে। বই ফেলে ছেলেরা দু হাত ভূমিতে স্থাপন ক'রে উবু হ'য়ে বসল। বাঁ পা একটু আগে, ডান পা পিছনে। ভাবটা, আর একবার শব্দ হয়েছে কি, একেবারে টেনে—

এমন সময়ে পুনরায় সজোরে ফোঁস্!

'বাপ রে, মা রে, খেলে রে' বলতে বলতে দুদ্দাড় ক'রে ছেলেরা উঠে পড়ল। কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। ঠেলাঠেলিতে ডেল্‌কো গেল উল্টে, প্রদীপ গেল নিবে। অন্ধকারে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠল। চেঁচামেচি, দাপাদাপি, হৈ-হল্লার একটা যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। প্রত্যেকেই মনে করছে, গোখরো সাপটা বেরিয়ে প'ড়ে তারই পায়ে যেন জড়িয়ে ধরেছে। সকলেই বারান্দায় বেরিয়ে পড়বার জন্যে উন্মুখ।

ও-দিকে চেঁচামেচিতে জেগে উঠে দুজন ছেলেকে দুই বাহুর মধ্যে চেপে ধ'রে জেঠামহাশয় চীৎকার করছেন, "কি হ'ল রে! কি হ'ল রে!" উত্তরে কেউ বলছে 'সাপ', কেউ বলছে 'বাপ', কেউ বলছে আর কিছু।

চণ্ডীমণ্ডপে যখন এই তাণ্ডব লীলা চলছে, সম্ভাবনাসঙ্কুল সেই স্বল্প মুহূর্তে পূর্বোক্ত গলিপথে অকারণ একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল। কোথায় চোর-কুটুরির মধ্যে ফোঁস্ শব্দ, আর কোথায় হাত পঞ্চাশ দূরে গলিপথে তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া! দৈব যখন নিজের খেয়ালে নিজে ব্যবস্থা করে, তখন কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আবার গড়িয়েও যায় নি, লাফিয়ে গেছে।

লঘুভার ভট্টাচার্য মহাশয় গাড়ুহস্তে গলির পথ দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের মহলে ফিরে চলেছিলেন। আমাদের গৃহে কোনো পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্য অপরাহ্ণের ট্রেনে মুঙ্গের থেকে এসেছেন। গলিপথের মাঝ বরাবর পৌঁছেছেন এমন সময়ে কানে প্রবেশ করল চেঁচামেচির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন জেঠামহাশয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'কি হ'ল রে! কি হ'ল রে!'

থমকে দাঁড়ালেন ভট্টাচার্য মহাশয়। মনে মনে সম্ভবত বিচার করলেন, 'কি হ'ল' সেটা যখন পরে নিঃসন্দেহ জানা যাবে, তখন উপস্থিত তদ্বিষয়ে কৌতূহলী হ'য়ে নিজেকে বিপন্ন করা মূর্খের কাজ হবে। যা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিছু গুরুতর ব্যাপারই হয়েছে ; সুতরাং 'যে পালায় সেই বাঁচে' নীতি অবলম্বন ক'রে উপস্থিত স'রে পড়াই বিধেয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে যে-পথে এসেছিলেন, দ্রুতপদে সেই পথেই ফিরে চললেন।

ঠিক সেই পরম মুহূর্তে গলিপথে প্রবেশ করলে লাঠি হস্তে তিন-চার জন উত্তেজিত চাপরাসী। কোলাহল শুনতে পেয়ে তারা অকুস্থলে ছুটে চলেছে। সেদিন বোধ হয় গলিপথের বাতির আলোর প্রসাদগুণের বেশ কিছু ঘাটতি ছিল, তার ওপর ভিতরে কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে গলিপথে এক ব্যক্তি তৈজস হস্তে দ্রুতগতিশীল,—আর যায় কোথায়! 'শালা

চোট্টা!' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে একজন চাপরাসী লাঠি ফেলে দু হাত দিয়ে ভট্টাচার্য মহাশয়কে জাপ্টে ধরলে, আর বাকি সকলে তাঁর দেহের উপর অবিশ্রান্ত মুষ্টি বর্ষণ ক'রে চলল।

ভট্টাচার্য মহাশয় অবশ্য ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করতে লাগলেন, 'ওরে আমি, চোট্টা নই। আমি ভট্‌চাযবাবু।' কিন্তু অত গোলমাল চেঁচামেচিতে কে কার কথায় কান দেয়? যে চাপরাসী ভট্টাচার্য মহাশয়কে চেপে ধরেছিল, দুই বাহুর উপর তাঁকে তুলে নিয়ে চ্যাং-দোলা ক'রে ঝোলাতে ঝোলাতে একেবারে বমাল চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। তারপর ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিয়ে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়ভাবে তাঁর বাম হস্তের মণিবন্ধ ধ'রে থেকে জেঠা-মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "হুজুর, মাল লেকে শালা ভাগ্ রহা থা, চোট্টাকো পকড় লায়া।" তখনো ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে মাল ঝুলছে; অত দুঃখকষ্টেও ছাড়েন নি।

গোলমাল শুনে ইতিমধ্যে চাকরেরা গোটা তিন-চার লণ্ঠন নিয়ে হাজির হয়েছিল। গোখরো সাপের ফোঁস-ফোঁস্থনির উৎকট হাঙ্গামার মধ্যে এ এক সম্পূর্ণ নূতন ফেঁকড়ার উদ্ভব দেখে বিস্ময়ে সকলে একেবারে হতবাক্! জেঠামহাশয় বললেন, "চোট্টা নেহি হায়, ভট্‌চাযবাবু হায়। ছোড় দেও!"

আঁতকে উঠে ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে সন্ত্রস্তকণ্ঠে চাপরাসী বললে, "হায় রে বাপ! ভট্‌চাযবাবু!" তারপর করজোড়ে নত হ'য়ে বললে, "গোড় লগি মহারাজ।"

ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্বোধন ক'রে জেঠামহাশয় বললেন, "কি ব্যাপার ভট্‌চায?"

কাতরকণ্ঠে ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন, "আর বল কেন ভায়া—প্রারব্ধ।"

চাপরাসী বললে, "জী মহারাজ! সনযোগকা বাত হ্যায়।"

এমন সময়ে একজন চাকর একটা চাবির রিঙ এনে জেঠামহাশয়ের হাতে দিলে। জেঠামহাশয় চোর-কুটুরির তালার চাবি আনতে পাঠিয়েছিলেন। আপাততঃ প্রারব্ধ এবং সংযোগের প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে সাপের রহস্যের সমাধানে তিনি মনোযোগী হলেন। ইতিমধ্যে বার দুই স্বকর্ণে এবং সদলে চোর-কুটুরির ভিতর ফোঁস্ আওয়াজ শুনেছেন, এবং ঐ শব্দ যে, কোনো ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের, সে বিষয়েও মনে মনে এক রকম নিঃসন্দেহ হয়েছেন। অতঃপর এ বিষয়ে কোনো একটা ব্যবস্থা না ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা কিছুতেই চলে না।

তিন দলে সজ্জিত হ'য়ে সকলে চোর-কুটুরির দরজার সম্মুখে সারি দিয়ে দাঁড়াল। একেবারে পুরোভাগে রইল চাপরাসী ও চাকরদের দল, তার পিছনে কর্তাদের দল এবং সর্বপশ্চাতে ছেলেদের দল। একজন চাকর সন্তর্পণে তালা খুলে শিকল নামিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ধীরে ধীরে খুলে দিলে। সামনের জন দুই চাপরাসী সজোরে লাঠি বাগিয়ে ধরল; দেখতে পাওয়া কি একেবারে ধড়াধ্বড়! কিন্তু অত কাঠ-কাঠরার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ব'সে আছে, খুঁজে বার করা কি সহজ কথা?

একজন চাপরাসী সাহসে ভর ক'রে একটা লণ্ঠন ঘরের ভিতর খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যৎপরোনাস্তি সাবধানতার সহিত ইতস্তত 'হুলকি' (উঁকি) মারতে আরম্ভ করেছে, আর পিছনের সমস্ত জনতা তার পর্যবেক্ষণের ফলের প্রত্যাশায় নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে—এমন সময়ে বেশ জোরে শব্দ হ'ল, ফোঁস্!

সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণকারী চাপরাসী থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যন্ততম

বালক পর্যন্ত সমগ্র জনতা হা-হা করতে করতে হাত দুই-আড়াই পিছু হ'টে এল। কিন্তু এ কি! পূর্বধারণার বশবর্তী হ'য়ে অতর্কিতে ভয় পেয়ে জনতা পিছুই হটুক আর যা-ই করুক, দরজা খোলার পর যে ফোঁস্ শব্দ শোনা গেল তা যেন ঘরের মধ্যের শব্দ নয়,—যেন অন্য কোনো জায়গা থেকে এল ব'লে মনে হ'ল।

কর্তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিকের জানলার ধারে গিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "পাশে দেওয়ালের কাছে একটা কিন্তু গরু দাঁড়িয়ে আছে।"

ডান হাত তুলে জেঠামহাশয় বললেন, "সবাই একটু চুপ ক'রে থাকো।"

নির্বাক নিঃশব্দ হ'য়ে সকলে দাঁড়িয়ে রইল উৎকর্ণ অবস্থায়। মিনিট খানেক গত হ'ল, কোনো সাড়াশব্দ নেই। দুই-একজন ছেলে সবেমাত্র অধীর হ'য়ে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি আরম্ভ করেছে, এমন সময় অকস্মাৎ শব্দ হল, ফোঁস্!

একটা উচ্চ হাস্যরবে সমস্ত কক্ষ প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল। যে চাকর চোর-কুটুরির তালা খুলেছিল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জেঠামহাশয় বললেন, "তালা লাগিয়ে চাবি ভিতরে দিয়ে আয়।"

একটা গরু সমস্তক্ষণ মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছে, আর এক ঘর লোককে গোখরো সাপের ভয় দেখিয়েছে। ক্ষণকাল পূর্বে সে হয়তো আরও খানিকটা পূর্বদিকে চোর-কুটুরির ঠিক পাশে ছিল, তাই তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ চোর-কুটুরির ভিতর প্রবেশ ক'রে ক্রুদ্ধ বিষাক্ত সর্পের আস্ফালনে পরিণতি লাভ করছিল।

আশ্বস্ত হ'য়ে ছেলের দল পুনরায় জেল্‌কো বসিয়ে প্রদীপ জেলে পড়তে বসল। ভট্টাচার্য মহাশয়কে নিয়ে জেঠামহাশয় বারান্দায় এসে খাটিয়ার উপর উপবেশন করলেন।

গলিপথের ঘটনা নিয়ে কথোপকথন চলছিল। কথায় কথায় জেঠামহাশয় আসল কথাটা ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় বলছিলেন, "আর ব'লো না কেদারনাথ, তোমার চাপরাসীরা আজ আমার দেহের কিছু আর বাকি রাখে নি। গরম সরষের তেল দিয়ে ঘণ্টাখানেক মালিশ না করলে কাল সকালে আর উঠতে হবে না।"

জেঠামহাশয় বললেন, "চাপরাসীরা অন্যায় কিছুই করে নি, তারা তোমার উপকারই করেছে।"

হো-হো ক'রে হে'সে উঠে ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন, "চমৎকার উপকার করেছে! উপকারের চোটে এতক্ষণে বোধ হয় পিঠে আর কাঁধে বড় বড় কালসিটে পড়েছে।"

জেঠামহাশয় বললেন, "তা পড়ুক, তবু উপকার করেছে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছে তারা। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে কোথায় তুমি তাদের সাহায্যে ছুটে আসবে, তা নয় নিজের প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিলে! সেই পাপের দণ্ড তুমি হাতে হাতে পেয়েছ। তুমি বলছিলে প্রারব্ধ। প্রারব্ধ তো পূর্বজন্মের পাপের হয়। এ একেবারে টাটকা পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা হাসির কলধ্বনি উঠল। সে হাসিতে যোগ দিতে ভট্টাচার্য মহাশয়ও বাধ্য হলেন।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ছিনাথ বহুরূপীর এই হ'ল মূল কাহিনী। মূল কাহিনীর নির্বাক জন্তু গাভী শরৎচন্দ্রের কাহিনীর কলাচাতুর্যের জাদুদণ্ডের স্পর্শে মুখর ছিনাথ বহুরূপীতে পরিণতি লাভ করেছে। শিল্পী শরৎচন্দ্র গাভীর মৃত্তিকা দিয়ে ছিনাথ বহুরূপীর পুতুল গড়েছেন। উভয় কাহিনীতে ভ্রান্তির বস্তু কিন্তু হিংস্র জন্তু—সর্প এবং

ব্যাঘ্র। মূল কাহিনীতে গাভীতে সর্পভ্রম হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের গল্পে ছিনাথ-বহুরূপীতে ব্যাঘ্রভ্রম হয়েছে। বাস্তব এবং কল্পনা উভয়ের মিশ্রণে শরৎচন্দ্র ছিনাথ বহুরূপীর অপরূপ কাহিনী রচিত করেছেন।

এই বাস্তব এবং কল্পনা মিশিয়ে সাহিত্য গ'ড়ে তোলাই হচ্ছে প্রকৃত শক্তিমান সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্য জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি, এই উক্তি যাঁরা প্রচার করেন অথবা বিশ্বাস করেন, অর্ধ-সত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়। এই উক্তি যতটা সত্য, বোধ করি ততটাই ভ্রান্ত।

Anatole France তাঁর Garden of Epicurus গ্রন্থে লিখেছেন, "Truth is not the objective of Art. It is the Science we must appeal to for that, as it is what they aim at; not to literature, which has, and can have, no objective but beauty. * * If we are to have a really pretty story, the bounds of everyday experience and usage must needs be a little overstepped."

শরৎচন্দ্রও ঠিক এই মতই পোষণ করতেন, এবং তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির কার্যে এই নিয়মেরই করিতেন অনুবর্তন।

সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে শক্তিমত্তার একটা মাপকাঠি হচ্ছে ঘটনা, বস্তু অথবা ব্যক্তিকে সাধারণত্বের দৈন্য থেকে মুক্ত ক'রে অসাধারণ ক'রে তোলবার ক্ষমতা। সে ক্ষমতার অভাবে যে বস্তু সাধারণ, যে বস্তু বিশেষত্ববর্জিত, তার স্থান সাহিত্যের এলাকার বাইরে।

সাহিত্য সৃষ্টির আর একটা বড় কথা হচ্ছে বাছাইয়ের কথা। উপাদানসমূহ হ'তে ঠিক ঠিক বস্তু সুনির্বাচিত ক'রে নিয়ে প্রয়োজনে লাগাবার রসজ্ঞান। যুঁইফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে সাজি থেকে একটা বৃহৎ এবং সুন্দর পদ্মফুল নিয়ে মাথার মধ্যে বসিয়ে দিলেই উৎকৃষ্ট

মালা গাঁথা হয় না। তাই বাছাইয়ের কাজের আর একটা অর্থই হচ্ছে ছাটাইয়ের কাজ। যূঁইফুলের মালা গাঁথিতে গিয়ে সাজির পদ্মফুলকে ছাঁটাইয়ের মধ্যেই ফেলতে হবে, তা সে পদ্মফুল যত চমৎকারই হোক না কেন। যূঁইফুলের মালার মধ্যে সুযোগমতো হয়তো এক-আধটা গোলাপফুল বসানো যেতে পারে; কিন্তু সে গোলাপ ছোট আকারের হওয়া দরকার, আর টকটকে লাল রঙের হ'লেও চলবে না। ফিকে গোলাপী, সাদা অথবা হলদে গোলাপ হওয়া চাই; অন্যথা রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে ছন্দঃপতন হবে।

যে কথা মালার বিষয়ে সত্য, সাহিত্যের বিষয়ে সে কথা অসত্য নয়। প্রতিদিনকার অপরিবর্তিত জীবন অথবা জীবনাংশকে রচনার খাতার মধ্যে হুবহু বসিয়ে দিলেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ছাঁটাই-বাছাই ও গালাই-ঢালাইয়ের পদ্ধতির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন অথবা জীবনবস্তুকে সাহিত্যের বস্তু ক'রে নিতে হয়। তাই, রচনার মধ্যে লেখককে অথবা লেখকের জীবনের ঘটনাবলীকে খুঁজে পাবার জন্যে যাঁরা অযথা ব্যস্ত হন, মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ানোর মতন তাঁদের হতাশ হ'তে হয়।

কৌতূহলী পাঠকেরা মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীকান্ত স্বয়ং শরৎচন্দ্র কি-না? উত্তরে আমি বলি, চিনিকে যদি সন্দেশ বলা যায়, তা হ'লে শরৎচন্দ্রকেও শ্রীকান্ত বলা চলতে পারে। অনেক পাঠকই এই ক্ষুদ্র উত্তরে তাঁদের প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর লাভ ক'রে সন্তুষ্ট হন। আবার, কেউ কেউ তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষমতার বিষয়ে আমার দৈন্য উপলব্ধি ক'রে আমার প্রতি শ্রদ্ধা হারান।

শরৎচন্দ্র নিজেও মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রশ্নের দ্বারা বিপন্ন হতেন। একবার আমার কাছে দুঃখ ক'রে তিনি বলেছিলেন, লোকের ধারণা

শ্রীকান্ত চরিত্রে আমি নিজেকে এঁকেছি। আচ্ছা, বল দেখি, এ কথার কোনো মানে হয়? 'শ্রীকান্ত' যদি আমার জীবনকথা হ'ত, তা হ'লে তো তার মধ্যে তুমিও থাকতে, সুরেনও থাকত, গিরীনও থাকত। আছ কি তোমরা 'শ্রীকান্তে'?

এ কথার উত্তরে আমি বলেছিলাম, যাঁদের ও-রকম ধারণা, তাঁরা হয়তো এই কথাই বোঝাতে চান যে, শ্রীকান্ত চরিত্রে তুমি তোমার নিজের চরিত্র, নিজের প্রকৃতি এঁকেছ।

এ কথার উত্তরে শরৎচন্দ্র একটা মজার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাই যদি আঁকব উপীন, তা হ'লে আমার চেয়ে আরও অদ্ভুত, আরও খেয়ালী চরিত্রই বা আঁকলাম না কেন? তা-ও তো আমি পারি।

তা ছাড়া আমার মনে হয়, নিজের প্রকৃতি নিজে অঙ্কিত করা দুরূহ কার্য। কোনো বস্তুকে ভাল ক'রে দেখবার অথবা ভাল ক'রে জানবার জন্য খানিকটা দূরত্বের, খানিকটা বিচ্ছিন্নতার একান্ত প্রয়োজন। চোখের নিকটতম সান্নিধ্যে বস্তু থাকলেই তাকে যে স্পষ্টতম ভাবে দেখা যায়, তা নয়। তাই একজন চিত্রকরের পক্ষে নিজের আকৃতি আঁকা যতটা কঠিন কাজ, ঠিক ততটা কঠিন কাজ একজন লেখকের পক্ষে নিজের প্রকৃতি আঁকা।

শ্রীকান্ত চরিত্রে শরৎচন্দ্র নিজেকে অঙ্কিত করেছেন কি-না সে প্রশ্নের এখনি যদি আমাকে উত্তর দিতে হয়, তা হ'লে আমি বলব—না, আঁকেন নি। তবে শ্রীকান্ত চরিত্রে মাঝে মাঝে তিনি যেরূপ ঝিলিক মারেন, উপেন্দ্র-চরিত্রে অথবা বিপ্রদাস-চরিত্রে তেমন মারেন না। সুতরাং অসতর্ক মুহূর্তে লেখক যে, কোনো-কোনো চরিত্রে নিজেকে একটু-আধটু ধরা দেন, সে কথা বলা যেতে পারে।

৫

মধুসূদনের একটা কাজ হচ্ছে অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ ক'রে বেড়ানো। যেখানে দর্প তার উদ্ধত ফণা উঁচু ক'রে অভিমানের বিষবাষ্প ত্যাগ করতে থাকে, নিঃশব্দে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে লগুড়াঘাতের দ্বারা মধুসূদন তাকে চূর্ণ করেন। তাই মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় নাম দর্পহারী মধুসূদন।

পৌরাণিক কালে দেব, দৈত্য, মুনিঋষিদেরও মধুসূদন রেহাই দিতেন না; সুযোগ উপস্থিত হ'লেই তাঁদের দর্প চূর্ণ করতেন। তাঁরই প্রতি ভক্তিমত্তার বিষয়ে একজন সামান্য কৃষকের সহিত মহামুনি নারদের পরীক্ষায় কিরূপে তিনি নারদের দর্প চূর্ণ করেছিলেন, সে কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। আধুনিক কালে দেব, দৈত্য, মুনিঋষির শ্রেণী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মধুসূদন সুযোগমতো মানুষের দর্প চূর্ণ ক'রে ক'রে নিজের অভ্যাস এবং শক্তি বজায় রেখে চলেছেন। একবার আমার উপর দিয়েও কিরূপে তিনি তাঁর অভ্যাসের অনুশীলন করেছিলেন, সেই কথাটা বলি।

আজকাল যেমন ঘরে ঘরে বক্স-হারমোনিয়ম দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের বাল্যকালে তেমন ছিল না। তখন হারমোনিয়ম বিদেশের নূতন আমদানি,—একটা যৎপরোনাস্তি বিস্ময় এবং কৌতূহলের সামগ্রী। ঠোঁটকাটা মানুষের দাঁতের মতো সাদা পরদাগুলি সর্বদা উন্মুক্ত অবস্থায় প্রস্তুত হ'য়ে আছে, পিছনের হাপরে একটু চাপ দিয়ে যে-কোন পরদায় আঙুল বসালেই পোঁ ক'রে আওয়াজ মারে! এ হেন কৌতুকপ্রদ ব্যাপার

যখন একেবারে পুরানো হ'য়ে বাসি মেরে যায় নি, সেই সময়ে আমাদের পূর্ণিমার সংসারে একটি হারমোনিয়মের শুভপ্রবেশ হ'ল।

দাদা ছিলেন আমাদের সংসারে সবরকম নূতন ধারার ভগীরথ রামায়ণ-মহাভারত-অন্নদামঙ্গল-আরব্যউপন্যাসকে অতিক্রম ক'রে বাংলা ভাষার নূতনতম সাহিত্যের ধারা সংসারে তিনিই এনেছিলেন, সঙ্গীতের ধারাও তিনি আনলেন।

যেদিন হারমোনিয়মটি আমাদের সংসারে প্রথম প্রবেশ করল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। একটি মজবুত দেবদারু কাঠের বাক্সের মধ্যে সযত্নে প্যাক করা হারমোনিয়মের নিজস্ব বাক্স এবং সেই বাক্সের ভিতর কাগজ ও তুলোর নানা প্রকার চাপাচাপির মধ্যে হারমোনিয়মটি এমন দৃঢ়ভাবে রাক্ষিত যে, পথের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে বাক্সের মধ্যে নড়ন-চড়নের দ্বারা আহত হবার তার তিলার্ধ সুযোগ ছিল না। দুটি কাঠের আবরণ ভেদ ক'রে হারমোনিয়মটি আত্মপ্রকাশ করা মাত্র তার সুঠাম কমনীয় মূর্তি দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল পালিশ করা কালো রঙের কাঠের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা,—টি. ই বিভন অ্যাণ্ড কোং, ক্যালকাটা প্যারিসেন ব্রুনের (ব্রুনো ?) হারমোনিয়ম। বাক্সের মধ্যে রাখবার সময়ে দুদিকের দুটি মসৃণ মোটা পিন (knob) টিপে সামনের দিকের খানিকটা অংশ পিছনের দিকের অংশে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। ব্যবহারের পূর্বে সামনের দিকে টান দিলে গুপ্ত অংশটি বেরিয়ে এসে স্প্রিং এর পিনের জোরে দৃঢ় হ'য়ে আটকে থাকে। স্বরটি সুমিষ্ট সুরেলা এবং ঈষৎ মিহি ধরনের। পিছন দিকে হাওয়া দেবার বেলো আজকালকার হারমোনিয়মের বেলোর ন্যায় একহারা নয় চার-পাঁচ ভাঁজের দীর্ঘ টানা বেলো।

সন্ধ্যার পর দাদা এবং মেজদাদা হারমোনিয়ম নিয়ে স্বরসাধনায়

বলতেন। সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা—সে সাধনার ছিল প্রথম পাঠ। কিছুদিনের পর স্বরের অক্ষর-পরিচয় ছেড়ে গতের দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করলেন। প্রথম যে দিন দাদা 'সা রে গা মা'র পরিবর্তে 'নি সা ধা নি পা গা মা পা মা গা রে স' গৎটি বাজাতে আরম্ভ করলেন, সেদিন আমাদের মনে হ'ল, হারমোনিয়ম কেনা সার্থক হয়েছে, দাম উঠেছে; এখন যদি হারমোনিয়ম চুরিও যায়, খুব বেশি দুঃখের কথা হয় না।

তখনকার দিনে এই 'নি সা ধা নি পা' গৎটি ছিল স্বর-পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ। সঙ্গীতের দুরূহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার এটি ছিল ছাড়পত্র। সুতরাং স্বর সপ্তকের আরোহণ অবরোহণ আয়ত্ত করার পর সারা বাংলা দেশ এই 'নি সা ধা নি পা' গৎটির সাধনা আরম্ভ করত। কোন সঙ্গীতসাগর স্বর-পরিচয়ের এই দ্বিতীয় ভাগটি রচিত করেছিলেন তা জানি নে, কিন্তু বহুদিন ধ'রে এটি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়েরই মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে বিপুল প্রচলনের অধিকারী হয়েছিল। আজকালকার বাজারে বহু-বিচিত্র স্বর পরিচয় প্রচলিত হওয়ার ফলে 'নি সা ধা নি পা' বোধ করি অপ্রচলনের অন্ধকার গহ্বরে আত্মগোপন করেছে।

দাদাদের হারমোনিয়ম বাজানো শেষ হওয়ার পর বাক্সর ভিতর হারমোনিয়ম তুলে রাখার অপ্রীতিকর কাজের ভার আমি নিজের কাঁধে নিতে লাগলাম। এই ভার গ্রহণ করাকে নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তি ব'লে মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে। বাদামের কঠিন খোলার মধ্যে নরম শাঁস যেমন লুকিয়ে থাকে, আমার হারমোনিয়ম তুলে রাখার মধ্যে তেমনি লুকিয়ে থাকত একটা লোভনীয় উদ্দেশ্য। বেলো বন্ধ করবার সময়ে যথাসম্ভব দীর্ঘ চাপের সুযোগে কয়েকটা পরদা টিপে সুর বার ক'রে মনুষ্যজন্ম সার্থক করাই ছিল আমার প্রকৃত অভিপ্রায়।

কিন্তু অল্প আস্বাদনের অতৃপ্তির তাড়নায় ক্রমশ লোভ উঠল বেড়ে। কি উপায়ে একটু জুৎ ক'রে হারমোনিয়ম বাজানো যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করতে করতে অবশেষে মনের মধ্যে একটা ফন্দী দেখা দিল। বউদিদিকে বোঝালাম, যে সময়ে বাবা এবং দাদা আদালতে থাকেন, সেই সময়ে আমাদের দুজনের পক্ষে লুকিয়ে লুকিয়ে হারমোনিয়ম শিখে ফেলার মাহেন্দ্রক্ষণ। হারমোনিয়ম শেখবার লোভে প'ড়েই হোক, অথবা আমার অন্তরের আকুতি উপলব্ধি ক'রেই হোক, বউদিদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। তবে আর ভাবনা কিসের? হারমোনিয়মের বাক্সের চাবি তো বউদিদির আঁচলেই ঝোলে।

তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরে বই-খাতা ফেলেই হারমোনিয়ম খুলে বসি। কাজকর্মের সময়,—পাঁচ-সাত মিনিট অভ্যাস ক'রেই বউদিদি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়েন, আমি একান্ত মনে সাধনায় রত হই। তারপর, বাবা ও দাদা বাড়ি ফেরবার অব্যবহিত পূর্বে হারমোনিয়ম তুলে রেখে ভালমানুষ সাজি।

কিছুকাল এইভাবে চলার পর একদিন বউদিদি আমাকে দাদার কাছে হাতে নাতে ধরিয়ে দিলেন। দাদা 'নি সা ধা নি পা' সাধছিলেন, অকস্মাৎ আমার উপস্থিতিতেই বউদিদি ব'লে বসলেন, "এ শহ উদ্দীন তোমার চেয়ে ভাল বাজাতে পারে।"

বউদিদির কথা শুনে আমি তো আর আমাতে রইলাম না। ভারি রাগ হ'ল তাঁর ওপর—প্রথমত, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে ধরিয়ে দিলেন ব'লে, এবং দ্বিতীয়ত, দাদার তুলনায় আমাকে বড় করবার জন্যে।

শুধু ধরিয়ে দিয়েই বউদিদি নিরস্ত হলেন না, পীড়াপীড়ি ক'রে দাদার সম্মুখে আমাকে বাজাতেও বাধ্য করলেন। নাচতে উঠে ঘোমটা টানার নিষেধ আছে, আমিও সেদিন ঘোমটা না টেনে যথাসাধ্য ভাল ক'রেই

বাজিয়েছিলাম। মনে হ'ল, আমার বাজনা শুনে দাদা খুশি হয়েছেন, কিন্তু পাঠদশায় গানবাজনার শখ জ'মে উঠলে পাছে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, বোধ করি সেই কথা ভেবেই উৎসাহ কোনো রকম দিলেন না, নিষেধ-নিবারণও অবশ্য করলেন না। আমি কিন্তু নিষেধ না করাকেই উৎসাহ দানের সমার্থবাচক বিবেচনা ক'রে উৎসাহেরই সহিত হারমোনিয়ম সাধনায় প্রবৃত্ত হলাম। সুযোগও উপস্থিত হ'ল। সম্মুখে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের অবকাশ। পূর্ণিয়া শহরের নাতি-উত্তপ্ত মনোরম মধ্যাহ্নগুলিকে নিযুক্ত করলাম হারমোনিয়ম শিক্ষার কাজে। আমার সহপাঠীগণ যখন ছুটির দিনের গৃহপাঠের গণিতশাস্ত্র নিয়ে ঘর্মাক্ত হ'ত, আমি তখনকার সুখদ মধ্যাহ্ন-প্রহরগুলি অতিবাহিত করতাম সঙ্গীতশাস্ত্রের নিরলস চর্চায়। ফলে, পুস্তকহস্তা দেবী সরস্বতী হয়তো আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি, কিন্তু দেবী বীণাপাণি কতকটা প্রসন্ন হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। হারমোনিয়ম বাজাবার খানিকটা দক্ষতা বাল্যকালের তরুণ বয়সেই আমার হস্তগত হয়েছিল।

বছর ছয়েক পরে এই বক্স-হারমোনিয়মটি যখন আমার একাধিপত্যে এসেছিল তখন আমি ভাগলপুর গভর্মেন্ট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান প্রসারের কারণে দাদা তখন এই বাদ্যযন্ত্রটি হ'তে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়েছেন। তখন তাঁর দক্ষিণ হস্ত হারমোনিয়মের সাদা কী-বোর্ডের (key-board) পরিবর্তে মামলা-মকদ্দমার সাদা কাগজের উপর চালিত হ'য়ে যে সুর সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে, তার ঝঙ্কার তখনকার দিনের খাঁটি রজতখণ্ডের ঝঙ্কার।

হারমোনিয়মটিরও তখন অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা। এত অল্প সময়ের মধ্যে অতটা জরাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। বোধ হয় পূর্ণিয়ার স্যাঁৎসেঁতে সিক্ত আবহাওয়া ক্ষীণাঙ্গী প্যারিস নন্দিনীর ধাতে সয় নি। আঠা তরল

হওয়ার দরুন তার দেহের কতকগুলি জোড় শিথিল হ'য়ে পড়েছে, ফুসফুসের গাত্রে ছোট-বড় কয়েকটি ছিদ্র, তার অবকাশ দিয়ে যে পরিমাণ বায়ুর অপচয় ঘটে, তাতে স্বরনির্গমের জন্য শ্বাসপ্রণালীর প্রভূত বেগ পেতে হয়, দশনপাঁতি হ'তেও দু-চারটে দন্ত খ'সে গিয়েছে। থাকবার মধ্যে অবিকৃত আছে শুধু একটিমাত্র জিনিস—কষ্ট এবং কৌশলের ফলে তার জর্জর দেহ ভেদ ক'রে যেটুকু স্বর নির্গত হয়, তার মধ্যে পাওয়া যায় সেই প্রথম দিনের তরুণী-কণ্ঠের মাধুর্য। পূর্ণিয়ার আবহাওয়া প্যারিসের মূল্যবান ফ্রেঞ্চ রীডের উৎকর্ষের লাঘব করতে পারে নি।

সে হারমোনিয়মের বস্তু-সত্তা বহুদিন পূর্বে অদৃশ্যলোকে অন্তর্হিত হয়েছে; কিন্তু আমার সঙ্গীত-জীবনের সেই প্রথম অনুরাগের বন্ধু সহচরীর যে-সত্তা এখনো বিলুপ্ত হয় নি, তার অল্প একটু অংশ এই 'স্মৃতিকথা'য় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভবানীপুরে আসার কিছুকাল পরে আমাদের গৃহে টেবিল হারমোনিয়মের রেওয়াজ প্রবর্তিত হ'ল। একটি সুবৃহৎ মূল্যবান টেবিল হারমোনিয়মের উপর বাড়ির লোকের যত্ন এবং মনোযোগ লক্ষ্য ক'রেই বোধ হয় বিগতযৌবনা বক্স হারমোনিয়মটি অভিমান-ভরে অবহেলার কোনো নিভৃত কোণে গিয়ে আত্মগোপন করলে। এতদিন যে বাম হস্ত বায়ু সরবরাহের নিকৃষ্টতর কার্যে ব্যাপৃত হ'ত, তা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে এখন থেকে তা দক্ষিণ হস্তের সহকারীরূপে প্রধান স্বরকে স্ফীত ও অলঙ্কৃত করবার কার্যে নিযুক্ত হ'ল। বাম হস্তের বায়ু সরবরাহের কর্তব্য পদতলে অবতরণ ক'রলে।

কিছুদিনের অনুশীলনের দ্বারা দুই হাত এবং দুই পায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার পর আমার বাজনার উৎকর্ষ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ধিত হ'ল। বক্স-হারমোনিয়মের একহারা স্বরের মধ্যে মিষ্টত্ব নিশ্চয় ছিল

কিন্তু শক্তিশালী পাঁচ-অক্টেভ অর্গ্যানের গম্ভীরঘন স্বরের যে মহিমা, তার পরিচয় সেখানে পাওয়া যেত না। ভাগলপুরে অবস্থানকালে আদমপুর ক্লাবের অধিনায়ক কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে যে দু চারটি ইংরেজী গৎ আয়ত্ত করেছিলাম, অর্গ্যানের বৈচিত্র্য-পূর্ণ স্বরসম্পদের কল্যাণে সেগুলি ইংরেজীতর হ'য়ে উঠল। এতদিন একহারা কোট পরিধানের ফাঁকে যতটা দেশী ভাব আশ্রয় বেঁধে ছিল, কোটের উপর পাৎলুন চড়িয়ে দিয়ে টেবিল হারমোনিয়ম তা বেশ খানিকটা কমিয়ে নিয়ে এল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন চলেছে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'র যুগ। চটুল সুরের 'আলিবাবা'র গানগুলি সে সময়ে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে চলেছিল। রাজার প্রাসাদ থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত কোনো স্থানে তাদের অনুপস্থিতি দেখা যেত না। ব্যাণ্ড বাজাত, 'দেখ সাকি দেখ ভর পিয়ালা", ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান গাইত, 'ছি, ছি, এত্তা জঞ্জাল', বিড়িওয়ালা শিস দিত, 'বাঙ্কে কাজে মিনসেকে অব', আর, বাসরঘরে বাসর জাগানিয়ারা গান করত, 'চাঁদ চকোরে অধরে অধরে'

পাঁচ সিকে দিয়ে একখানা 'আলিবাবা'র গানের স্বরলিপির বই খরিদ ক'রে গানগুলি উদ্ধার করবার নিরলস তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলাম। কঠোর সাধনার ফলে ভাগ্যদেবতা যেন কিছু প্রসন্ন হ'লেন; গানগুলি আয়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, আমার অদৃষ্ট গগনে খ্যাতির শশাঙ্ক দেখা দিয়েছে। প্রথমে অবশ্য কিছুদিন সে খ্যাতি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ রইল, কিন্তু ছড়িয়ে পড়তেও খুব বেশি বিলম্ব হ'ল না। গৃহ থেকে গৃহান্তরে, এবং পল্লী থেকে ভিন্ন পল্লীতে বিস্তারলাভ করতে করতে অবশেষে একদিন প্রবেশলাভ করল ভবানীপুরে নীলকুঠির

জমিদার হরি ঘোষ মহাশয়ের কর্ণে। বন্ধুবর গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় একদিন তিনি আমাকে অতি আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে কিন্তু প্রমাদ গনলাম। বাজাতে হবে সেখানে হারমোনিয়ম নয়, হারমোনিয়মের পিতৃপুরুষ—পিয়ানো, যা এ পর্যন্ত কোনো দিনই বাজাই নি। সেদিন হরিবাবুর বাড়িতে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। কিন্তু সে তো ঘণ্টা দুই আড়াই পরের কথা। তার পূর্বে সে নৈশ ভোজনের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য যে-অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে, তার উপায় কি করা যায়!

তবে একটা ভরসার কথা আছে। পিয়ানোর কী-বোর্ড যখন হারমোনিয়মের কী-বোর্ডের অবিকল অনুরূপ, তখন হারমোনিয়ম বাজাবার যে সামান্য কৌশল অর্জন করেছি, নিঃশেষে তা পিয়ানোর কী-বোর্ডের উপর বর্ষণ করতে পারলে কতকটা কিনারা হয়তো হ'তে পারবে।

ক্ষণকাল আলাপ আলোচনার পর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হ'ল। বিনয়সহকারে হরিবাবু বললেন, "উপেনবাবু, এবার তা হ'লে একটু হোক।"

নিঃশব্দে অল্প হেসে মিউজিক স্টুলের উপর গিয়ে বসলাম। অর্গ্যানের যে স্থানে দুটি পা-দান (pedal) থাকে, সুরের মধ্যে ঝঙ্কার তোলার জন্য পিয়ানোরও ঠিক সেই স্থানে দুটি ছোট ছোট পা-দানের ব্যবস্থা আছে। পিয়ানো বাজাতে বাজাতে অভ্যাসবশত হারমোনিয়ম-ভ্রমে পাছে সেই দুটি পা-দান দুই পায়ে পর্যায়ক্রমে চালিত করতে আরম্ভ করি, সেই দুশ্চিন্তায় মনটা একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে রইল।

ডালা খুলতেই দৃষ্টিগোচর হ'ল সাত অক্টেভের শুভ্র সুদীর্ঘ সুশ্রী কী বোর্ড। আমার বাজাবার স্কেলের প্রধান সুর লক্ষ্য ক'রে তিনটে

আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ এক আঘাত করলাম। সজীব প্রাণীর মতো পিয়ানো একটা তীব্র আনন্দনাদ ক'রে উঠল,—সেই গভীর মধুর নিনাদের তাড়নায় সমস্ত ঘরটা যেন সুরের আবেশে জ'মে এল।

মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলাম। সুরের রেশ মিলিয়ে আসা মাত্র সহসা সকলকে (নিজেকেও) চকিত ক'রে দিয়ে ঘোর কী-বোর্ডের উপর ঝড় বওয়াতে লাগলাম 'দেও সাকি দেও ভর পিয়ালা' গানের সুরের। ছন চৌদুনের দ্বারা বার'বার পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে অবশেষে পা-দান চেপে ধ'রে ঝঙ্কারের কলরোল তুলে অকস্মাৎ একসময়ে যখন সমের মাথায় একেবারে নিঃশব্দ হলাম, তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ প্রশংসামুখর হ'য়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মৃদু স্বরে গোলোক বললে, "আমার মুখ রেখেছ উপেন।"

হর্ষগদ্গদকণ্ঠে হরিবাবু বললেন, "কোথায় শিখলেন উপেনবাবু এমন অদ্ভুত পিয়ানো বাজানো?"

অসুবিধাজনক প্রশ্ন। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, 'আপনার বাড়িতেই,—এই মাত্র!' তাতে হয়তো অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সে পরিচয়ের মধ্যে আসল মাল ডুবে মারা যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। যে বাজনা এতখানি প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হ'ল, তার পিছনে যদি একটা সাধনার ইতিহাস না থাকে, তা হ'লে সে প্রশংসাকে অবিবেচিত ভ্রান্ত প্রশংসা ব'লেই মনে করতে হয়। কপট বিনয়ের দ্বারা এই প্রশ্নের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করলাম; বললাম, "কিছুই এখনো শিখতে পারি নি। মাত্র ও চারটে শামুকের খোলা কুড়িয়েছি; রত্ন যা-কিছু, সাগরগর্ভেই আছে।"

আরও গোটা দুই 'আলিবাবা'র গান ও কুমার সাহেবের কাছে শেখা পোল্কা (Polka) নাচের একটা গৎ বাজিয়ে সেদিনের পালা শেষ

করলাম। বাড়ি ফেরবার জন্যে বিদায় নেবার সময়ে সদাসর্বদা ইচ্ছামতো এসে পিয়ানো বাজাবার জন্য হরিবাবু পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

পিয়ানোর বিষয়ে একটা দুর্মদ মোহ নিয়ে গৃহে উপস্থিত হলাম। টেবিল-হারমোনিয়মের উপর দৃষ্টি পড়তে কেমন যেন একটু করুণা বোধ হ'তে লাগল। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাবে সে তার খানিকটা মহিমা হারিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে হরিবাবুর বাড়ি গিয়ে পিয়ানো বাজাই। তাতে হাত পাকে, কিন্তু মন ভরে না। পরের ধনে পোদ্দারগিরি ক'রে রিক্ত পকেটেই গৃহে ফিরি, কিন্তু মন পূর্ণ ক'রে নিয়ে আসি লালসায়। দিন-মানে চিন্তা করি পিয়ানোর, রাত্রে দেখি তার স্বপ্ন। মনে হয়, যার পিয়ানো আছে, এ সংসারে একমাত্র সে-ই সুখী। যাদের নেই, তাদের কথা চিন্তা ক'রে মনে বেদনা জাগে; বেচারারা খেয়ে দেয়ে হেসে-খেলে মনে করে সুখে আছে; কিন্তু প্রকৃত সুখের উপায় যে বেভান কিংবা হ্যারল্ডের দোকানে না গেলে পাবার যো নেই, সে খবর তারা রাখে না। একটা পরিবর্তিত অবস্থার কল্পনায় মাঝে মাঝে মন আনন্দের রসে সিক্ত হ'তে থাকে,—আমাদের নিজেদের একটা পিয়ানো হয়েছে, কি ক'রে হয়েছে, সেই অতীব কঠিন প্রশ্নকে অবশ্য এড়িয়ে যাই, সে ক'রেই হোক হয়েছে; আমার ঘরেই তার স্থান, যখন খুশি বাজাই, রাত্রে কানাড়া রাগ বাজিয়ে শয্যা গ্রহণ করি, প্রত্যূষে ডালা খুলে রামকেলী বাজাই।

একটা সুতীব্র বাসনার দ্বারা পীড়িত মনের যখন এই রকম অস্থির-চঞ্চল অবস্থা, দাদা ও মেজদাদার সঙ্গে একদিন বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে জি. এ. পি. অ্যাল্সনের নিলামের দোকানে গেলাম। সেখানে সংসারের যাবতীয় পুরাতন জিনিসপত্র নিলামের দ্বারা বিক্রয় হয়। বড় বড় তিন-চারটে হল ঘরে জিনিসপত্র সাজানো; যেগুলি নিলামের জন্য প্রস্তুত, সেগুলিতে

লট্ নম্বরের টিকিট বাঁধা, ছাপানো ক্যাটালগের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই সেগুলির হদিস পাওয়া যায়।

কাঠ-কাঠরার আসবাবপত্রের নিলাম চলেছে, দাদারা প্রয়োজনমতো এক আধটা জিনিস কিনছেন, আমি ঘরে ঘরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো, আমার অন্তরের চরমতম সামগ্রী। তার একটা পায়ায় লট্ নম্বরের টিকিট ঝুলছে, সুতরাং সেই দিনই নিলামে চড়তে পারে। ডালা খুলে দু-চারটে পরদায় আঘাত করলাম। অবশ্য স্কেল ধ'রে টিউন বাঁধা নেই, কিন্তু যে পরদায় আঘাত করি, সেই পরদাই গভীর মিষ্ট আওয়াজ ছাড়ে। লালচে রঙের উৎকৃষ্ট মেহগিনি কাঠের কেসিং। আয়তন এত দীর্ঘ যে পরিণত বয়সের একটা মানুষ তার ডালার উপর শয্যা রচনা ক'রে পা ছড়িয়ে অনায়াসে শয়ন করতে পারে। দেখতে হবে, এই অপরূপ পদার্থটির গতি হয় কি ভাবে, কোন্ ভাগ্যবান এটিকে গৃহে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। সে সব দেখেও খানিকটা আনন্দ লাভ করা যাবে।

তখন নিলাম চলছিল একটা কাঠের আলমারির। নিলামদারের কাছ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু সুযোগ বুঝে মৃদু স্বরে বললাম, "মশায়, শুনছেন ?"

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ভদ্রলোক বললেন, "কি বলছেন ?"

"ও ঘরের লট্ নম্বর এত—গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটা নিলাম করবেন না ?"

"হ্যাঁ করব, একটু পরে।"

অপেক্ষা ক'রে রইলাম। 'একটু পরে' বোধ হয় বার পাঁচ-সাত শেষ হ'য়ে হ'য়ে 'অনেক পরে'র দাগে এসে পৌঁছেছে। ভদ্রলোক কাঠ-কাঠরার জিনিস নিলাম করতেই ব্যস্ত, বোধ করি তার খদ্দেরই বেশি।

ফাঁক পেয়ে মৃদু স্বরে আর একবার ডাক দিলাম, "মশায়, শুনছেন ?"

চশমার উপর দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নিলামদার বললেন, "কি বলছেন, পিয়ানোর কথা?"

কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, "আজ্ঞে হাঁ।।"

"এইবার করছি,—দেরি হবে না।"

আমার মতে কিন্তু দেরি হ'তে লাগল। বেশ খানিকটা অপেক্ষা ক'রে তৃতীয় বার তাগাদা দিলাম। ভদ্রলোকের বুঝতে বাকি রইল না, পিয়ানোর পালা শেষ না করা পর্যন্ত এই নাছোড়বন্দ লোকের হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। বললেন, "এই নিলামটা শেষ ক'রেই ও-ঘরে যাচ্ছি।"

আমি আগে-ভাগে গিয়ে পিয়ানোর পাশে মোতায়েন হলাম। বেশ ভাল ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে, মায় খরিদ্দারের চেহারা পর্যন্ত।

ও-ঘরের নিলাম শেষ ক'রেই নিলামদার পিয়ানোর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মৌচাকের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মৌমাছির ঝাঁক দল বেঁধে ছোটে, নিলামদারের পিছনে পিছনে তেমনি খরিদ্দার, দালাল ও ফড়ের দল হন্‌হন্‌ ক'রে এসে পিয়ানোর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়াল।

ডালাটা খুলে কী বোর্ডের উপর দু-চার বার আঘাতের দ্বারা শব্দ উত্থিত ক'রে নিলামদার নিলাম আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জনতাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে বললেন, "This is Doring's Piano—a famous make;—original price twelve hundred rupees. How much for this Grand Piano? Come on, come on!"

মনে ভাবলাম, প্রথম ডাক তো শ দেড়েক টাকা নিশ্চয়ই হবে, তারপর পাঁচ-সাত ডাকে একেবারে শ ছয়েক গিয়ে দাঁড়াবে। অকস্মাৎ মনের

মধ্যে অদ্ভুত একটা সাধ দেখা দিলে,—এই সুযোগে গোটা দুত্তিন ডাক দিয়ে নিলে মন্দ হয় না—অবশ্য নিম্ন দিকে নিরাপদ এলাকার মধ্যে; তিন শো টাকা ছাড়িয়ে ওঠা হবে না। এর দ্বারা এই কথা ভেবে ভবিষ্যতে বারংবার তৃপ্তি পাওয়া যাবে যে, একদিন পিয়ানোকে অন্ততঃ আহ্বান করবার পথেও দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু কেউ ডাক দেয় না যে। হ'ল কি এদের? তবে কি এরা সকলেই সেই গোত্রের প্রাণী, যারা মাত্র খেয়ে-দেয়ে হেসে-খেলে সুখী হ'তে জানে? নিলামদার আবার হাঁকলেন, "How much for this Grand Piano? Come on, come on!"

তারপর নিজেই ডাক দিলেন, "Ten rupees for this Grand Piano. Original price twelve hundred rupees. Come on!"

আমি তো আর আমাতে নেই! দশ টাকা এই গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর ডাক! তা হ'লে তো ডাক শেষ হ'তে হ'তে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে। খরিদ্দারের পক্ষ থেকে আমিই দিলাম প্রথম ডাক, বললাম, "Fifteen rupees."

বাঁ হাতের টিনের বাক্সে ঝমর-ঝমর শব্দ ক'রে নিলামদার হাঁকলেন, "Fifteen rupees for this Grand Piano. Doring's Piano. Original price twelve hundred rupees. Come on, come on!'

আমার বিপরীত দিক থেকে এক অ-বাঙালী হাঁকলে, "পচিশ রুপৈয়া।"

আমি হাঁকলাম, "Thirtyfive rupees."

আমার দক্ষিণ পাশ থেকে এক ব্যক্তি হাঁকলে, "Fortyfive rupees."

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে আমি হাঁক দিলাম, "Fifty rupees." রোক চেপে গেছে।

নিলামদার ঝমর ঝমর ক'রে বাক্স বাজিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, "Fifty rupees for this Doring's Piano—a famous make,—original price twelve hundred rupees. Come on, come on !"

বার দুই-তিন তিনি বাক্স বাজিয়ে বাজিয়ে এই সব প্ররোচক বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু আর যে কেউ সাড়া দেয় না! তবে কি,—তবে কি—। কিন্তু তাও কখনো সম্ভব।

নিলামদার পুনরায় চিৎকার ক'রে উঠলেন, "Fifty rupees for this Grand Piano. Fifty rupees one ......Fifty rupees two .....

সমূহ বিপদ বুঝে আমি তখন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলভাবে ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালিত করছি। কেউ ডাকলে বাঁচি। এমন সময়ে কানে প্রবেশ করল, "Fifty rupees three"—এবং সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর নিলামদারের দক্ষিণ হস্তের হাতুড়ির শব্দ হ'ল, ঠক্।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও ইঞ্চি তিনেক কোলা হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল, শুধু নিলামদারের হাতুড়িই নয়, তার সঙ্গে ঐ বিপর্যয় পিয়ানোখানা যেন আমার মাথার উপরেই ভেঙে পড়েছে। দাদার দিকে চেয়ে দেখতেই তিনি অপ্রসন্ন বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন, "ঐ দিগ্‌গজ ভাঙা পিয়ানোটা ডেকে কি করলে বলো দেখি!"

যা করলাম তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা মানুষ এ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে নি। উত্তর না দিয়ে চড়ুকে হাসি হেসে নিঃশব্দে দাদার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই চড়ুকে হাসি, যা কান্নার চেয়েও করুণ।

মৃদুস্বরে মেজদাদা দাদাকে কিছু বললেন। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দাদা বললেন, "যা হবার তা তো হয়েছে, এখন মণ্ডল মশায়কে ডেকে আনো। তিনি কি বলেন দেখি!"

মণ্ডল মশায় অর্থে কলিকাতার খ্যাতনামা বাদ্যযন্ত্রনির্মাতা মণ্ডল অ্যাণ্ড কোম্পানির মালিক। বউবাজার স্ট্রীট ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে তাঁর দোকান। পথে বেরিয়ে পূর্ব দিকের ফুটপাথ ধ'রে উত্তর দিকে চললাম। মনে মনে পিয়ানোকে সম্বোধন ক'রে বললাম, সেই যদি দয়া ক'রে এলে, এমন দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে না এলেই হ'ত! যাই হোক, এসেছ যখন সাদরে তোমাকে গ্রহণ করছি।

আমার মুখে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে বোধ করি মণ্ডল মশায়ের মনে করুণা উদ্দীপ্ত হ'ল। তরুণ যুবকের মুখ-চক্ষের ভাষা পাঠ ক'রে তার অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করতে বাকি রইল না। একটা ছোট হাতুড়ি ও একটা স্ক্রু ড্রাইভার পকেটে ফেলে বললেন, "চল, দেখি।"

নিলামের দোকানে এসে মণ্ডল মশায় পিয়ানোর নিকট উপস্থিত হ'য়ে ডালা খুলে দু-চারটে ডুং-ডাং শব্দ করলেন; তারপর হাতুড়ি দিয়ে পিয়ানোর দু-চার স্থানে বোধ হয় অকারণেই অল্প ঠোকাঠুকি ক'রে দাদার দিকে চেয়ে দেখে বললেন, "তা হ'লে কি ঠিক করছেন লালমোহনবাবু?"

দাদা বললেন, "কিসের ঠিক?"

"পিয়ানোটা রাখাই ঠিক করছেন তো?"

দাদা বললেন, "না রেখে উপায় কি?"

মণ্ডল মশায় বললেন, "উপায় আছে। মালটা খুবই সুবিধের দরে কেনা হয়েছে। মেহগিনি কাঠ এর মধ্যে যা আছে, তারই দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি। আপনি যদি না রাখেন, আমি এক শো টাকা দিয়ে নিতে

রাজী আছি। ডোরিং-এর পিয়ানো আজকাল সহজে মেলে না আমার খদ্দের জুটতে অসুবিধে হবে না।"

সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। মনের মধ্যে কে একজন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বলতে লাগল, Come on, come on। হাতে-হাতে পঞ্চাশ টাকা লাভ। বহন করবার জন্যে একটা কুলির প্রয়োজন হবে না, মনিব্যাগের মধ্যে নিয়ে গেলেই চলবে। ভার থেকে মুক্ত হ'য়ে 'দিগম্বরী' পাঁচখানা দশ টাকার নোটের কাগজে পরিণত হয়েছে।

ঝানু লোক মণ্ডল মশায়, খদ্দের চরিয়ে খেয়ে বছর ষাটেক বয়সে উপস্থিত হয়েছেন, দাদাকে কাবু করতে বিলম্ব হ'ল না। এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে দাদা বললেন, "না, যখন এসেছে, রাখাই ভাল। ভাল ক'রে সারিয়ে নিতে কত পড়বে?" দাদাও তো সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ, বোধ হয় যন্ত্রটার উপর একটু একটু মায়া পড়তে আরম্ভ করেছিল।

একদৃষ্টে পিয়ানোর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে মণ্ডল মশায় বললেন, "শ দেড়েক টাকা খরচ করলে জিনিসটা আট শো টাকার মালে উৎরোবে।"

দাদা বললেন, 'তা হ'লে সেই করাই ভাল, আপনি দোকানে নিয়ে গিয়ে সারাবার ব্যবস্থা করুন।

দাম চুকিয়ে দিয়ে রসিদটা দাদা মণ্ডল মশায়ের জিম্মা ক'রে দিলেন।

চোখের দৃষ্টি দিয়ে মণ্ডল মশায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। মুখের হাসি দিয়ে তিনি সে কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলেন। তা করুন, কিন্তু তাঁকে ডেকে আনা আমার পক্ষে সেরে খাল কেটে কুমীর আনার সমান হয়েছিল।

কি ক'রে এবার সেই কথা বলি।

৬

নিলামে সোফা এবং আলমারি কিনতে গিয়ে দৈবক্রমে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো কেনা হ'য়ে গেছে অবগত হ'য়ে বাড়ির মেয়েরা যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন।

বউদিদি বললেন, "বেশ করেছ উপীন, জিনিসের মতো একটা জিনিস হ'য়ে গেল। ঝোঁকের মাথায় এ-সব কাজ অমন ক'রে না করলে শলা-পরামর্শ ক'রে কখনো করা যায় না।" ঝোঁকটা যে আমার ক্ষেত্রে কতটা অস্বেচ্ছাপ্রসূত ছিল, সে কথা স্পষ্টরূপে ফাঁস ক'রে নিজের প্রতিপত্তির লাঘব করলাম না। উপরন্তু ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললাম, "হাতে হাতে পঞ্চাশ টাকার লাভটা ধরে তুলতে পারলেও মন্দ ছিল না বউদিদি।"

মাথা নেড়ে বউদিদি বললেন, "না না, তা করলে ঘরে লাভ তুলতে না, লোকসানই তুলতে।"

দাদাদের মন থেকে বিরক্তির মেঘ একরকম কেটেই গিয়েছিল, বউদিদিদের মুখে এখন এই সকল সানন্দ অনুমোদনসূচক মন্তব্য শুনে, যদিই বা কিছু তার অবশেষ ছিল, নিঃশেষে অপসৃত হ'য়ে উৎসাহ দেখা দিল। যেদিন পঞ্চাশ টাকার পিয়ানো আট শো টাকার মালে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের গৃহে প্রবেশ ক'রে ঝঙ্কার ছাড়তে আরম্ভ করবে, আমরা সমস্ত পরিবার যৌথ-আগ্রহে সেই শুভদিনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দাদা বললেন, "পিয়ানো যখন তোমার দ্বারাই কেনা হয়েছে, তোমার ঘরেই তা থাকবে।"

শুনে মনের আবেগ দমন করা কঠিন বোধ করলাম। সৌভাগ্য

যখন নিজের পথ নিজে ক'রে আসে, তখন এমনি ক'রেই আসে। দিন কুড়ি-পঁচিশের পূর্বে পিয়ানো সারিয়ে আসবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমার সবুর সইছিল না। পাঁচ সাত দিন পরেই আমার ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের জিনিসপত্র সরিয়ে-সারিয়ে 'দিগ্বিজয়ের' জন্যে জায়গা খালি ক'রে রাখলাম। নবপরিণীতা স্ত্রীর জন্যেও বোধ করি পুরুষমানুষ এত আগেভাগে তৎপর হয় না। বউদিদিরা নানাভাবে পরিহাস করতে আরম্ভ করলেন। এমন কি, অদূরভবিষ্যতে হয়তো আবার একদিন বাক্স-ট্রাঙ্ক-স্যুটকেসের নূতন আমদানির জায়গা করবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের ঐ স্থানটাই খালি করতে হবে, এমন ইঙ্গিত দিতেও ছাড়লেন না।

দীর্ঘ দুঃসহ অপেক্ষার কাল অবশেষে শেষ হ'ল। একদিন বৈকালে পথে লোকজনের ভনভনানি শুনে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, আট দশ জন কুলির মাথায় 'দিগ্বিজয়' হাজির হয়েছে। উপর থেকে দেখে মসৃণ মেহগিনি কাঠের উপর উজ্জ্বল পালিশ-করা তার কমনীয় শ্রী দেখে মন উল্লসিত হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম।

বহু কষ্টে ও কৌশলে এবং বহু বিলম্বে সেই সংবেদনশীল ভারী এবং বৃহৎ যন্ত্রটিকে দ্বিতলে তুলে আমার ঘরে স্থাপিত করা হ'ল। বাবা তখন হাইকোর্ট থেকে গৃহে ফিরেছেন। চালানে নিজ নামে ডেলিভারির সই নিয়ে কুলিরা প্রস্থান করার পর আমি পিয়ানোর ডালা খুলে বসলাম। সাত অক্টেভের বৃহৎ ঝক্‌ঝকে কী-বোর্ড প্রসন্ন হাস্যে অভিবাদন জ্ঞাপন করলে। নিঃশব্দ নীরব ভাষায় যেন আমাকে বললে, 'বন্ধু! তোমার দুর্বার আকর্ষণের অনতিবর্তনীয় পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি।' মনে মনে উত্তর দিলাম, 'আমার মন উজ্জ্বল ক'রে, আর গৃহ সুন্দর ক'রে বহাল তবিয়তে অবস্থান কর।'

দুই হাতে পিয়ানোর তিনটে সি সুরের উপর যুগপৎ তীক্ষ্ণ আঘাত করলাম। একটা গভীর গোল সুমিষ্ট সুরের আনন্দে সমস্ত বাড়িটা যেন কণ্টকিত হ'য়ে উঠল। হৃষ্ট কণ্ঠে দাদা বললেন, "বা চমৎকার আওয়াজ তো!"

তখন দ্রুত লয়ে বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি পোল্‌কা নাচের মনোরম গৎ—সাসা নিনি ধাধা পা মামা গাগা রেরে সানিধাপা। ততক্ষণে বাড়ির সকল স্ত্রী-পুরুষ এসে জমায়েৎ হয়েছেন পিয়ানোর পাশে। দু-তিন বার পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে থামা মাত্র বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের ভিতর হ'তে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হ'ল, 'বাঃ!' 'বাঃ!' 'চমৎকার!' 'সুন্দর!'

আরম্ভ ক'রে দিলাম 'আলিবাবা'র পালা। একেবারে শুরু থেকে ধরলাম, 'বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দোব না।' গোটা চার-পাঁচ গান বাজানোর পর মা বললেন, "এবার তোমরা চা-খাবার খেয়ে নাও, সন্ধ্যার পর আবার বাজিয়ো।" শুনলাম নীচে ঠাকুর বার তিনেক চায়ের জল গরম করেছে, আর নতুন বাজনা আরম্ভ হ'তেই কান দিয়েছে,—জলে পাতা ফেলবার সুযোগ পায়নি। আদালতের পোশাক-পরিচ্ছদ না খোলেনই দাদা। তখনো প্রায় দু'ঘণ্টা আমার পাশে ব'সে আছেন।

সন্ধ্যার পর পিয়ানো সংযোগে আমার ভাইঝি—সুশীলা নির্মলা সরলা ও ইন্দুবালার গান আরম্ভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র বহুবার-শোনা গান 'দে লো সখি, দে, পরাইয়ে গলে'- কিন্তু ঝঙ্কারময় নূতন সুরের সহযোগিতায় নূতন মাধুর্যের দ্বারা মণ্ডিত হ'য়ে এই পুরানো গানও অপূর্ব হ'য়ে উঠল। নূতন স্বর্ণাধারের মধ্যে আশ্রয়লাভ ক'রে পুরাতন মণি যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করলে। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গান-বাজনা চলল। যখনকার কথা বলছি, তখন বাঙালী-

পাড়ায় পিয়ানোর প্রচলন অল্পই ছিল। শুনলাম, গান-বাজনার সময়ে মাঝে মাঝে পথে ভিড় জ'মে যাচ্ছিল।

আহারাদির পরে ঘরে ঘরে যখন দোরে দোরে খিল প'ড়ে গেল, পিয়ানোর ডালা খুলে ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুগ্ধ চিত্তে কল্পনার চেয়েও যা চিন্তার অতীত সেই করতলগত বাস্তবকে ধারণায় আনতে লাগলাম। এও তা হ'লে হ'ল! এমনও তা হ'লে হয়! কিছুদিন থেকে মনে করতাম, সুখ বলতে যথার্থ যা বোঝায়, তার একমাত্র আশ্রয় পিয়ানো;—এ সংসারে কেবলমাত্র সেই সুখী যার একটা পিয়ানো আছে। সুখের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেকে সুখী ব'লে স্বীকার না করবার আর উপায় রইল না। মনে হ'তে লাগল, এখন যদি কিছুদিন পিয়ানো চোখে ক'রে রোগশয্যায় প'ড়ে থাকি, তাতেও দুঃখ নেই।

ধীরে ধীরে ক্ষণকাল শঙ্করা রাগে 'শুনলাম না-কি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছে সই' গানটি বাজিয়ে ডালা বন্ধ করলাম। যতই মৃদু স্বরে বাজাই না কেন, ঘরে ঘরে তা শোনা গেছে এবং সম্ভবত নিদ্রায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তথাপি কাউকে বিরক্ত করে নি, সে কথা বুঝতেও বাকি রইল না। বার কয়েক পিয়ানোর উপর স্নেহনিষিক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে পিয়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না মনে নেই, প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ল পিয়ানো। মনটা খুশিতে ভ'রে উঠল। ডালা খুলে আরম্ভ করলাম রামকেলী সুরের গান—'মিলো আঁখি চিড়িয়া মিঠি বোলে! মিলো আঁখি, মিলো আঁখি, মিলো আঁখি!' রামকেলী সুরের এই ঘুম-ভাঙানো গানের ফলে কেউ আঁখি মেলেছিল কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু অচিরে দরজায় করাঘাত পড়ল। দ্বার খুলে দিতেই হাসিমুখে কয়েকজন আগ্রহী শ্রোতা প্রবেশ করল।

তারপর ক্ষণকাল ধ'রে চলল গান-বাজনার অতি চিত্তাকর্ষক এক প্রভাতী আসর।

এইরূপে, এক পক্ষের উৎসাহে এবং অপর পক্ষের ঐকান্তিক অনুমোদনে আমাদের আনন্দময় দিনগুলি গানে ও বাজনায় আবর্তিত হ'তে লাগল ; এবং তারই অবসরে নিরলস যত্ন ও সাধনার ফলে পিয়ানোর উপর আমার দুই হাতের গতি ক্রমশ হ'য়ে চলল দ্রুত এবং অবাধ। মনে হ'ল, এই কঠিন যন্ত্রকে আয়ত্ত করবার উচ্চাঙ্গের শৈলী আমার হাতে ধরা দিতে আর অধিক বিলম্ব নেই।

যেদিন 'আলিবাবা'র পালা বাজাতে বসতাম, সেদিন ঘরে-বাইরে, পথে, সামনের বাড়ির দ্বিতলের গবাক্ষে—সর্বত্রই উৎকর্ণ শ্রোতার দল মুগ্ধ হ'য়ে বাজনা শুনত। অনেকে আমার বাজনার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, আমিও যে তাঁদের দৃষ্টির সঙ্গে কতকটা দৃষ্টি মেলাতে আরম্ভ করেছিলাম, সে কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

দাদাও বোধ হয় আমার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, "তুমি যখন নিজে নিজেই এতটা ভাল বাজাচ্ছ, এখন একটু ভাল ক'রেই শেখো। পিয়ানোর পক্ষে ইয়োরোপীয়ান মিউজিক বিশেষ উপযোগী। ইয়োরোপীয়ান মিউজিক শেখাতে পারে, এমন একজন শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা কর।"

প্রস্তাব শুনে তো মনে মনে লাফিয়ে উঠলাম, বললাম, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না-কি ?"

দাদা বললেন, "তার দরকার হবে না ; মণ্ডল মশায়ের কাছে একদিন যাও, তিনি হয়তো একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।"

পরদিনই মণ্ডল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হ'য়ে কথাটা পাড়লাম।

অল্প একটু চিন্তা ক'রে মণ্ডল মশায় বললেন, "আমার একটি ভাগ্নে আছে, জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিতে প্রেয়ারের সময়ে অর্গ্যান বাজায়। তাকেই ঠিক ক'রে দেবো।" মণ্ডল মশায়রা ক্রিশ্চানধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অর্গ্যান বাজান্ শুনে মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "পিয়ানো নিশ্চয়ই ভালরকম জানেন?"

সহাস্যমুখে মণ্ডল মশায় বললেন, 'না জানলে তোমাকে শেখাবে কেমন ক'রে? অর্গ্যান, পিয়ানো, বেহালা—সবই সে বাজাতে পারে।"

আমি তো চাই মাস্টার অব পিয়ানো,—জ্যাক অব অল ট্রেড্‌স্ না হ'লেই বাঁচি। বললাম, 'মণ্ডল মশায় কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

স্মিতমুখে মণ্ডল মহাশয় বললেন, "কি কথা?"

"সেদিন আপনি সত্যি সত্যি এক শো টাকা দিয়ে পিয়ানোটা কিনতেন?

আমার কথা শুনে মণ্ডল মশায় হাসতে লাগলেন; বললেন, "তোমরা যখন আমাকে সুযোগই দিলে না, তখন আর সে কথায় কাজ কি? কিন্তু তোমার কাজ আমি ক'রে দিয়েছিলাম।"

সকৃতজ্ঞকণ্ঠে বললাম, 'সম্পূর্ণভাবে। শুধু সেদিনই নয়, —পরেও

সকৌতূহলে মণ্ডল মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরেও মানে?'

মৃদু হেসে বললাম, 'মানে, পিয়ানোটা আপনি চমৎকার সারিয়ে দিয়েছেন। আপনি বলেছিলেন, সারানোর পর আড়াই শো টাকার মাল দাঁড়াবে, আমার কিন্তু মনে হয় হাজার টাকার মাল দাঁড়িয়েছে।"

মণ্ডল মহাশয় বললেন, "ভাল ক'রে না সারিয়ে দিলে তোমার কাজ করা হবে কেমন ক'রে? লালমোহনবাবুকে খুশি করা তো চাই। খুশি হয়েছেন তিনি?"

"যথেষ্ট। আর একটু কম হ'লেও ক্ষতি ছিল না।"

মণ্ডল মশায় হাসতে লাগলেন।

মণ্ডল মশায়কে দিয়ে তাঁর ভাগিনেয়ের পারিশ্রমিক প্রভৃতি একেবারে ঠিক ক'রে নিলাম। সপ্তাহে দু দিন ঘণ্টা দেড়েক ক'রে শেখাবেন সন্ধ্যার পর। মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা, তা ছাড়া যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া।

দিন পাঁচেক পরে অপরাহ্নকালে চাকর একটা চিঠি এনে দিলে মণ্ডল মশায় লোক পাঠিয়েছেন।

তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে চেহারা দেখে ভড়কে গেলাম। একেবারেই ভক্তি হ'ল না। বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা একটুখানি মানুষ; চোয়ালভাঙা কঠিনরেখার কৃষ্ণবর্ণ মুখ; আকৃতি দেখে বয়স নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। দেহ দেখলে মনে হয়, আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট, মুখ দেখলে মনে হয় পাঁচ-সাত বছরের বড়। অবয়বের কোন্‌খানটা যে সত্য কথা বলছে, তা সহজে বোঝবার উপায় নেই।

যাই হোক, নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "মণ্ডল মশায়ের কাছ থেকে এসেছেন?" বিমূঢ় অবস্থার অযৌক্তিক প্রশ্ন।

প্রতিনমস্কার ক'রে আগন্তুক বললেন, "আজ্ঞে, হাঁ।"

"মণ্ডল মশায় আপনার মামা?"

"হাঁ, মামা।"

"আপনিই শেখাবেন?"

এবার আগন্তুকের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল, বললেন, "এই রকমই তো আমাকে তিনি বলেছেন।"

এর ওপর অবশ্য আর কথা নেই। কিন্তু বড় হতাশ হলাম। এই ছোটখাটো মানুষটির মধ্যে কি এমন বিদ্যে থাকা সম্ভব, যাতে সে আমার

মতো উন্নতমানের ছাত্রকে শিক্ষাদানের অভিমান নিয়ে আসতে পারে। স্বগুপ্ত মশায় আমাকে যে একেবারে জানেন না, তা তো নয়। আমি যে কতকটা দক্ষতার সঙ্গে হারমোনিয়ম এবং টেবিল-হারমোনিয়ম বাজাতে পারি, তার পরিচয় তো তিনি নিজের দোকানে ব'সেই একাধিকবার পেয়েছেন। তবে তিনি কি কারণে মনে করলেন যে, যে-কোনো ডোবায় ডুব দেবার মতো আমি খাটো?

যাই হোক, যখন আমাদেরই অনুরোধক্রমে তিনি পাঠিয়েছেন, তখন অমনি-অমনি তো বিদায় দেওয়া চলে না, বললাম, "চলুন, ওপরে যাই।"

ওপরে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রে ভদ্রলোক পিয়ানোর ডালা খুলে দেখে টং ক'রে একটা শব্দ করলেন, তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কে শিখবেন? আপনি?"

বললাম, "হ্যাঁ, আমিই।"

"বাজানোর কিছু অভ্যাস আছে আপনার?"

মনে মনে বললাম, 'কিছু' নয়, যথেষ্টই আছে। যখন পিয়ানোর চাবির ওপর সুরের ঝড় বওয়াতে থাকব, তখন তার মধ্যে আপনার দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে। হয়তো, মানে মানে স'রে পড়বার পথ খুঁজতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়বেন। কিন্তু বিনয় প্রকাশ করবার যখন একটা লৌকিক প্রথা আছে, তখন একটু না হয় প্রকাশ করাই যাক। মৃদু হেসে বললাম, "তেমন কিছু নয়, যৎসামান্য আছে।" মনে ভাবলাম, বাজানোর পর এই বিনয়টুকু বিদ্যার সহিত যুক্ত হ'য়ে কমনীয় হ'য়ে প্রকাশ পাবে।

ভদ্রলোক বললেন, "একটু বাজান তো দেখি।"

স্মিতমুখে বাজাবার টুলে গিয়ে বসলাম। কি বাজানো যায়?

পোল্‌কা ভাঙ্গটা? নাঃ, ভদ্রলোক যখন ইউরোপীয় সঙ্গীত শেখাতে এসেছে, তখন বিলিতি গৎ-টৎ নিশ্চয় কিছু জানা আছে; সুতরাং পোল্কা-ভাঙ্গে হয়তো তেমন সুবিধা করা যাবে না। তার চেয়ে দিশির ওপর দিয়েই যাওয়া যাক। প্রতিপক্ষ যখন বক্সিং-এ পটু হয়, তখন তাকে পাড়্‌ করতে হয় কুস্তির প্যাচে। সুতরাং 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা'ই ঠিক। তা ছাড়া 'আলিবাবা'র সমস্ত গানের মধ্যে ঐ গানের সুরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, আর আমিও গানটা পিয়ানোর কর্ড দিয়ে ভাল ক'রেই বাজাতে পারি।

আরম্ভ ক'রে দিলাম 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা'। প্রায় মিনিট দশেক ধ'রে নানা কায়দা-করণের মধ্য দিয়ে গানটা বাজালাম। কখনো জোরে, কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো সোজা, কখনো আড়ে। দু হাতের আঙুলগুলো কী-বোর্ডের উপর এমন দৌড়াদৌড়ি ক'রে বেড়াতে লাগল যে, দেখে আমারই তাক লেগে যায়! অবশেষে অতি দ্রুত লয়ে মিনিট দুই প্রবলভাবে বাজিয়ে হঠাৎ সমের মাথায় একেবারে যাকে বলে 'চরম ক্ষান্তি' (dead stop) তাই ক'রে দিয়ে দু কান পাতলাম প্রশংসার বাণী শোনবার জন্যে। 'অদ্ভুত বাজান আপনি! আপনাকে আমি আর কি শেখাব? বরং আপনিই আমাকে—' ইত্যাদি ধরনের কথা ভদ্রলোককে বলতে হবেই। না ব'লে উপায় নেই। কান পেতে প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষণকাল বোধ হয় বিস্ময়াহত হ'য়েই নির্বাক হ'য়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আপনাকে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে দেখছি।"

মনে মনে বললাম, "বিপদে পড়তে হবে, তা আমি আগে থাকতেই জানি। ওস্তাদে-সাকরেদে সময়ে সময়ে যখন পাল্লা চলবে, তখন কে

ওস্তাদ আর কে সাকরেদ সব সময়ে তাও ঠাহর হবে না। তবু কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে বললাম, "কি বিপদে পড়তে হবে বলুন দেখি?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনার আঙুলগুলো এমন উল্টোভাবে পেকে গেছে যে, আপনাকে শেখাতে খুব বেগ পেতে হবে। আপনি যদি কিছুই না জানতেন, তা হ'লে আপনাকে শেখানো মোটের উপর অনেক সহজ হ'ত। দেখুন, মিস্টার গাঙুলি, teach করার চেয়ে unteach করা অনেক শক্ত। আপনাকে unteach করতে হবে অনেক-কিছু। যা এতদিন শিখেছেন তা একেবারেই ভুলতে হবে।"

সর্বনাশ। লোকটা বলে কি। এ যে আমার বাজনাকে এক কানাকড়ি মূল্যও দিতে চায় না। মনে হ'ল, এ আর অন্য কিছুই নয়, স্রেফ হিংসের কথা। দেখা যাক, ও-পক্ষেরই বা কতখানি মুরদ। টুল থেকে উঠে এসে বললাম, 'আপনি একটু বাজান তো, শুনি।"

বলা মাত্র ভদ্রলোক টুপ ক'রে, কতকটা যেন লাফ মেরেই, টুলের উপর উঠে বসলেন. তারপর, খাদের দিক থেকে আরম্ভ ক'রে চড়ার দিক পর্যন্ত দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডের উপর দু হাত চালিয়ে ঝরঝর ক'রে কটা শব্দ বার ক'রে গৎ বাজাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, স্থান উৎপাটিত হ'য়ে একেবারে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে নীত হয়েছি, আর সেখানে অপরূপ ব্যাণ্ড বাজছে সুবিখ্যাত ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেন্টের। মাত্র একটা পিয়ানো, কিন্তু বাজাবার কৌশলে বাজছে যেন আরো কত প্রকার যন্ত্র। পিয়ানো বাজানো বলতে যদি কিছু বোঝায়, তা হ'লে তা এই। তা নইলে, কতকগুলো ঝমর্ ঝমর্ ক'রে 'রেড গাকি, দেও ভয়

পিয়ালা'—ছি, ছি, ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। মনে হ'ল, মা ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও।

একটা তীব্র অভিমানে, রাগেও বলা যেতে পারে, মনটা বিরূপ হ'য়ে উঠল পিয়ানোর প্রতি। অকৃতজ্ঞ! আমার হাতে তুমি ব্যাঙ ডাকো,—আর, পাপিয়ার তান ছাড়তে আরম্ভ করেছ ঐ বেঁটেখাটো মানুষটির হাতে!

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হ'ল, পিয়ানো বেচারীর অপরাধ কোথায়? যা ঘটল, তা তো দর্পহারী মধুসূদনেরই কর্ম—বাজাতে ওস্তাদ ব'লে মনের মধ্যে অহেতুক দর্প হয়েছিল, আমারই পিয়ানোকে নোড়ারূপে ব্যবহার ক'রে আমার সেই দর্পের দাঁতের গোড়া ভেঙেছেন। মনে মনে বললাম, এ তুমি ভালই করলে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আর যেন কোনদিন নির্বংশ দর্পের কুলোপনা চক্র এমনভাবে উঁচু হ'য়ে উঠতে না পারে।

গৎ বাজানো শেষ হ'ল। বাজনা শুনতে শুনতে ভদ্রলোককে ওস্তাদ ব'লে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে মনে-মনে প্রণাম করেছিলাম। বললাম, "কি অদ্ভুত বাজান মাস্টার মশায় আপনি! যখন বাজান, মনে হয় আপনার আঙুলগুলো যেন আঙুলই নয়। যেন কোনো একটা যন্ত্রের অংশ যান্ত্রিক অবলীলার সঙ্গে চলছে।"

মাস্টার মশায় (এখন থেকে মাস্টার মশায় বলাই উচিত) বললেন, "সেই যান্ত্রিক অবলীলা লাভ করবার জন্যেই আপনাকে আপনার পূর্ব অভ্যাস ভুলতে হবে। হারমোনিয়ামের আঙুল চালানো আর পিয়ানোর আঙুল চালানো ঠিক এক জিনিস নয়।"

এক জিনিস যে নয়, তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া গেছে।

মহাদেবের ধুতুরা ফুল দিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করা চলে না—এ কথা বুঝতে আর বাকি ছিল না।

মাস্টার মশায় সঙ্গে একটি লম্বাচওড়া কিন্তু পাতলা ধরনের বিলাতি নোটেশনের বই এনেছিলেন। সেই বই থেকে আমার সাধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুশীলনী নির্বাচিত ক'রে দিলেন। তারপর পিয়ানো বাজানোর জন্য মৌখিক এবং লিখিত কয়েকটি উপদেশ দিয়ে, যাবার সময়ে শেষ উপদেশ দিলেন, "যতদিন আমি পরামর্শ না দিই, পিয়ানোতে কোনো গৎ বা গান বাজাবেন না। হারমোনিয়ামেও নয়।"

বুঝলাম, আমার কুশিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল।

৭

লেখাপড়ার চর্যা অতিক্রম ক'রে যখন আমরা জীবন-সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নি, সেই তরুণ বয়সে একটু নষ্টামি করা আমরা একটা বিলাসের মধ্যে পরিগণিত করতাম। নষ্টামি আমরা করতাম স্রেফ্‌ নষ্টামিরই জন্য। আমরা অর্থে সুরেনদাদা, গিরীন এবং আমি। ক্ষণকালীন একটা হাল্কা আনন্দ উপভোগ করার অতিরিক্ত আমাদের নষ্টামির অপর কোনও সুদূর উদ্দেশ্য থাকত না।

সুতরাং আমাদের নষ্টামিকে 'অনিষ্টামি' (অনিষ্ট + আমি) বলা চলত না; এমন কি, দুষ্টামিও নয়। আমাদের নষ্টামি ছিল কৌতুক-পরায়ণতার কতকটা সগোত্র আত্মীয়। তার দ্বারা মধ্যম পক্ষকে যে-পরিমাণ বেকুফ বানানো সম্ভব হ'ত, তার অনেক গুণ কৌতুকান্বিত করা চলত উত্তম পক্ষকে। এক পক্ষ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত বটে, কিন্তু অপর পক্ষ লাভবান হ'ত অনেক বেশি। লাভ লোকসানের সাধারণ নিয়মই এই। একেবারে 'নঞ্‌' (nothing) থেকে বস্তু উৎপন্ন করা যায় না। কক্ষকে আলোকিত করতে হ'লে কোথাও একটা দহন অথবা ঘর্ষণের কার্য চালাতেই হয়। তেল না পোড়ালে আলোক পাওয়া যায় না; ঘর্ষণের দ্বারা তন্তুকে (filament) ক্রুদ্ধ ক'রে তুললে তবে সে তপ্ত কিরণ বিকিরণ করে। সুতরাং নষ্টামির দ্বারা মধ্যম পক্ষকে বেকুব বানাতে না পারলে উত্তম পক্ষকে আনন্দে উদ্ভাসিত করাই বা যায় কেমন ক'রে?

গিরীন ছিল আমাদের মধ্যে ভালমানুষ; তাই তার মস্তিষ্কে নষ্টামির উদ্ভাবনা-শক্তির কিছু অসদ্ভাব ছিল। আমরা কাটতাম সিঁধ,

গিরীন বইত মাল। অর্থাৎ, আমরা ছিলাম এঞ্জিনীয়ার, সে ছিল বড়জোর আমাদের সাহায্যকারী ওভারসীয়ার। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ছিলেন কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে দাদার এক ভায়রা-ভাই। তিনি আমাদের বিরুদ্ধেও নষ্টামি করতে ছাড়তেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিভা ছিল উচ্চ মানের। এমন পরিচ্ছন্ন নিপুণতার সহিত তিনি তাঁর কার্য সমাধা করতেন যে, উৎপীড়িত ব্যক্তির চিত্ত লাল হ'য়ে উঠত এক দিক ক্রোধে, আর এক দিক খুশিতে। একটা উদাহরণ দিই।

আমরা তখন ভবানীপুরে কাঁসারীপাড়া রোডে বাস করি। সকালেই কামিনীবাবু আমাদের গৃহে এসেছেন। সারাদিন আমাদের সঙ্গে অতিবাহিত ক'রে অপরাহ্নকালে ফিরে চলেছেন। কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে আমার প্রয়োজন ছিল, আমিও তাঁর সঙ্গে চলেছি।

ট্রামে উঠে কামিনীবাবু জানলার ধারে একটা সীটে উপবেশন করলেন, আমি বসলাম তাঁর পাশে। লোয়ার সারকুলার রোডের মোড় ছাড়াবার পর টিকিটের জন্যে কণ্ডাক্টার আমাদের নিকটে উপস্থিত হ'ল। টিকিটের ঠিক মূল্যটি দিয়ে কামিনীবাবু তাঁর নিজের টিকিট কিনলেন। মনিব্যাগ থেকে আমি একটা ঝকঝকে করকরে নূতন টাকা বার ক'রে কণ্ডাক্টারের হাতে দিয়ে বললাম, "শ্যামবাজারের টিকিট দাও।" সে সময়ে ট্রামে ট্রান্সফার টিকিট পাওয়া যেত।

টাকার মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে পাঞ্চিং যন্ত্রের উপর না বাজিয়ে শুধু এ-পিঠ ও-পিঠ দুদিক একটু দেখে নিয়ে কণ্ডাক্টার ব্যাগের মধ্যে টাকাটা ফেললে; তারপর ব্যাগটা একটু কাত ক'রে ধ'রে সামনের দিকে এক রাশ রেজকি টেনে এনে চেঞ্জ গুনতে প্রবৃত্ত হ'ল।

ঠিক এই গুরুতর মুহূর্তে মাত্র দুটি কথার সাহায্যে যৎপরোনাস্তি নিপুণতার সহিত কামিনীবাবু অপকর্মটি সম্পন্ন করলেন। আমার প্রতি

একবার নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে কপট চাপা গলায়, অথচ কণ্ডাক্টরের শ্রুতিপথে তাঁর কথা পৌঁছতে যাতে অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হ'য়ে বললেন, "টাকাটা চালালেন ?"

বাস্, আর যায় কোথায়! নিমেষের মধ্যে ব্যাগ সোজা ক'রে রেজকিগুলো ব্যাগের তলায় ফিরিয়ে পাঠিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "ছি, ছি! দেখুন দেখি, কি অন্যায় কথা ? আমি গরিব মানুষ, এক টাকা যদি দণ্ড দিতে হয়, তা হ'লে কি ক'রে চলে বলুন তো ?" তারপর ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঝনোর-ঝনোর ক'রে টাকা-পয়সাগুলো নাড়তে নাড়তে এক-একটা টাকা বার ক'রে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমি বললাম, "শোন কণ্ডাক্টার, যে টাকা তোমাকে আমি দিয়েছি, তার চেয়ে ভাল টাকা গভর্মেণ্টের টাকশালে তৈরি হয় না। এই ফ্যাসাদে বাবু তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে ফ্যাসাদে ফেলেছেন।"

ফ্যাসাদে বাবু তখন ভিজে বেড়ালটির মতো নিঃশব্দ নির্বাক হ'য়ে চৌরঙ্গি রোডের গাড়ি-ঘোড়া-লোকচলাচলের মধ্যে আত্মনিবিষ্ট হয়েছেন। একটা যে বিশ্রী রকমের গোলমালের সূত্রপাত করেছেন, সে বিষয়ে যেন একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। সম্পূর্ণ নির্বিকার! এ দিকে কণ্ডাক্টার সামনে ব্যাগ থেকে টাকা তুলে তুলে পাঞ্চিং মেশিনের উপর বাজিয়ে বাজিয়ে পরীক্ষা ক'রে চলেছে।

ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে বললাম, "যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি টাকা বাজিয়ো, আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আমার টিকিট আর চেঞ্জ দাও।"

"দাঁড়ান মশাই! টিকিট আর চেঞ্জ!" ব'লে কণ্ডাক্টার আমার পাশ থেকে কামরার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করতে

লাগলাম, এক-এক জনকে সে টিকিট দিচ্ছে আর ব্যাগের মধ্যে হাত পুরে ঝনোর-ঝনোর শব্দ ক'রে মেকি টাকা খুঁজছে।

ডান কনুই দিয়ে কামিনীবাবুকে একটু ঠেলা মেরে অপ্রসন্ন স্বরে বললাম, "কি মানুষ বলুন তো আপনি! হঠাৎ অকারণ একটা কথা ব'লে এমন গোল বাধিয়ে দিয়েছেন যে, আমার অমন চকচকে নতুন টাকাটা বিশ হাত জলের তলায় গিয়ে পড়েছে!"

ভালোমানুষের মতো নিরীহভাবে কামিনীবাবু বললেন, "পার্ক স্ট্রীট তো ছাড়িয়ে এসেছি, লিণ্ডসে স্ট্রীটের মধ্যে ইন্স্পেক্টার যদি না ওঠে, তা হ'লে দুর্গা দুর্গা ব'লে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে নেবে প'ড়ে এস্প্ল্যানেড পর্যন্ত বাকি পথটুকু হেঁটে মেরে দিলেই হবে। তবু গোটা-কয়েক পয়সা বাঁচবে তো।"

শুনে পিত্ত জ্ব'লে উঠল। তিক্ত কণ্ঠে বললাম, "চালাকি না কি? কি এমন অপরাধ করেছি শুনি যে, অমন খাঁটি টাকাটা ছেড়ে দিয়ে দুর্গা দুর্গা ব'লে ট্রাম থেকে নেমে পড়তে হবে? রাত দশটা পর্যন্ত ট্রামে ব'সে থাকব, কেমন না দেয় দেখি।"

ক্ষণকাল পরে আমাকে পাশ কাটিয়ে কণ্ডাক্টার পিছন দিকে যাচ্ছিল, রূঢ়কণ্ঠে বললাম, "কণ্ডাক্টার, আমার টাকাটা ফিরিয়ে দাও, আমি তোমাকে অন্য টাকা দিচ্ছি।"

কণ্ডাক্টার বললে, "আপনার টাকা খুঁজে বার করতে পারলে ফিরিয়েই তো দিতাম।"

"তবে আমাকে টিকিট আর পয়সা দাও।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "কি আশ্চর্য! ধর্মতলা পর্যন্ত আপনি তো যাচ্ছেনই, একটু সবুর করুন না, আর একটু খুঁজে দেখি।"

বললাম, "না, আর তোমার খুঁজতে হবে না। এখন খুঁজে পেলেও সে টাকা আমি নেব না।"

সবিস্ময়ে কণ্ডাক্টার বললে, "কেন ?"

"সে টাকা তুমি যে আর কারো কাছে পাও নি, সে টাকা যে আমার দেওয়াই টাকা, তার প্রমাণ কি দেবে তুমি ?"

ঈষৎ উষ্মার সহিত কণ্ডাক্টার বললে, "এ কথার মানে কি হ'ল মশাই ?"

পিছনের সীটে ব'সে দুটি ভদ্রলোক বোধ হয় আগা-গোড়া সব কথা শুনেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন গর্জন ক'রে উঠলেন, "মানে ঠিকই হ'ল। ও টাকা তোমার ব্যাগের মধ্যে মিশিয়ে ফেলার পর আর কোনো টাকাই তুমি ফেরত দিতে পার না।"

উক্ত ভদ্রলোকের প্রতি একবার তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে আর কোনো কথা না ব'লে আমাকে টিকিট ও বাকি পয়সা দিয়ে কণ্ডাক্টার প্রস্থান করলে।

এস্প্ল্যানেডে নামবার সময়ে দেখি, ঘণ্টার দড়ি হাতে ধ'রে আমার দিকে তীক্ষ্ণনেত্রে চেয়ে কণ্ডাক্টার দাঁড়িয়ে আছে। দেখে কেমন মায়া হ'ল, বললাম, "ফ্যাসাদে বাবুকে চিনে রেখো কণ্ডাক্টার। আবার যেন কোনো দিন ওঁর ফ্যাসাদে না পড়।"

গম্ভীর মুখে কামিনীবাবু বললেন, "এ বাবুটিকেও ভাল ক'রে চিনে রেখে ভুলো না। যে টাকা ইনি তোমাকে দিয়েছেন, অন্তত আরও গোটা পাঁচেক সেই রকম টাকা এঁর মনিব্যাগে আছে।"

কামিনীবাবুর কথা শুনে নিমেষের মধ্যে কণ্ডাক্টারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। বিদ্রূপবিরূপ কণ্ঠে সে বললে, "দেখুন দেখি কি অন্যায় আপনার! তা হ'লে সত্যি সত্যিই একটা টাকা আমার জলে গেল।"

হেসে উঠে বললাম, "আবার তুমি এরই মধ্যে ফ্যাসাদে-বাবুর ফ্যাসাদে পড়েছ কণ্ডাক্টার। ফ্যাসাদে-বাবু থেকে তোমার নিস্তার নেই দেখছি।"

ফুটবোর্ড থেকে মাটিতে নেমে পড়লাম।

সজোরে দুবার ঘন্টি মেরে তীক্ষ্ণ নেত্রে আমার প্রতি অগ্নিবর্ষণ ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "ফ্যাসাদে-বাবু উনি নন, আপনি।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললাম, "শুনছেন কামিনীবাবু?

তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ
আমি আজ চোর বটে!"

শ্যামবাজারের গাড়ি ছাড়বার উপক্রম করছিল। দুজনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে পড়লাম।

এবার সুরেনদার দ্বারা উদ্ভাবিত ও পরিচালিত একটা কাহিনীর কথা বলি। এই কাহিনীতে যে নষ্টামিটুকু করা হয়েছিল তাকে ষোল আনা নির্দোষ বলা যেতে পারে। আঠার আনা বললেও বোধ করি অন্যায় হয় না, কারণ উক্ত নষ্টামির দ্বারা সুরেনদাদা উত্তম পক্ষকে যত না খুশি করেছিলেন, তার চতুর্গুণ সুখী করেছিলেন মধ্যম পক্ষকে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি ভবানীপুরে কাঁসারীপাড়া রোডে বাস করি। সুরেনদাদা ও গিরীন থাকতেন ভিক্টোরিয়া হোটেল নামক শিয়ালদহ অঞ্চলের এক মেসে। প্রতি সপ্তাহে শনিবারে শনিবারে তাঁরা আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে আসতেন; ফিরে যেতেন রবিবার বৈকালে অথবা সোমবার সকালে। সোমবারে ফিরলে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে ট্রাম লাইন পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে আসতাম, রবিবারে কিন্তু এগিয়ে দেবার বহরটা একটু দীর্ঘ হ'ত। সাধারণত পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত তো হ'তই; উৎসাহিত বোধ করলে, অথবা আলোচনাধীন

কোনো চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তির বিলম্ব থাকলে, এস্‌প্ল্যানেডের মোড় পর্যন্ত দৌড় মারতেও ছাড়তাম না। সেখান থেকে সুরেনদাদা ও গিরীন অগ্রসর হতেন ভিক্টোরিয়া হোস্টেলের অভিমুখে, আমি ফিরতাম কাঁসারীপাড়া রোডে।

একটা রবিবারের পালা চলেছে। চৌরঙ্গির ফুটপাথ ধ'রে আমরা উত্তর মুখে চলেছি। প্রসঙ্গটা সেদিন আমাদের মধ্যে যা চলছিল তা শোনবার পক্ষে উৎকৃষ্ট, কিন্তু শোনাবার পক্ষে কিছু কুণ্ঠাসঙ্কোচসাপেক্ষ। সুতরাং সেদিনকার দৌড় পার্ক স্ট্রীটে শেষ হবার মতো ছিল না, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের বারান্দার তলা দিয়ে আমরা তিনজনে গুটি গুটি চলেছি, এমন সময়ে অদূরে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'ল গ্র্যাণ্ড হোটেলের এক প্রৌঢ় মুসলমান খানসামা, সজ্জাসম্ভার দেখে মনে হয় একজন স্টিউয়ার্ড (steward) হওয়াও অসম্ভব নয়। খর্ব স্থূল নধর দেহ, মুখ-জোড়া ঘননিবদ্ধ কাঁচাপাকা শ্মশ্রু, শিরস্ত্রাণে রক্তাক্ষরে খচিত GRAND, কটিবন্ধে উজ্জ্বল পালিশ করা তকমার মধ্যে G. H.; মুখমণ্ডলে দুরপনেয় গাম্ভীর্যের নিশ্ছিদ্র ছায়া।

খানসামার বিষয়ে গিরীন ও আমি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলাম। আমাদের মনে তার সম্বন্ধে কোনো প্রকার ফিকির-ফন্দির উদয় হয় নি, কিন্তু সুরেনদাদার মস্তিষ্কে নষ্টামির তড়িৎশিখা অকস্মাৎ চমকিত হয়েছে। সময়ের অল্পতাবশত তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় পান নি।

আমরা চলেছিলাম উত্তর দিকে, খানসামা আসছিল দক্ষিণ মুখে; সুতরাং ক্রমশই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হচ্ছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম, খানসামার দৃষ্টি সুরেনদাদার উপর নিবদ্ধ,

সুরেনদাদাও নিবদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে খানসামার দিকে চেয়ে আছেন। কাছাকাছি হ'তে সুরেনদাদা দুই-এক পা এগিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্য খানসামার সামনাসামনি হ'য়ে দাঁড়ালেন, তারপর অকস্মাৎ বেশ খানিকটা নত হ'য়ে দীর্ঘ একটা সেলাম ঠুকলেন। আমাদের বুঝতে বাকি ছিল না, অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গেছে; খানসামার কিন্তু বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। তাড়াতাড়ি নত হ'য়ে প্রত্যভিবাদন ক'রে ক্ষণকাল সে নিষ্পলক নেত্রে সুরেনদাদার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর স্খলিত বিমূঢ় কণ্ঠে বললে, "কেঁও বাবুজী, কেঁও"—(কেন বাবুজী, কেন—)

সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিয়া কেঁও?" (কি কেন?)

"আপ কিয়া হম্‌কো পহচানতে হেঁ?" (আপনি কি আমাকে চেনেন?)

সুরেনদাদা বললেন, "জী নহি, হরগিজ নহি।" (আজ্ঞে না, একেবারেই না।)

"তব্ কাহে, তব্ কাহে—" (তা হ'লে কেন, তা হ'লে কেন—)

একজন দস্তুরমতো বাবুলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাকে সেলাম বাজিয়েছে। কেন বাজিয়েছে, তা জানবার জন্যে মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহল, অথচ একজন বাবুলোকের সম্পর্কে সেলাম কথাটা মুখ দিয়ে বার করতেও কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে।

সুরেনদাদা বললেন, "তব্ কাহে কিয়া কহিয়ে?" (তা হ'লে কেন কি, তা বলুন?)

তখন বলতেই হ'ল, "তব্ কাহে আপ হামকো সেলাম কিয়া?" (তা হ'লে কেন আপনি আমাকে সেলাম করলেন?)

সুরেনদাদা বললেন, "আপকা সুরৎমে অ্যায়সা খানদানি পহচান দেখা যো মজবুরন্ হমকো সেলাম করনা পড়া।" (আপনার আকৃতির মধ্যে

আভিজাত্যের এমন চিহ্ন দেখলাম যে, বাধ্য হ'য়ে আমাকে সেলাম করতে হ'ল।)

এ কথা শুনে ক্ষণকালের জন্য খানসামার বাঙ্‌নিঃসরণ হ'ল না, গভীর বিস্ময়ে এবং আনন্দে সে সুরেনদাদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর প্রগাঢ় কণ্ঠে বললে, "বাবুজী, হাম বহুৎ আদমি দেখা, লেকিন আপকা অ্যায়সা ভলা আদমি কভি নহি দেখা।" (বাবুজী, আমি অনেক মানুষ দেখেছি; কিন্তু আপনার মতো এমন ভাল লোক কখনো দেখি নি।)

অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্য দেখে একটা দুর্দমনীয় হাস্যে আমাদের পাঁজর বিদীর্ণ হবার মতো হয়েছিল। হেসে ফেলে পাছে রসভঙ্গ করি, সেই ভয়ে দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে আমরা হাস্যরোধ করতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক সুরেনদাদা ও খানসামার মধ্যে নিবিড়ভাবে আলাপ-আলোচনা চলল, তারপর আনত-দীর্ঘ সেলামের দ্বারা উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করলেন।

সেদিন আমাদের বেশ বড় রকম একটা সুযোগ নষ্ট হয়েছিল। একটু ইঙ্গিত সুরেনদাদা যদি দিতেন, তা হ'লে গ্র্যাণ্ড হোটেলের একটা কোনো ঘরের এক কোণে ব'সে তিন ভাই মিলে পরিতোষের সহিত একটা কাটলেট কাব সমাধা করতে পারা যেত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবার যে কাহিনী বলব, তার দ্বারা পাঠকেরা শুধু একটা কৌতুক-প্রসঙ্গই উপভোগ করবেন না, সাধারণ মানব-চরিত্রের একটা দিকের সন্ধান এবং পরিচয় লাভ ক'রে কিছু বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হবেন।

ছুটির দিন। সুরেনদাদা, গিরীন এবং আমি চলেছিলাম ছোড়দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ছোড়দিদি, অর্থাৎ আমার জেঠামহাশয় কেদারনাথের

কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষান্তমণি, শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মাসী। ছোড়দিদি থাকতেন ভবানীপুর চড়কডাঙায় কেদার বসু লেনে।

আমরা চলেছিলাম রসা রোড ধ'রে। তখন লোয়ার সারকুলার রোডের মোড় থেকে আরম্ভ ক'রে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত পথটার নাম ছিল রসা রোড অথবা রসা পগলা রোড। এখন চৌরঙ্গি প্রসারিত হ'য়ে এসেছে এলগিন রোডের মোড় পর্যন্ত; সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে হাজরা রোডের মোড় পর্যন্ত রসা রোডের অংশটুকুর নূতন নাম হয়েছে আশুতোষ মুখার্জি রোড। বাকি অংশটুকু রসা রোডই আছে।

পথও তখন ছিল অতি সঙ্কীর্ণ; প্রস্থে বর্তমান পথের এক-চতুর্থাংশও ছিল কি-না সন্দেহ। ট্রামের ডবল লাইনের স্থান ক'রে পথের দু দিকে ফুটপাথের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটু ফুটপাথ ছিল পথের পূর্ব ধারে।

জগুবাবুর বাজারের মোড় থেকে কয়েক গজ দক্ষিণে ফুটপাথের ধারে ঢিবির মতো একটা অতি ক্ষুদ্র কাঁচা মন্দির দেখা যেত। তার ভিতরে হয়তো শীতলা অথবা ঐরূপ কোনো দেবতার ক্ষুদ্র মূর্তি ছিল; বাইরে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত থাকত সিঁদুর-তেল মাখা কয়েকটি শিলাখণ্ড। দেবতা এবং মন্দিরের এই অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থার মধ্যেও নৈবেদ্যর চাল-কলার বোধ করি একেবারে অসদ্ভাব ছিল না; তারই প্রমাণস্বরূপ মন্দিরগাত্রে এবং আশপাশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গর্তগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ আমার 'চিত্তদুয়ার মুক্ত পেয়ে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা' হ'ল। মনের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠল, 'আজকে তোমায় বলতে হবে একটা রঙিন মিথ্যা কথা।'

সুরেনদাদা এবং গিরীনের সঙ্গে অবিলম্বে একটা পরামর্শ ক'রে নিয়ে

দু হাঁটুর উপর দু হাত স্থাপিত ক'রে নতমস্তকে সেই ঢিবির পাশের একটা গর্তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম। গিরীন এবং সুরেনদাদা ডিঙি মেরে আমার কাঁধের উপর দিয়ে সেই গর্তের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চেয়ে রইলেন।

একটি ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে মশায়? কি দেখছেন বলুন তো?"

হাতের ইশারায় কথা কইতে নিষেধ ক'রে চাপা গলায় বললাম, "চুপ।" পর-মুহূর্তেই কিন্তু ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলাম, "এবার ঘন নীল আলো ছাড়ছে।"

"কি হয়েছে মশাই?" "কি দেখছেন ওখানে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে কয়েকজন পথিক ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

হঠাৎ গিরীন ব'লে উঠল, "এবার কিন্তু লাল্‌চে আভা।"

সুরেনদাদা বললেন, "এবার কাল্‌চে।"

আমি বললাম, "এবার কমলানেবুর রঙ।"

ক্ষণকাল পরে গিরীন বললে, "এবার আস্‌মানি।"

ঔৎসুক্যপীড়িত পথিকদের ধৈর্য আর কিছুতেই বশ মানতে চাচ্ছিল না। খানিকটা এগিয়ে এসে ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে একজন বললে, "আরে, বলুন না মশাই, কি কমলানেবুর রঙ, কি আস্‌মানি!"

হাত তুলে চাপা গলায় বললাম, "আস্তে কথা কন্‌, বেশি গোল হ'লে আবার নেবে যাবে। একটু আগে নেবে গিয়েছিল, আবার উঠেছে।"

চাপা গলায় অধীরভাবে একজন বললে, "কি উঠেছে, সেই কথাটাই বলুন না!"

বললাম, "সাপ। গর্তর মধ্যে মস্ত বড় একটা সাপ রয়েছে, মাথায়

একটা মণি। সেই মণি আলো ছাড়ছে, কখনো আসমানি, কখনো কমলা-নেবুর রঙের।"

সুরেনদাদা বললেন, "এবার পান্নার মতো সবুজ রঙের আভা।"

"কই দেখি! কই দেখি!" ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে তিন-চারজন লোক ঠেলে এল।

আমাদের লক্ষ্য ক'রে একজন রূঢ় স্বরে বললে, "আপনারা তিন জন একবার স'রে আসুন না মশাই। আপনারা তো দেখছি ও-জায়গাটায় মৌকসী পাট্টা নিয়েছেন!"

"আস্তে। জোরে কথা কইবেন না।" ব'লে আমি ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনদাদা-গিরীনও আমাকে অনুসরণ করলেন। হাসতে হাসতে আমরা ছোড়দিদির বাড়ির অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

ছোড়দিদির বাড়িতে পৌঁছে বহুক্ষণ ধ'রে আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলাম; কথাবার্তা চালালাম। তারপর তিনি আমাদের তিন জনকে পাশাপাশি বসিয়ে পেট ভ'রে খাবার খাওয়ালেন। প্রায় এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা কাল ছোড়দিদির সহিত অতিবাহিত ক'রে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম।

চক্রবেড়িয়া রোডের মোড় ছাড়িয়ে এসে দেখি, অদূরে সমস্ত পথ জুড়ে বিরাট এক জনতা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। যান-বাহনের পথ নেই, ট্রাম-গাড়ি রয়েছে আটকে, দু-তিনজন লাল-পাগড়ি জনতাকে ছত্রভঙ্গ অথবা নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কে কার কথায় কান দেয়! সকলে মিলে একটা বিশ্রী হৈ-চৈয়ের সৃষ্টি করেছে। বোঝা গেল একটা কোন গুরুতর কাণ্ডই ঘটেছে।

গিরীন সাবধানী মানুষ; বললে, "ওদিক দিয়ে গিয়ে কাজ নেই।

চল, চেৎলোপটি রোড দিয়ে ফেরা যাক।" চেৎলোপটি রোডের বর্তমান নাম সুবারবান্ স্কুল রোড।

ব্যাপারটার সন্ধান না নিয়ে আমাদের কিন্তু রণে ভঙ্গ দিতে ইচ্ছে হ'ল না। জনতার দিকে অগ্রসর হলাম। কাছাকাছি গিয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে মশায়, এখানে ?"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বলতে পারি নে, শুনছি গর্তের মধ্যে না-কি সাপের মাথার মণি দেখা যাচ্ছে।"

সর্বনাশ। ঘণ্টা দেড়েক আগে যে চারাগাছ রোপণ ক'রে গিয়েছিলাম, এরই মধ্যে তা এত বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে! জনতার একেবারে কাছে গিয়ে দেখি, একটি মোটাসোটা মানুষ হাঁচোড়-পাঁচোড় ক'রে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। লোকটি একটু ফাঁকায় এলে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি মশাই, অনুগ্রহ ক'রে বলুন তো ?"

লোকটির মুখে পরিতৃপ্ত আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধদীপ্তি ফুটে উঠল; মৃদু হেসে বললে, "ব্যাপার চমৎকার! সাপের মাথার ওপর মণি, তাই থেকে আভা ছাড়ছে,—কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো কমলানেবুর রঙের।"

পাশ থেকে অপর একটি লোক বললে, "আমি কমলানেবুর রঙ দেখতে পাই নি, সবুজ আর বেগুনে দেখেছি। শুনছি কমলানেবুর রঙ না-কি খুব কম লোকেই দেখতে পাচ্ছে।'

মিথ্যা কথার নির্লজ্জ দাপট দেখে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্ব'লে উঠল। বললাম, "আচ্ছা, যে জিনিস নিশ্চয় জানেন দেখেন নি, সে জিনিস দেখেছেন ব'লে এমন ফলাও ক'রে বর্ণনা করতে মুখে বাধছে না আপনাদের ?"

প্রথমোক্ত লোকটি বললে, "স্বচক্ষে দেখলাম, আর বললেই হ'ল দেখি নি ?"

বললাম, "স্বচক্ষে যদি দেখে থাকেন, তা হ'লে আজ থেকে অমন কপট চোখ দুটোকে পটিবাঁধা ক'রে রাখবেন।"

পিছন থেকে কে একজন বললে, "ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন। ও-সব ইস্কুলে-পড়া ছেলেদের সঙ্গে তক্কো করবেন না। এ তো সাপের মাথার মণি, ওরা বোধ হয় মা-কালীকে অবিশ্বাস করতেও ছাড়ে না।"

কঠোর কণ্ঠে বললাম, "এ রকম দল বেঁধে আপনারা সাপের মাথার মণি দেখতে আরম্ভ করলে, মা-কালীকে অবিশ্বাস করিয়ে ছাড়তে খুব বেশি দেরি করবেন না আপনারা।"

রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। পিছন ফিরে চেলোপটি রোড দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কৌতুক হয়তো সেদিন কিছু পেয়েছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে মনের মধ্যে একটা কাঁটাও কম খচ্‌খচ্‌ করছিল না। পরকে ঠকাবার জন্যে মানুষ কতখানিই না নিজেকে ঠকাতে পারে! কোন্ পরমার্থ লাভের জন্য এরা এই অহেতুক মিথ্যাচারণের আশ্রয় নিলে, তা সম্পূর্ণ রহস্য র'য়ে গেল। মনে মনেও কি এরা এর জন্যে নিজেদের কাছে কুণ্ঠিত হয় না!

মানুষ হ'তে মানুষের এখনো যে কত বাকি!

৮

এ পর্যন্ত নষ্টামির যে তিনটি উদাহরণ বিবৃত করেছি, সেগুলির কোনোটিকেই ঠিক 'অনিষ্টামি' বলা চলে না। সেগুলি এক পক্ষকে, অর্থাৎ উত্তম পক্ষকে যতটা কৌতুকান্বিত করেছে, মধ্যম পক্ষকে ততটা পীড়িত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। এবার নষ্টামির যে কাহিনীটি বলতে উদ্যত হয়েছি, তাতে মধ্যম পক্ষকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত এবং উপদ্রুত করা হয়েছে। সুতরাং এ উদাহরণটিকে 'অনিষ্টামি'র পর্যায়ে ফেলা চলে।

সত্য সত্যই অনিষ্ট করবার কতটা অভিসন্ধি এ ক্ষেত্রে ছিল, তা বলা কঠিন। বস্তুত যে পরিমাণ অনিষ্ট করা হয়েছিল, তা দেখে পাঠকেরা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ এবং পীড়িত বোধ করবেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এ কাহিনীটি হয়তো বিবৃত না করলেই ভালো ছিল। কিন্তু নিছক সাহিত্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে গল্পটির বেশ একটু মূল্য পারলক্ষিতও হবে। কয়লার এক প্রান্তে নিবদ্ধ হীরককণার ন্যায় এর একটি উজ্জ্বল দিকও আছে।

গল্পটি আমি ইতিপূর্বে বন্ধু-বান্ধবের বৈঠকে কয়েকবার বিবৃত করেছি। সকলেরই মনে গল্পটি একটা ক্ষোভ ও বিরক্তিমিশ্রিত বেদনা জাগিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতুকরসের আনন্দের সৃষ্টি করতেও ছাড়ে নি। কাহিনীটি শুনলে রসজ্ঞ পাঠকেরা বুঝতে পারবেন এ কাহিনীতে যে কৌতুকরসসম্পন্নতা আছে, তা সত্যই সাহিত্যের বস্তু।

আমার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় এবং বিশিষ্ট বন্ধু সুকবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আমার মুখে এই গল্পটি শুনে বিশেষ পুলকিত হয়েছিলেন এবং গল্পটি যাতে

সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে, অজানার তিমিরগর্ভে হারিয়ে না যায়, সেজন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। আজ এ কাহিনীটি লিখতে উদ্যত হ'য়ে সুরেনবাবুর কথা সহসা মনে প'ড়ে গেল।

গল্পটি পূর্বোক্ত কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শোনা। নষ্টামি করবার বিষয়ে কামিনীবাবু যে সহজ ও অসামান্য নিপুণতার অধিকারী ছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ হয়েছিল তিনিই এ গল্পের নায়ক, অর্থাৎ প্রথম পক্ষ, পরিকল্পনাটি তাঁর মতো চতুর লোকের দ্বারাই উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হবার উপযুক্ত। তিনি কিন্তু সে কথা অস্বীকার করেছিলেন। হ'তেও পারে; গুরুরও গুরু থাকা তো অসম্ভব নয়। এবার কাহিনীটি বলি।

দীর্ঘকাল পূর্বের কথা। তখন ভারতবর্ষে সেন্সাসের কাজ চলছে। ভাগলপুর ডিভিশনের প্রধান অফিস ভাগলপুর শহরে অবস্থিত। সেই অফিসে কামিনীবাবু কাজ করেন।

সেণ্ট্রাল সেন্সাস অফিসের আট-দশটি বাঙালী কর্মচারী [illegible] বাবুর সহিত একত্র মিলিত হ'য়ে যোগসর পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া নিয়ে বাস করে। মেসের সকল সভ্যই অবিবাহিত, একমাত্র রামনাথ লাহিড়ী ব্যতীত।

রামনাথের নিবাস পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায়। তার এক পায়ে কুশ-দোষ ছিল ব'লে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। মেসের সদস্যরা সামনে তাকে রামদা ব'লে ডাকত, আড়ালে বলত খোঁড়ারাম। পল্লীর অবাঙালী জনসাধারণের নিকট রামনাথ 'লংড়াবাবু' নামে পরিচিত ছিল।

প্রথমে চার-পাঁচটি যুবক মিলে বাসাটির পত্তন করে। তারপর ক্রমশ এক-একজন ক'রে যোগ দিয়ে দলবৃদ্ধি করেছে এবং দেখতে দেখতে

মিছরির শরবতে মিছরির টুকরার মতো বেমালুম মিশে গেছে। রামনাথ কিন্তু সেই যে প্রথম দিন মিছরির শরবতে পাথরকুচির মতো পড়েছিল, আজ পর্যন্ত যে-পাথরকুচি সেই-পাথরকুচিই র'য়ে গেছে। না পাথরকুচি খানিকটা গ'লে শরবতের মধ্যে মিশেছে, না শরবত দুশ্ছেদ্য পাথরকুচির মধ্যে কতকটা অনুপ্রবিষ্ট হ'তে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মেসে দুটি দল বর্তমান—একটি মিছরির শরবতের, অপরটি পাথরকুচির। পাথরকুচির দলে রামনাথ অবশ্য একাই এক শো।

উভয় দলের মধ্যে এতটা বিস্তৃত পার্থক্যের সহজে প্রতীয়মান কয়েকটা কারণ ছিল। বয়সে রামনাথ অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে পাঁচ ছ বৎসরের বড় তো ছিলই, তা ছাড়া সে ছিল বেশ খানিকটা নীরস সত্যবাদী সততাবিক্যকঠোর রূঢ়ভাষী মানুষ। একমাত্র ভর্ৎসনার বিদ্রূপাত্মক হাসি ভিন্ন অন্য কোনো শ্রেণীর হাসির সহিত তার মুখের বড় একটা পরিচয় ছিল না। কৌতুক-পরিহাসকে সে মানুষের আদিম বর্বরতার অস্তগমনোন্মুখ চিহ্ন ব'লে মনে করত; আর গান-বাজনা-খেলাধুলাকে সত্য সত্যই অসুরের সহিত ব্যসন মনে ক'রে পাশ কাটিয়ে চলত।

গৃহের মধ্যে একটি ছোট ঘর ছিল, তাতে দুজনের বাস করা কষ্টকর নয়। কিন্তু 'দুর্জনকে বর্জন করো' নীতি অবলম্বন ক'রে মেসের সদস্যরা একা রামনাথকে সে ঘরে নির্বাসন দিয়েছিল। রামনাথও তার হাস্য-পরিহাসপ্রিয় গীতিগুঞ্জনপরায়ণ লঘুপ্রকৃতি সঙ্গীদের হাত থেকে মুক্তি-লাভ করবার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর কয়েকজন সদস্য একত্র হ'য়ে হয়তো তাসখেলায় অথবা গান-বাজনায় বসে। ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বহুদিনের পুরাতন একখানি জীর্ণ চৈতন্যচরিতামৃত খুলে পড়তে বসে রামনাথ। তাসের হর্‌রা অথবা গানের উচ্ছ্বাস উদ্দাম হ'য়ে উঠলে

চৈতন্যচরিতামৃত বন্ধ ক'রে সে উঠে পড়ে; তারপর ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে নিকটবর্তী বুড়ানাথের ঘাটে গিয়ে নিঃশব্দে ব'সে থাকে। রাত্রি নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত তথায় কাটিয়ে, ততক্ষণে তাস ও গানের দৌরাত্ম্য থেকে গৃহ মুক্তিলাভ করেছে অনুমান ক'রে, বাসায় ফেরে।

একদিন বিজয় নামে এক মেম্বার দাবাখেলায় রামনাথকে আহ্বান করেছিল। উত্তরে রামনাথ বলেছিল, "তোমাদের সেই শুঁড়বিহীন গজের খেলা তো বিজয়? ছেলেবেলায় হাত-পা-বিহীন কাঠের পুতুল নিয়ে হয়তো খেলা করেছিলাম, কিন্তু এখনো যদি শুঁড়বিহীন কাঠের গজ নিয়ে খেলা করি, তা হ'লে বয়সের সামঞ্জস্য থাকবে তো?"

উত্তরে বিজয় বলেছিল, "তোমার মুখে শুনেছি রামদা, দেশে তোমাদের বাড়িতে শালগ্রামশিলা আছে। হাত-পা-মুখ-চোখ-বিহীন সেই শিলাখণ্ডকে এই বয়সে তুমি কোন্ সামঞ্জস্যের জোরে পূজো কর, বুঝিয়ে দিতে পার?"

রামনাথ উত্তর দিয়েছিল, "তুমি শুঁড়বিহীন কাঠের গজের খেলোয়াড়, হাত-পা-বিহীন শিলাখণ্ডকে পূজো করবার মর্ম কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাতে পারি বল?"

হা-হা ক'রে হেসে উঠে বিজয় বলেছিল, "পার না তো? তা হ'লে, না খেলেও শুঁড়বিহীন কাঠের গজের চালে তুমি মাৎ হয়েছ রামদা। পারা উচিত ছিল তোমার। আমি কিন্তু তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।"

এই ধরনের বাদ-বিসম্বাদ বিতর্ক-বিরোধ রামনাথ এবং অপর সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই লেগে থাকত। কিন্তু এসব নিয়েও একত্রে বাস করা চলে, এমন কি, উভয় পক্ষ থেকে খানিকটা শ্রদ্ধা-স্নেহের আদান-প্রদানের সহিতও। বস্তুত, রামনাথের সরল চরিত্র এবং নিষ্কলুষ প্রকৃতির জন্যে

মেসের অপর মেম্বাররা মনে মনেও তাকে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখত, তার কঠোর আচরণ এবং রূঢ় বচনকে কতকটা হাতীর লাথির মতো সহ্য করত।

এতদিন এই বিরোধ এবং মতভেদ চলছিল সংসারের লঘু এবং কতকটা অগর্হিত বিষয়কে আশ্রয় ক'রে। সুতরাং তার গ্লানি অন্তরের গভীর প্রদেশ স্পর্শ করতে পারত না। তাসখেলাকে প্রতিরোধ করা চলত চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতসাগরে ডুব মেরে; গানবাজনার প্রতিবাদ করা চলত রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত বুড়ানাথের ঘাটে নিঃশব্দে ব'সে কাটিয়ে। কিন্তু লখিয়া নামে পনের-ষোল বৎসর বয়সের একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের সহসা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পর থেকে মতভেদ হ'য়ে উঠল প্রখর। নরম মৃত্তিকার ক্ষেত্রে যে বিরোধ এতদিন ছিল সাধারণ, নীতির কঠিন পাষাণে শাণিত হ'য়ে, অন্তত রামনাথের দিক থেকে, সে বিরোধ হ'য়ে উঠল সুতীক্ষ্ণ।

মেয়েটি এতদিন ছিল তার মামার বাড়িতে; অকস্মাৎ একদিন পিত্রালয়ে এসে উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত পল্লীটা একটা নূতন আলোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। মুদীর মুখে সহাস্য কুশল প্রশ্ন; সঙ্গিনী-দের মুখে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি; পথচারীদের নেত্রে সানন্দ বিস্ময়ের উজ্জ্বল আলোক। সেন্সাসবাবুদের দ্বিতলের বারান্দাও এই নবাগত আলোকের প্রভা থেকে পরিত্রাণ পেলে না। একমাত্র রামনাথ ব্যতীত একে একে আর সকলেই এই নূতন আলোকের কিরণধারায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

অপ্রয়োজনে লখিয়াকে কখনো গৃহের বাইরে দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু দুটি জায়গায়, প্রথমত প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসার পথে, দ্বিতীয়ত রাস্তার কলের জলের হাইড্রান্টে। হাইড্রান্টটি

কৈলাসবাবুদের মেসের ঠিক সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে অবস্থিত। শূন্য কলসী কাঁখে নিয়ে লীলায়িত গতিতে লখিয়া জল ভরতে আসে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! ভূমিতলে কলসী স্থাপন ক'রে হাইড্রান্টের দেহের উপর নিজের দেহবল্লরী হেলিয়ে দিয়ে ঘনপক্ষ্ম আয়ত নেত্রের গুণ্ঠনত দৃষ্টির দ্বারা জলভরা দেখতে দেখতে লখিয়া চিত্রকরের পক্ষে লোভনীয় বিষয়-বস্তু রচিত করে, তারপর, কুম্ভ পূর্ণ হ'য়ে গেলে মাথার উপর কলসী বসিয়ে বাম হাতখানি আলগাভাবে কলসীর দেহে স্থাপন ক'রে ডান হাত ঈষৎ আড়ভাবে আড়ষ্ট ক'রে গৃহে ফেরে,—সেও এক কম অপরূপ দৃশ্য নয়। সকালবেলা গঙ্গাস্নানের পর লখিয়া তার ষোল বৎসর বয়সের সুঠাম দেহযষ্টি সিক্তবস্ত্রে আবৃত ক'রে গৃহে ফেরে, পাশের মুদীখানার দোকান থেকে বৃদ্ধ দেওকীলাল বণিয়া এই উচ্ছল যৌবনোৎসব দেখে, আর পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার তার পঁচিশ বৎসর বয়সের কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। লখিয়ার অদেহী নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য তাকে পঁয়ত্রিশ বৎসরের অতীতে টেনে নিয়ে যায়।

একদিন সকালবেলা মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরেশ নামে এক মেম্বার পথের লোকচলাচল দেখছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ চোখে পড়ল লখিয়াকে। জলের হাইড্রান্টের ওপর ভর দিয়ে লখিয়া জল ভরছে। সৌন্দর্যের একটি কমনীয় লীলা হাইড্রান্ট বেষ্টন ক'রে রয়েছে, যৌবনরস-মদির চক্ষে ভারি ভাল লাগল পরেশের। ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থেকে দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ ক'রে পরেশ বললে, "সুকুমার, শীগগির।"

তাড়াতাড়ি পরেশের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে পরেশের অঙ্গুলি-নির্দেশে লখিয়াকে দেখতে পেয়ে সুকুমার এক মুহূর্ত নির্বাক হ'য়ে দাঁড়াল; তারপর ধীরে ধীরে বললে, "সত্যিই অপরূপ পেথম্ রামা! মুখখানি যে হরিণহীন হিমধামা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

পরেশ বললে, "তুমি কবি মানুষ, তাই তাড়াতাড়ি তোমাকে খবর দিলাম।"

সুকুমার কবি মানুষ হ'তে পারে; কিন্তু দিন দুয়েকের মধ্যে বোঝা গেল, একমাত্র রামনাথ ব্যতীত মেসের কোনো সদস্যই অকবি নয়; লখিয়া-কাব্যসুধারস বিষয়ে সকলেই একই মাত্রায় রসিক। উৎসাহী বিজয়কুমার চিনি কিনতে গিয়ে কথায় কথায় বৃদ্ধ দেওকীলালের কাছ থেকে লখিয়া নামটাও সংগ্রহ ক'রে আনলে। শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হ'ল। লখিয়া নাম যে অতি সুমিষ্ট নাম, এমন কি, বাংলা দেশের 'অমিয়া' নামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা গেল না।

সুকুমার বললে,

"লখিয়া লখিয়া বাজিছে শ্রবণে,
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
লখিয়া লখিয়া লখিয়া নাম!"

উল্লাসের সমুচ্চ হাস্যরবে মেস্ গৃহ চকিত হ'য়ে উঠল।

এর পর মেসের সদস্যদের মধ্যে লখিয়া-সন্দর্শনের উৎসাহ দিনে দিনে বেড়েই চলল। সমাজ এবং পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অনূঢ় যুবকের হৃদয়ে লখিয়া মোহের ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে দাঁড়াল।

কথাটা রামনাথ খানিকটা উপলব্ধি করলে, খানিকটা শুনলে। লখিয়ার নামটাও তার জানতে বাকি রইল না। লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভের গ্লানিতে তার হৃদয় পীড়িত হ'য়ে উঠল। ছি ছি! ভদ্রসন্তান ব'লে নিজেদের পরিচয় দিতে যারা ইতস্তত করে না, তাদের এই হীন আচরণ! নীতি কি তা হ'লে শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে, মানুষের জীবনে কোনোদিন তা দেখা দেবে না? মনে মনে সে সঙ্কল্প করলে, এই

মলিন আচরণ সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সে এর প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে। তা যদি না করে, তা হ'লে এ মেসে থাকবার যোগ্য সে নয়।

লখিয়া কলে জল ভরছিল, আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরেশ প্রভৃতি কয়েকজন তাকে দেখতে দেখতে তার সম্বন্ধে সরস আলোচনা করছিল, এমন সময়ে রামনাথ তথায় উপস্থিত হ'য়ে রূঢ় কণ্ঠে বললে, "কি তোমরা দেখছ ওখানে?"

শান্ত কণ্ঠে বিস্ময় বললে, "লখিয়াকে দেখছি রামদা।"

"কেন দেখছ?"

উত্তর দিলে শৈলেশ নামে এক সদস্য, বললে, "Simple because আমাদের চোখ আছে।"

শৈলেশের প্রতি তীব্র নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রামনাথ বললে, "আছে কি চোখ তোমাদের? আমার তো মনে হয়, নেই। থাকলে চক্ষুলজ্জাও থাকত।"

স্মিতমুখে সুকুমার বললে, "আমার মনে হয় তোমারও চোখ নেই রামদা। থাকলে লখিয়াকে তুমি দেখতে।"

একটা সমবেত উচ্চহাস্যে রাজপথ চমকিত হ'য়ে উঠল। কৌতূহলী হ'য়ে লখিয়াও বোধ হয় একবার বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

অপমানে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কতকগুলো যৎপরোনাস্তি কঠোর বাক্য ব'লে রামনাথ দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

পরেশ বললে, "তোমার কোপ দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই তুমি বরিশালের রামদা—এক কোপেই তুমি আমাদের সকলকে সাবাড় করতে পার।"

কঠোর স্বরে রামনাথ বললে, "বরিশালের রামদার হাত থেকে

তোমরা হয়তো রক্ষা পেতে পার। কিন্তু যে পথে চলেছ সেই পথেই যদি চল, তা হ'লে ভাগলপুরের ডাণ্ডা থেকে তোমাদের নিস্তার নেই; একদিন তা তোমাদের মাথা গুঁড়ো করবেই।"

আর অপেক্ষা না ক'রে ঝড়ের বেগে রামনাথ তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে।

এর পর থেকে সর্বদাই উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে লাগল। কিন্তু কেউ কাউকে নিরস্ত করতে পারে না। এক পক্ষের চক্ষু এবং অপর পক্ষের জিহ্বা সমানে পরস্পরকে টক্কর দিয়ে চলে।

একদিন সকালবেলা রামনাথ সবেমাত্র চৈতন্যচরিতামৃত খুলে বসেছে, এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করল শৈলেশ সুকুমার প্রভৃতি চার-পাঁচজন বন্ধু। বইয়ের পাতায় একটা স্লিপ দিয়ে বইখানা মুড়ে রেখে রামনাথ বললে, "কি ব্যাপার?"

গম্ভীর মুখে শৈলেশ বললে, "কাল শেষরাত্রে সুকুমার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে রামদা, আমরা তার কোনো অর্থ করতে পারছি নে। তুমি তো স্বপ্ন-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছ, তুমি যদি ওর অর্থটা বাতলে দিতে পার।"

অসংশয়িত চিত্তে রামনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "কি স্বপ্ন দেখেছে?"

শৈলেশ বললে, "স্বপ্ন দেখেছে, ও যেন আমাদের মেসের সামনে জলের কলের হাইড্রাণ্ট হয়েছে।"

যে কৌতুকহাস্য এতক্ষণ সযত্নে অবরুদ্ধ ছিল, তাকে আর কিছুতেই সামলে রাখা গেল না, সজোরে মুক্তিলাভ করলে।

নিমেষের জন্যে রামনাথের মুখমণ্ডল কালো হ'য়ে উঠল; কিন্তু মনে মনে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বললে, "স্বপ্নটা সুকুমার এখনো সবটা দেখে নি; দেখতে আর একটু বাকি আছে। সেটুকু দেখা হ'য়ে

গেলে অর্থটা তোমাদের কাছেও আর অস্পষ্ট থাকবে না। আজ শেষরাত্রে সুকুমার স্বপ্ন দেখবে, আমাদের পাড়ার চম্পা মেথরাণী তার নোংরা ঝাঁটাটা সেই সুকুমার-হাইড্রান্টের গায়ে মেরে মেরে পরিষ্কার করছে।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে রামনাথের কক্ষ প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

রামনাথ বলতে লাগল, "শোন শৈলেশ, তোমরা যদি এই অভদ্র দুর্নীতির পাপ থেকে নিজেদের রক্ষে না কর, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো এর প্রায়শ্চিত্ত একদিন তোমাদের করতেই হবে।"

রামনাথ যখন এই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত করছিল তখন জানত না, সে একটা ভবিষ্যদ্বাণীই উচ্চারিত করছে, প্রায়শ্চিত্ত আসন্ন হ'য়ে উঠেছে; বেদনান্ত লখিয়া-নাটকের যবনিকাপাত হ'তে আর দেরি নেই।

দিন দুই পরের কথা। ডিসেম্বর মাসের দুর্জয় শীত, তার উপর সকাল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ে চলেছে, যার ফলে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো শীতটা চতুর্গুণ বৃদ্ধিলাভ করেছে। ছুটির দিন ব'লে তবু খানিকটা রক্ষে।

মন্মথ নামে সেন্সাস-মেসের এক সদস্য বিশেষ প্রয়োজনে এমন দুদিনেও বৈকালের দিকে বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সে যখন বাসার কাছে পৌঁছল, তখন তমসাচ্ছন্ন কলতলায় দাঁড়িয়ে লখিয়া জল ভরছে। মন্মথর মাথায় ছাতি, গলায় কমফরটার, দেহে আলোয়ান। অকস্মাৎ তার মস্তিষ্কে একটা দুষ্টবুদ্ধির উদয় হ'ল; নষ্টামির পরিকল্পনাটা এমনই উগ্রলোভাত্মক যে, তদ্বিষয়ে ভাল-মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্য ভেবে দেখবার বিবেচনা না পেলে আসবার পথ, না পেলে চিন্তার সময়।

তাড়াতাড়ি মন্মথ পথের দুই দিকে চেয়ে দেখলে, পথ জনশূন্য; দেওকীলালের দোকান-ঘরেরও ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে বাতিও বোধ হয়

জ্বলছে না। ছাতাটা যথাসম্ভব নীচু ক'রে দিয়ে লেংচাতে লেংচাতে মন্মথ লখিয়ার নিকট উপস্থিত হ'ল, তারপর মুহূর্তমাত্র তথায় অবস্থান ক'রে পুনরায় লেংচাতে লেংচাতে মেসে প্রবেশ ক'রে দরজা লাগিয়ে দিলে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মেসের সম্মুখে পথের উপর রৈ-রৈ কাণ্ড! আট-দশজন বলিষ্ঠ যুবক বড় বড় লাঠি নিয়ে মারমুখ হ'য়ে ছুটে এসেছে,—'আজ লংড়াবাবুকো জান্‌সে মার দেগা।'

বিপাকও আবার এমনি, কোলাহল শুনে কৌতূহলী হ'য়ে রামনাথই সর্বপ্রথম বারান্দায় গিয়ে হাজির। আর যায় কোথায়! তাকে দেখামাত্র অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে লোষ্ট্র-বর্ষণও। ওদিকে সদর-দরজার ওপর ধড়াদ্ধড় লাঠি পড়ছে—"খোলো, দরবাজা খোলো, নহি তো তোড় দেগা।"

হাঙ্গামা বাধবার পূর্বেই মন্মথ বোধ হয় কারো কারো কাছে কথাটার একটু আভাস দিয়েছিল। পরিণতি দেখে বুঝতে কারো বাকি রইল না, একটা দুর্মোচ্য সঙ্কটের তাড়নায় মেস এবং মেসবাসীরা উৎকটভাবে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে। যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ, সেই রামনাথকে নিয়েই উপস্থিত সকলের চেয়ে বিপদ। বিজয় ও শৈলেশ বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে যখন রামনাথের কোমর জড়িয়ে ধ'রে টানাটানি লাগালে, তখন রামনাথ উত্তেজিত হ'য়ে বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়েই বা পড়ে, এমনি অবস্থা! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলছে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-কাজ আমিই করেছি, লাঠি দিয়ে তোমরা আমার মাথা গুঁড়িয়ে দাও। দাঁড়াও, আমি গিয়ে দরবাজা খুলে দিচ্ছি।"

উন্মত্ত রামনাথকে জড়িয়ে ধ'রে বিজয় ও শৈলেশ কোনোমোতে রামনাথের ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। উভয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হবার জন্ত

প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে রামনাথ বলতে লাগল, "না না, ছেড়ে দাও আমাকে। ওদের মধ্যে গিয়ে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

বাহিরে তখন মেসের সদর-দরজার সম্মুখে বৃদ্ধ দেওকীলাল এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন ক'রে বলছে, "খবরদার! হুজ্জোত ক'রো না। আমি থানায় খবর দিয়েছি, এখনি পুলিস আসবে। উল্টা তোমরাই বিপদে প'ড়ে যাবে। লংড়াবাবু এমন কাম করতে পারেন ব'লে আমার কিছুতেই মনে হয় না, আলবাৎ এর মধ্যে কোনো ভেদ (রহস্য) আছে। আমাকে ভিতরে যেতে দাও। খবরদার, কেউ সঙ্গে এসো না।"

ধনবান ব'লে পাড়ার মধ্যে দেওকীলালের খানিকটা প্রতিপত্তি আছে। পল্লীর অধিকাংশ লোকই তার খাতক। তা ছাড়া, চতুর দেওকীলাল থানায় খবর দেবার ভয় দেখিয়েছিল। জনতা অনেকটা শান্ত হ'ল।

বাকিটুকু সংক্ষেপেই বলি। দেওকীলালের মধ্যস্থতায় পঞ্চায়েৎকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে হাঙ্গামাটা একেবারে মিটে গেল। উৎকট সঙ্কট থেকে এত সহজে মুক্তিলাভ ক'রে মেসের মেম্বারগণ নিজেদের সৌভাগ্যবান ব'লে বিবেচিত করলে। তখনি তারা নিজেদের মধ্য থেকে টাকাটা সংগ্রহ ক'রে দেওকীলালের হাতে জমা ক'রে দিলে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে অবসন্নভাবে রামনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাছে সে জেগে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে কোনো হাঙ্গামা বাধায়, সেই ভয়ে তার ঘরের দরজায় শিকল চড়িয়ে দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। আহারের সময়ে তাকে ডাকতে এসে দেখা গেল, কোনো এক সময়ে সে ভিতরের হুড়কা লাগিয়ে দিয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও

সে দোর খুললে না,—একবার যেন চাপা গর্জনের মতো একটা কি শোনা গেল, কিন্তু সেই পর্যন্তই। সুতরাং সে রাত্রি রামনাথ অনাহারেই রইল।

শুধু রামনাথই নয়, সে রাত্রে মেসের অনেকেই আহারে বসতে পারলে না; গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রাহীন শয্যায় নির্বাক হ'য়ে এপাশ ওপাশ ক'রে কাটালে।

প্রত্যুষে উঠে সকলে একত্র হ'য়ে ক্ষণকাল আলোচনার পর স্থির করলে, ভুলেও আর কখনো তারা লখিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। রামনাথকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য সকলে রামনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে, ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল, একটা কাচের গ্লাস চাপা দেওয়া দুখানা চিঠি।

চাকরিতে ইস্তফা জানিয়ে প্রথম চিঠি সে লিখেছে অফিসের প্রধান কর্মচারীকে। দ্বিতীয় চিঠি, বিশেষ ক'রে কাউকে সম্বোধন করা না হ'লেও মেসের মেম্বারদের লিখেছে তা সুস্পষ্ট। চিঠিখানা এই রকম—

এ চিঠি তোমরা যখন পড়বে তখন আমি বরিশালের পথে এগিয়ে চলেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যখন খানিকটা করতে হয়েছে, তখন না গেলেও হয়তো চলত। কিন্তু একটা কথা মনে ক'রে থাকতেও পারলাম না। সেন্সাসের লোক গণনার দিন আসন্ন। আমাদের মেসেও লোক-গণনা অবশ্যই হবে। গোটা আষ্টেক পশু যখন মানুষ ব'লে নাম লেখাবে, তখন সেন্সাসের লোক হ'য়ে কি ক'রে আমি তা বরদাস্ত করব? তাই স'রে পড়লাম।

অফিসের চিঠির মধ্যে দেরাজের চাবি আছে।

চিঠি ও চাবি অফিসে দিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

আর এক কথা। আমার ট্রাঙ্ক বাক্স বিছানাপত্র যা কিছু রইল গরিবকে বিলিয়ে দিয়ো। গরিব লোকের জিনিস গরিবের ঘরে গেলেই

ভাল হবে। এক কাজ না হয় ক'রো। রবিবারে রবিবারে শিঙা বাজিয়ে কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত যে লোকটা আসে, নাম বোধ হয় বুদ্ধন,—তাকেই সব দিয়ে দিয়ো। ট্রাঙ্ক খোলা রইল। ইতি—

রামনাথ

স্পষ্টবাদী রূঢ়ভাষী রামনাথ তার বিদায়পত্রেও তীব্র রূঢ়তার একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা রেখে গেছে।

দলের মধ্যে সুকুমারই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কোমলপ্রকৃতির। দেখা গেল, ঘন ঘন সে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছছে।

৯

তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ি। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় কলিকাতায় দুর্দান্ত গরম পড়েছে। মধ্যাহ্ন কাল। ধূলিপাংশু উত্তপ্ত আকাশ অপ্রসন্ন খরনেত্রে কলিকাতা মহানগরীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে আগুনের হল্কা। রাজপথে পথচারীর সংখ্যা বিরল। এমন কি, গাড়ি-ঘোড়াও বেশি চলছে না।

আমাদের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। পথের দিকের সমস্ত জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে নীচেকার বৈঠকখানায় নিদ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় কাটাচ্ছি, এমন সময় সদর-দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল। কড়া নাড়ার উৎসাহ দেখে বুঝলাম, আগন্তুক আর এক মুহূর্তও বাইরের মার্তণ্ডের ক্রোধাগ্নির মধ্যে অবস্থান করতে প্রস্তুত নয়। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললাম। আরক্ত-স্মিতমুখে প্রবেশ করলেন সৌরেন— অর্থাৎ পরবর্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ছাতা একটা আছে বটে, কিন্তু মাইলখানেক পথ উত্তপ্ত বায়ুর মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার জন্য সমস্ত অঙ্গে ঝলসানির একটা সুস্পষ্ট রক্তাভা।

অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুকে পেয়ে খুশি নিশ্চয়ই হলাম; কিন্তু বিস্মিত হলাম তার চতুর্গুণ। বৈঠকখানা ঘরে এসে একটা জানলা খুলে দিয়ে ব'সে বললাম, "ব্যাপার কি বলতো সৌরেন? এই ভীষণ রোদ্দুরে—"

কথা শেষ না করতে দিয়ে সৌরেন বললে, "তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কাজ আছে উপেন।"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বল তো ?"

"আমাকে গান শেখাতে হবে।"

প্রস্তাব শুনে তো, চক্ষুস্থির ! গান শেখাতে হবে, সে অবশ্য এমন-কিছু অন্যায় কথা নয়, কিন্তু আরম্ভটা তাই ব'লে এই ভয়াবহ লগ্নে ? বললাম, "হারমোনিয়ম কিনেছ নাকি ?"

"হারমোনিয়ম কি হবে ?"

কথাটা সৌরেন এমন একটু বিস্ময়চকিত স্বরে বললে যে, খানিকটা অপ্রতিভ ব'নে যেতে হ'ল। বললাম, "হারমোনিয়মের সাহায্য না নিয়ে গান গাইতে পারলে অবশ্য খুবই ভাল হয়, তবে আরম্ভের দিকে সামান্য একটু স্বরের আশ্রয় নেওয়াও মন্দ নয়।"

আমার সারগর্ভ উপদেশে সৌরেন বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলে ব'লে মনে হ'ল না, অধীরভাবে বললে, "নাও, আরম্ভ কর। শেখাও।"

আগ্রহ প্রশংসনীয়, কিন্তু 'সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্' নীতি অনুযায়ী খানিকটা যেন অত্যন্তর কাছ ঘেঁষে চলেছে। বললাম, "ক্লান্ত হ'য়ে এসেছ, একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সৌরেন বললে, "বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই, বিশ্রাম গান শিখতে শিখতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।"

দেখলাম, একটা যা-হয়-কিছু না ক'রে উপায় নেই। বললাম, "সা রে-গা-মা আয়ত্ত আছে তো ?"

বিস্মিতকণ্ঠে সৌরেন বললে, 'সা রে-গা মায় কি হবে ?"

বিপদে পড়লাম। কিছুতেই যদি কিছু না হয়, তা হ'লে কিছু হয়ই-বা কোন্ উপায়ে ? বললাম, "হারমোনিয়ম না হ'লে হয়তো হয় সৌরেন, কিন্তু সা-রে-গা-মা না হ'লে হয় না। ভাষা শিখতে গেলে যেমন বর্ণ-পরিচয় আবশ্যক, গান শিখতে গেলে তেমনি সা-রে-গা-মা।"

ব্যস্ত হ'য়ে সৌরেন বললে, "তুমি বুঝছ না উপেন, মজলিস-মজানো গান তো আমি শিখতে চাচ্ছি নে, আমি চাচ্ছি সাধারণভাবের একটু শিক্ষা ; আমার সা-রে-গা-মার দরকার কি বল ?"

বললাম, "কেউ যদি বলে, আমি রামায়ণ-মহাভারত পড়তে চাচ্ছি নে, পড়তে চাচ্ছি শুধু পদ্যপাঠ কথামালা পর্যন্ত, তারও তো বর্ণপরিচয়ের দরকার হয় সৌরেন ?"

সৌরেন বললে, "তা হ'লে আসল কথাটা তোমাকে খুলে বলি। আমার এক-আধটা বই যখন স্টেজে অভিনীত হ'তে আরম্ভ করেছে, তখন গান গাওয়া বিষয়ে কিছুটা ধারণা আয়ত্ত করতে পারলে গান রচনার কাজটা কতকটা সহজ ও সুষ্ঠু হ'তে পারবে। সুতরাং আমাকে তুমি সোজাসুজি গান শেখাও।"

এর পরও তর্ক করা চলত, কিন্তু আত্মসমর্পণ করলাম ; বললাম, "কি রকম গান শিখবে বল ?"

সৌরেন বললে, "থিয়েটারের গান, বেশ নাচুনে তালের।"

নাচুনে তাল কি বস্তু তা আমার জানা ছিল না ; বললাম, "বুঝেছি।"

পূর্বেই বলেছি, সে সময়ে খুব জোর 'আলিবাবা'র যুগ চলেছে ; বললাম, "'বাজে বাজে মিন্‌সেকে আর' ধরব ?"

সৌরেনের মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল ; বললে, "চমৎকার হবে। ধর।"

ধরলাম। কিছুকাল ধ'রে যে ব্যাপার চলল, তা শুধু মানুষের পক্ষেই নয়, দেবতাদের পক্ষেও উপভোগের বস্তু। একজন চলল গান গেয়ে, আর প্রসন্ন মুখে আর একজন চলল তার সঙ্গে স্রেফ্ কথা ক'য়ে। সে কথা কওয়ার মধ্যে স্বর আছে, কিন্তু সুর নেই। হারমোনিয়মের পর্দায় সে স্বর ধরা পড়ে না। কিন্তু তার ওপর সওয়ার হ'য়ে আছে এক রাশ

মাথা-নাড়ানো হাত-দোলানো প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী। নাচুনে তাল কি বস্তু তা কতকটা বুঝলাম।

গান শেষ ক'রে সৌরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু সুবিধে হ'ল সৌরেন?"

প্রফুল্লমুখে সৌরেন বললে, "হ'ল বইকি, নিশ্চয় হ'ল। নাও, আর একটা ধর।"

'আলিবাবা' নাটকের 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা' গানটা ধরলাম। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে অঙ্গভঙ্গীসহকারে সৌরেনও আরম্ভ করলে। যুগ্মকণ্ঠের সেই মিলিত সঙ্গীতে কথার মিল ছিল, কিন্তু সুরের মিল ছিল না; অর্থাৎ কতকটা যেন মুখের মিল ছিল, মনের ছিল না।

ঠিক একই পদ্ধতিতে আরও গোটা দুই গান শেষ ক'রে সৌরেন বললে, "চললাম উপেন।"

বললাম, "চললে তো, কিন্তু কিছু সংগ্রহ হ'ল? কিছু নিয়ে চললে কি এখান থেকে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সৌরেন বললে, "নিয়ে চললাম বইকি। বেশ খানিকটা নিয়ে চললাম।"

"গানগুলো আয়ত্ত হয়েছে?"

"কাজ-চালানোর মত।"

"একটু চালাও তো দেখি কাজ।"

"কোন্‌টা শুনবে?"

"ধর, 'বাজে কাজে'-টা।"

দু হাতে নিঃশব্দ তুড়ি দিতে দিতে, জায়গায় জায়গায় কথার ওপর বিশেষ একরকম ঝোঁক দিয়ে দিয়ে, সময়ে সময়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, সৌরেন গানটা শেষ করলে। 'আলিবাবা'র গানগুলো সৌরেনের পূর্ব

হ'তে কণ্ঠস্থ ছিল, সুতরাং কথায় বাধল না। সুরেও অবশ্য বাধল না, কারণ যে সুর সৌরেন গানের উপর প্রয়োগ করলে তা সম্পূর্ণরূপে রাগ-রাগিণীনিরপেক্ষ,—সঙ্গীতবিদ্যার সপ্তসুরের মধ্যে কোনো সুরেরই বালাই তার মধ্যে খুঁজে পাবার উপায় নেই।

বললাম, "আমাকে বিশ্বাস কর সৌরেন, এক বিন্দুও নতুন-কিছু তুমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছ না। নিয়ে যাচ্ছ ব'লে যা মনে করছ, আসবার সময়ে তার ষোল আনাই সঙ্গে এনেছিলে।"

অপ্রত্যয়ের মৃদু হাসি হেসে সৌরেন বললে, "পাগল হয়েছ। এতখানি সময় তা হ'লে বৃথাই কাটালাম না কি?" তারপর তার পূর্বতন যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে বললে, "তুমি ভুল করছ উপেন, আসর সরগরম করা আমার উদ্দেশ্য নয়,—আমার উদ্দেশ্য গানের বিষয়ে ঠিক ততটুকু ধারণা আদায় করা, গান রচনা করবার বিষয়ে যতটুকুর একান্ত প্রয়োজন।

"আদায় করেছ?'

'অবশ্য করেছি।'

"কার কাছ থেকে?"

'তোমার কাছ ছাড়া আবার কার কাছ থেকে?"

কোনো ধর্মগ্রন্থে পাঠ করেছিলাম, বিধাতা পুরুষ যে দান করেন তা শুধু অনভিপ্রেতই নয়, অনুপলব্ধও। আমার মত অধম পুরুষও যে অনুপলব্ধ দান করতে পারে, তা অবগত হ'য়ে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলাম। বুঝলাম, এই জন্যই সাধু ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন, ভগবান সর্বজীবে বিরাজমান।

বললাম, "এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কেন, আর একটু পরেই তো উননে আঁচ দেবে, চা টা খেয়ে যেয়ো।"

ব্যস্ত হ'য়ে সৌরেন বললে, "ক্ষেপেছ! এখনি গিয়ে গোটা দুই গান তৈরি ক'রে ফেলতে হবে।"

বললাম, "টাটকা-টাটকা?"

স্মিতমুখে সৌরেন বললে, "হ্যাঁ, টাটকা-টাটকা।"

ঝড়ের মতো সৌরেন এসেছিল, ঝড়ের মতো চ'লে গেল। সৌরেনের সঙ্গে সেদিনকার কথা মনে পড়লে আমার মনে একটা আনন্দের উদয় হয়। অবশ্য আনন্দটা একেবারে খাঁটি আনন্দ নয়—সপুলক আনন্দ। সেদিন সৌরেনের মনে যে খুশি উদ্রিক্ত হয়েছিল, তা 'অকারণ' খুশি ব'লেই সকৌতুক আনন্দ। সত্যি সত্যিই কিছু দিয়ে মানুষকে খুশি করা কঠিন ব্যাপার, কিছু না দিয়ে খুশি করা প্রবল সৌভাগ্যযোগ না থাকলে ঘটে না।

একটা কথা বলা দরকার। পরবর্তী কালে সৌরেন গান রচনার বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে শেখা বিদ্যা যে তাকে সে বিষয়ে কোনও সাহায্য করে নি, প্রয়োজন হ'লে সে বিষয়ে হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি।

সঙ্গীত সম্পর্কে সৌরেনের কথা থেকে ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে প'ড়ে গেল। সৌরেন সুর-সপ্তকের সাতটি সুরকেই অস্বীকার করেছিল,—প্রভাচরণ কিন্তু সপ্তকের প্রথম চারটি সুরকে স্বীকার ক'রে বাকি তিনটিকে অস্বীকার করেছিলেন। কথাটা খুলে বললে এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার বোঝা যাবে।

প্রভাচরণের ওকালতিতে পসার যখন বেশ খানিকটা জ'মে উঠেছে হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হ'ল, গান শিখতে হবে। একান্তই শিখবেন যখন, যথাসম্ভব ভাল ক'রে শেখাই উচিত। সুতরাং ভাগলপুরের শ্রেষ্ঠ

ওস্তাদ দেবী সিংকে নিযুক্ত করলেন। দেবী সিং সুদূর পশ্চিমের বড়-ঘরানার গায়ক, সঙ্গীত-সরোবরের রুই-কাৎলার ব্যাপারী। তিনি গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই প্রভাচরণকে নিযুক্ত করলেন সার্গাম সাধনার কার্যে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টাকাল প্রভাচরণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত সঙ্গীত-সাধনায় বসেন, নিরলসকণ্ঠে নিরন্তর অভ্যাস করেন—সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। পাশের ঘরে অপেক্ষারত মক্কেলগণ ওকীলসাহেবের সঙ্গীত-অনুশীলনের সমাপ্তির প্রত্যাশায় অধীর হ'য়ে ওঠে। তদানীন্তন ভাগলপুরের সর্বপ্রধান ফৌজদারী উকিল উপেন্দ্রনাথ বাগচী ভারতবিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক। মক্কেলরা মনে করে, দুদিকের পাল্লা সমান করবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানী উকিল প্রভাচরণ বোধ হয় সঙ্গীতশিক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। এই সদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মনের মধ্যেও তারা কোনো প্রতিবাদকে প্রশ্রয় দিতে সাহস করে না।

পঞ্চাশ টাকা মাসিক দক্ষিণায় দেবী সিং সপ্তাহে তিন দিন শিক্ষা দিতে আসেন। গভীর অভিনিবেশসহকারে প্রভাচরণ গুরুর সম্মুখে ব'সে সার্গম সাধনা করেন—সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা।

দেবী সিং আপত্তি ক'রে বলেন, "শোন প্রভাচরণ, সার্গমের সুরগুলি কি তোমার মকদ্দমার সাক্ষী যে, সব সাক্ষী এক আওয়াজ করলেই খুশি হওয়া চলবে?"

উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রভাচরণ প্রশ্ন করেন, "কেন ওস্তাদজী?"

দেবী সিং বলেন, "কেন তাও বলতে হবে তোমাকে? সপ্তকের প্রথম চারটি পর্দা তুমি ঠিক ঠিক সুরেই উচ্চারিত করছ; কিন্তু তারপর

পা ধা নি সা এবং সা নি ধা পা-র মধ্যে কোনো ভেদ করছ না, ওঠা-নামা দেখাচ্ছ না, সবই মধ্যমের সুরে বলছে,—এ কি তোমার রীতি! এক না-চলো, চলো না, কিন্তু এ রকম 'বেপরোয়া'র সঙ্গে ভুল পথে চললে কোন্ ফায়দা নির্গত হবে শুনি? নাও, ঠিক আমার মতো ক'রে বল, সা রে গা মা পা।"

গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সুস্পষ্ট সমুচ্চকণ্ঠে প্রভাচরণ গুরুর কণ্ঠ অনুসরণ করেন, সা রে গা-মা পর্যন্ত চারটি সুর ঠিক সুরে সুরেই উচ্চারিত করেন, তারপর সতর্ক সমাহিত হ'য়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন, পা আ আ-আ,—সুরে কিন্তু তা হয় মা আ আ আ। হতাশার বিরক্তিতে দেবী সিং বিহ্বল হ'য়ে ওঠেন।

এক দিন নয়, দু দিন নয়,—এক মাস নয়, দু মাস নয়—সুদীর্ঘ ছ মাস ধস্তাধস্তি ক'রেও দেবী সিং প্রভাচরণকে মধ্যম থেকে পঞ্চমে তুলতে সমর্থ হলেন না। অগত্যা একদিন তিনি বললেন, "প্রভাচরণ, আর আমি তোমাকে গান শেখাতে আসব না।"

হাত জোড় ক'রে প্রভাচরণ বললেন, "কাহে ওস্তাদজী? কিয়া কসুর হুয়া?" (কেন ওস্তাদজী? কি অপরাধ হয়েছে?

দেবী সিং উত্তর দিলেন, "কসুর পুরা হুয়া। ছও মহিনা ধস্তাধস্তি করনেসে ভি তুম মধ্যমসে পঞ্চম উঠ্ নহি শকা,—তুম পথল হ্যায়।" (অপরাধ পুরো হয়েছে। ছ মাস ধস্তাধস্তিতেও তুমি মধ্যম থেকে পঞ্চমে উঠতে পারলে না, তুমি এক পাথর।)

ভাগলপুরে ওকালতি করতে গিয়ে 'তুম পথল হ্যায়' গল্প আমি একাধিক লোকের মুখে শুনেছিলাম। অথচ প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার পর একান্তে ও গোপনে তাঁর মুখে রামপ্রসাদী ও অন্যান্য প্রাচীন সুরের সেকেলে গানও কিছু শুনেছিলাম। প্রভাচরণ

সুকণ্ঠ ছিলেন, সে কথা বলছি নে, কিন্তু পা-ধা-নি নামে যে তিনটি লাজুক সুর তাঁর সুরসপ্তক সাধনাকালে বড় সাধাসাধিতেও আত্মপ্রকাশ করে নি, তাদের কিন্তু প্রভাচরণের গান গাওয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম। নিরাবরণ একাকিত্বের নগ্নতায় উপস্থিত হ'তে যারা কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি, গানের শব্দসম্ভারের আবরণের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার তারা হয়তো পথ খুঁজে পেয়েছিল।

১৯১৩ সালের ২রা জানুয়ারি আমি যখন ওকালতি ব্যবসায়ের কঠোর প্রাঙ্গণে প্রথম পদার্পণ করলাম, তখন প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পসার খুব জমজমাট। প্রত্যেক বড় মকদ্দমায় এক পক্ষে অথবা অপর পক্ষে তিনি থাকেনই। বিশেষত কোনো মকদ্দমায় হিন্দু আইনের প্রশ্ন যদি জড়িত থাকে, তা হ'লে তো তাঁকে নিযুক্ত করবার জন্ম বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে হুটোপাটি প'ড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দু আইনে এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

বাঙালী সমাজে 'প্রভাচরণ পণ্ডিত মশায়' অথবা শুধু 'পণ্ডিতমশায়' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। বেহারী জনসাধারণ, এমন কি বেহারী হিন্দু ও মুসলমান হাকিমগণ, তাঁকে 'পণ্ডিতজী' ব'লে সম্বোধন করতেন। বোধ করি ওকালতিতে প্রবেশ করবার পূর্বে তিনি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা করতেন ব'লে এই আখ্যা লাভ করেছিলেন।

কয়েকটি দুর্লভ গুণের জন্ম প্রভাচরণ পণ্ডিত মশায়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ জনসমাজে কৃপণ ব'লে তাঁর নিন্দা ছিল। যারা শুধু তাঁর বাইরের দিকটার খবর রাখত, তারা তাঁকে কৃপণ ব'লেই মনে করত. কিন্তু বাইরের সীমান্তরেখা অতিক্রম ক'রে অন্দর-মহলে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র যারা পেত, তারা তাঁর বদান্যতার অপূর্ব ভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হ'ত। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

পণ্ডিত মশায় আটহাতি অদীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করতেন। লম্বা-চওড়া মানুষ, পরিপুষ্ট দেহ, আটহাতি বস্ত্রে বেমানান হ'ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই; লোকে বলত, প্রভাচরণ হাড় কেপপন।

কিছুকাল ভাগলপুরে ওকালতি করবার পর পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে একটা গভীর অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠলে এই আটহাতি বস্ত্র ব্যবহারের মর্মকথা অবগত হ'য়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আপাতকৃপণ প্রভাচরণের পরিধেয় বস্ত্রের অপ্রশস্ততার মধ্যে যে উদার বদান্যতা আত্মগোপন ক'রে ছিল, তার কোনো পরিচয় অথবা আন্দাজ পূর্বে পাই নি।

কথায় কথায় একদিন পণ্ডিতমশায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "পণ্ডিত-মশায়, ক'হাতি ধুতি আপনি ব্যবহার করেন?"

স্মিতমুখে পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন, "আটহাতি ভাই।"

"আর হাত-দুই বাড়ালে ভাল হয় না?"

"হয়; কিন্তু এক দিকে অসুবিধেও হয় একটু।"

"কি অসুবিধে বলুন তো?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে মৃদু হেসে পণ্ডিতমশায় বললেন, "তিনখানা ধুতি হ'লে ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়ার অসুবিধে হয়।"

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে?"

পণ্ডিতমশায় বললেন, "তার মানে, আমার যখন কাপড়ের দরকার হয়, তখন বিশ-গজি একটা থান কিনি। তাতে চারখানা দশহাতি কাপড় অবশ্য হয়, কিন্তু—" মুহূর্তের জন্য পণ্ডিতমশায় থেমে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু কি?"

হাসতে হাসতে পণ্ডিতমশায় বললেন, "সব কথাই তুমি জেনে নিতে চাও না-কি?"

কথায় কথায় সব কথাই শেষ পর্যন্ত জেনে নিলাম। বিশ-গজি থান

কিনে পণ্ডিতমশায় পাঁচটি সমান দৈর্ঘ্যের খণ্ড ক'রে চার খণ্ড রাখেন নিজের ব্যবহারের জন্য, পঞ্চম খণ্ড দান করেন কোনো বস্ত্রাভাবপীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিকে।

পাঁচ খণ্ডের পরিবর্তে চার খণ্ড করলে এক এক খণ্ড অবশ্য দশহাতি ক'রে হয়, কিন্তু চার খণ্ড থেকে এক খণ্ড দরিদ্রকে দিলে বাকি তিন খণ্ডে প্রতি ধোপে দুখানা কাপড় ধোপার বাড়ি দেওয়া চলে না।

পণ্ডিতমশায় বললেন, "দেখ উপেন, অন্ন বস্ত্রের অভাবের চেয়ে বড় অভাব মানুষের আর কিছু নেই। এ দুটি জিনিসের অভাবে মানুষকে যতটা অমানুষ করে, এমন আর কিছুতেই করে না। সেইজন্যে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা থেকে কিছুটা অংশ অভাবগ্রস্তের জন্যে ত্যাগ করা। নইলে আত্মার অকল্যাণ হয়। খেতে বসবার আগে বাড়া ভাত থেকে দু'মুঠো অন্ন ক্ষুধার্তকে দিতে পারলেই ভাল হয়; অভাবে, পশুপক্ষীর সামনে খানিকটা ছড়িয়ে দেওয়াও ভাল। বস্ত্রের কথা যদি বল, আমি অবশ্য আমার উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে মাঝে মাঝে এক-আধখানা বস্ত্র অভাবগ্রস্তকে দিতে পারি। কিন্তু প্রথমত উদ্বৃত্ত অর্থ আমার এমন-কিছু বেশি নেই; দ্বিতীয়ত উদ্বৃত্ত অর্থের উপর একা আমার অধিকার নেই, সংসারের সকলেরই অধিকার। কিন্তু আমি যদি আমার নিজের বিশ-গজি থান থেকে চার গজ গরিবকে দান করি, তা হ'লে কেউই আপত্তি করতে পারে না। একমাত্র আপত্তি করতে পারে যাকে দিই সেই গরিব লোক, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যেও কেউ আপত্তি করে নি।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

আমি উত্তর দিলাম, "আজ থেকে আমিও আপত্তি করব না।" মনে মনে পণ্ডিতমশায়কে একটা প্রণাম করলাম।

চাঁদার খাতায় পণ্ডিতমশায়ের অঙ্ক পড়ত অত্যন্ত সামান্য পরিমাণের।

ওঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিরা যেখানে পঁচিশ টাকা সই করতেন, উনি করতেন পাঁচ টাকা। লোকে বলত, কৃপণ প্রভাচরণ।

যারা বলত, তারা মাসান্তে হয়তো একটা মনিঅর্ডারও বাংলা দেশে পাঠাত না, পণ্ডিতমশায় কিন্তু প্রতি মাসে নিয়মিত পাঠাতেন এক গোছা, কোনোটা পাঁচ, কোনোটা দশ, কোনোটা বিশ, কোনোটা পঁচিশ। প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ সপ্তাহে মনিঅর্ডারগুলি লিখে নিয়ে এসে বার লাইব্রেরির চাকরের হাতে টাকা হিসেব ক'রে দিয়ে মনিঅর্ডার করতে ডাকঘরে পাঠাতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "যাদের আমি ধারি, সেই পাওনাদারদের কিস্তি পাঠালাম।

আমরা কিন্তু জানতাম পণ্ডিতমশায়ের পাওনাদার ছিল বাংলা দেশের কয়েকটি উপায়হীনা বিধবা, উপার্জনহীন বৃদ্ধ, দরিদ্র ছাত্র এবং অভাব-অনটনক্লিষ্ট পীড়িত পরিবার।

পণ্ডিতমশায় আমাকে বলতেন, "উপেন, বড়লোকদের জন্যে চাঁদার খাতা আছে। কিন্তু দরিদ্রদের জন্যে আমরা দরিদ্ররা যদি না থাকি, তা হ'লে তাদের উপায় কি হয় বল দেখি?"

পণ্ডিতমশায় ছিলেন বালকের মতো সরল এবং সাধুর মতো অনাড়ম্বর। পারিপাট্য ব'লে কোনো বস্তু আছে, তা তার সাজ-সজ্জা পোশাক-পরিচ্ছদ উদাত্তস্বরে অস্বীকার করত। পাতলুন নামে তিনি যে জিনিস পরিধান করতেন, একমাত্র আব্রু ছাড়া তার দ্বারা আর কিছুই রক্ষিত হ'ত না, সৌষ্ঠব তো নয়ই, সঙ্গতিও বোধ করি নয়। তার নিম্নপ্রান্ত গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবার ইঞ্চি দুয়েক পূর্বেই গতিরোধ করত। পাতলুন এবং জুতার মধ্যবর্তী পদাংশ মোজাকে শীতকালেও পণ্ডিতমশায় অনাবশ্যক বিলাস বস্তু মনে ক'রে পরিহার ক'রে চলতেন। এবং যে জুতা তিনি ব্যবহার করতেন, ৩ চার মাসের মধ্যে তা এমন

একটা ধূসর-ধূমল রঙ ধারণ করত যে, বাজার থেকে প্রথম আগমনের দিন তা কৃষ্ণবর্ণের ছিল বললে সহজেই বিশ্বাস করা যেতে পারত, এবং বাদামী রঙের ছিল বললেও অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যেত না।

অকস্মাৎ একদিন পণ্ডিতমশায় তাঁর সেই 'সবরঙিন' জুতার পরিবর্তে এক জোড়া যৎপরোনাস্তি শৌখিন এবং মূল্যবান আনকোরা নূতন কার্পেটের জুতা পায়ে দিয়ে আদালতে আবির্ভূত হ'য়ে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। দু-পাটি জুতার মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ দুটি বৃহৎ আকারের লাল গোলাপফুল সকৌতুক আনন্দে পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে এজলাস থেকে এজলাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আধ-ময়লা পাতলুনের নিম্নপ্রান্ত দুটি ইঞ্চি দুয়েক উপরে ঈর্ষামলিন মুখে ঝুলে রইল।

এতবড় সঙ্গতিসামঞ্জস্যহীন ব্যাপার উপেক্ষিত হবার নয়,—দেখতে দেখতে কথাটা আদালতময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, এমন কি, দু-চারজন হাকিমের কানে উঠতেও ছাড়ল না। পণ্ডিতমশায় এজলাসে উপস্থিত হ'লে কৌতুকহাস্যে উকিল-ব্যারিস্টারদের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, হাসি লুকোবার জন্যে পেশকার নথি দিয়ে মুখ ঢাকা দেন, হাস্যাবরুদ্ধ মুখে হাকিম ঈষৎ ঝুঁকে প'ড়ে সেই পরম কৌতুকের বস্তু কার্পেটের জুতা জোড়া দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

চতুর্দিকে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ,—মধ্যস্থলে পণ্ডিতমশায় কিন্তু নির্বিকার। জুতা, জুতা হ'লেই হ'ল। সকলপ্রকার জুতার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি;—তা সে নিজের ধূসর-ধূমল জুতাই হোক, অথবা সদ্যবিবাহিত পুত্রের দান-সামগ্রীর মধ্যে প্রাপ্ত কার্পেটের জুতাই হোক। কাছারি আসবার সময়ে সামনে পড়েছে, পা গলিয়ে দিয়ে প'রে এসেছেন,—গোলাপফুল

ছুটির আরক্ত শোভার দ্বারা লুব্ধ হ'য়েই যদি হয়, তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। জুতা পায়ে দিয়েই তিনি খালাস; তারপর সে জুতা তাঁর মুখের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে অথবা পোশাক পরিচ্ছদের সঙ্গে সুসমঞ্জস হ'ল কি-না, সে মাথাব্যথা অপরের।

এই দুর্লভ ছাঁচের মানুষ ছিলেন প্রভাচরণ পণ্ডিত মহাশয়। আট-হাত ধুতি ও দশহাত ধুতি, এবং 'সবরঙিন' ধূসর ধূমল অর্ধছিন্ন নিজের জুতা ও পুত্রের গোলাপফুল-খচিত নূতন মূল্যবান কার্পেটের জুতা,—এ সকলের প্রতি সমদৃষ্টির জন্য তিনি গীতার সূক্তি অনুযায়ী ভগবানের প্রিয় হ'তে পেরেছিলেন কি-না জা'ন নে . কিন্তু আমাদের হয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি কয়েক লক্ষ টাকার ধন-সম্পত্তি রেখে যান। এই বিপুল সম্পদের সমস্তটাই তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ের সূত্রপাতে ভাগ্যদেবতার যে বিকট ভ্রূকুটি তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল, তার ইতিহাস কৌতুকপ্রদ।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পণ্ডিতমশায় ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করলেন। একটি সামান্য ক্ষুদ্র বাড়িতে বাস করেন, অকিঞ্চিৎকর আসবাবপত্র, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আইনের বই নেই বললেই চলে। এই সামান্য উপকরণ নিয়ে দোকান সাজিয়ে পণ্ডিতমশায় আকুল প্রতীক্ষায় ব'সে থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠুর মক্কেল দেখা দেয় না।

সকলের আগে আদালতে যান, সকলের পরে ফেরেন—টাকা নিয়ে কিন্তু নয়, ব্যর্থতার ক্লান্তি নিয়ে। সামান্য বেতনে একজন ঠিকা চাকর আছে, সে দু-বেলা মোটামুটি দু-চারটে কাজ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়, নিজহস্তে পণ্ডিতমশায় রন্ধন করেন।

দিনে দিনে দিন যায়, মাসে মাসে মাস। দুঃখ-দৈন্য-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে বৎসরও আবর্তিত হ'য়ে গেল। সঞ্চিত অর্থ সামান্য যা ছিল

দেশের খরচ জোগাতে ও ভাগলপুরের খরচ মেটাতে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে দশ পনেরো টাকাও বোধ হয় প'ড়ে নেই।

সন্ধ্যাকাল। উঠানে একটা খালি তক্তাপোশের উপর চিৎ হ'য়ে শয়ন ক'রে পণ্ডিতমশায় অকূলপাথার ভাবছেন। এক আকাশ নক্ষত্র তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঝিক্‌মিক্ করছে। কি তাদের ভাষা কে জানে! একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মুক্তিলাভ ক'রে বোধ করি সেই নক্ষত্ররাশির দিকেই উধাও হ'ল।

কি করা যায়! কি করা যায় তা হ'লে?...তবে কি শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে গিয়ে যজন-যাজন-অধ্যয়ন অধ্যাপনের সামান্য জীবনেই প্রবেশ করতে হবে? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ-আয়োজন, এতদিনকার বহুকষ্টার্জিত বহুযত্নাধীত বিদ্যা—সকলই কি ভস্ম হ'য়ে প'ড়ে থাকবে এই ভাগলপুরের আদালতের ঊষর প্রান্তরে?...ভাগ্যদেবতার তাই যখন ইচ্ছা, তখন তাই হোক। পণ্ডিতমশায় মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, সামান্য যা কিছু আসবাব-পত্র আছে বেচে-কিনে দু-চারদিনের মধ্যেই ভাগলপুর পরিত্যাগ ক'রে যাবেন। শেষকালে পাথেয়ের জন্যে কার কাছে হাত পাতবেন? মানে মানে স'রে পড়াই ভাল।

ঠিক এমন সময়ে সদর-দরজায় ভাগ্যদেবতা কড়া নাড়লেন,—এতদিন বিমুখ বিরূপ হ'য়ে যিনি অবস্থান করছিলেন সেই ভাগ্যদেবতা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক শোনা গেল, "পণ্ডিতমশায় বাড়ি আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি। আসতাজ্ঞে হোক।" ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে পণ্ডিতমশায় সদর-দরজার দিকে ছুটলেন। প্রথম সবজজের কণ্ঠস্বর।

সাবজজকে নিয়ে এসে পণ্ডিতমশায় কোথায় বসাবেন ভেবে পান না।

উঠানে তক্তাপোশ দেখতে পেয়ে সাবজজ বললেন, "এইখানেই ফাঁকায় বসা যাক পণ্ডিতমশায়।"

দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর সাবজজ আসল কথা পাড়লেন; বললেন, "একটা কথা ছিল পণ্ডিতমশায়, কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে বলি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পণ্ডিতমশায় বললেন, "আজ্ঞে, নিশ্চয়ই বলুন।" সাবজজ বললেন, 'আমার ছেলেটি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে। সংস্কৃতে সে কাঁচা। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে তাকে একটু সাহায্য করেন, আমি আপনাকে মাসিক চল্লিশ টাকা ক'রে দেবো।"

নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারের মধ্যে পণ্ডিতমশায় আশার আলোক দেখতে পেলেন। তা হ'লে আরও কিছুকাল দুস্তর সাগরে সাঁতার দেওয়া চলবে। পণ্ডিতমশায় সম্মত হলেন এবং পরদিন থেকেই অধ্যাপন আরম্ভ ক'রে দিলেন।

মাসিক চল্লিশ টাকা আয়ের জন্য ভাগ্যদেবতাও নিজহাতে কড়া নাড়েন না। সৌভাগ্যের প্রকৃত উদয় হ'ল প্রথম সাবজজের গৃহে নয়, এজলাসে। রাষ্ট্র হয়ে গেল প্রভাচরণ উকিল 'আউয়াল' (প্রথম) সাবজজের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। একে একে মক্কেল এসে জুটতে লাগল। ছোটখাট ব্যাপারে যেখানে অবিচার না ক'রেও আনুকূল্য দেখানো যায়, সেখানে প্রথম সাবজজ পণ্ডিতমশায়কে ষোল আনা আনুকূল্য দেখাতে লাগলেন। সুযোগের অভাবে যে উপযুক্ততা এতদিন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে অবস্থান করছিল, এখন তা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। অগ্নি যেমন ক্রমশ এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে, পণ্ডিতমশায়ের পসারও তেমনি এক এজলাস থেকে অপর এজলাসে বিস্তৃতি লাভ ক'রে চলল। সফলতার রাজপথে সৌভাগ্যের রথ গতি লাভ করলে।

১০

১৯১৩ সালের ২রা জানুয়ারি আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। চকিত-উৎসুক হৃদয়ে, কতকটা বিষণ্ণ-গম্ভীর মনে, পাঠদ্দশাকে শেষ বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে সেদিন তথাকথিত কর্মজীবনের, অর্থাৎ ভাগলপুরের আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ের, সূত্রপাত করেছিলাম।

যাঁরা আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব,—আমার জীবনের গতিকে লক্ষ্য করবার যাদের সুযোগ-সুবিধা কিছু ছিল তাঁদের মতে শনির দশায় অতিবাহিত হয়েছিল আমার পাঠদ্দশা। জ্যোতিষ গগনের শনি না হ'লেও ভাগ্য গগনের কোনো এক শনি যে, সে সময়ে আমার প্রতি শুধু খর নয়, প্রখর দৃষ্টি বর্ষণ ক'রে চলেছিল, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, সে শনি আমার অনিষ্ট-সাধনই শুধু করে নি, অনিষ্ট-সাধনের আশে-পাশে উপকার-সাধনও কিছু কিছু করেছিল। আমার জীবনের তটভূমি হ'তে সে হয়তো শীতল সরস জলধারাকে বহু দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছিল বিস্তৃত বালুকা প্রান্তর, যেখানে আম কাঁঠালের ফসলের কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও তরমুজ-খরমুজের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল। এই রূপকের তরমুজ খরমুজ আমার বাস্তব জীবনের কোন্ পদার্থ, তা নির্ণয় করবার জন্য গবেষণাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে স্মৃতিকথা তত্ত্বকথায় পরিণত হবে। সুতরাং আপাততঃ সে কথা স্থগিত রেখে স্থূল ঘটনাত্মক প্রসঙ্গের কথাই বলি।

গান ধরবার পূর্বে গায়কেরা যেমন ক্ষণকাল তানানানা ক'রে সুর ভাঁজে, আইন পাস করার পর আমিও কিছুদিন সেই রকম তানানানা

অর্থাৎ 'এনা-ওনা-তানা' ক'রে কাটালাম। কলিকাতায় ওকালতি করব অথবা ভাগলপুরে—সেই প্রশ্ন নিয়ে তানানানা। কলিকাতায় দাদা হাইকোর্টে ওকালতি করেন; তা ছাড়া, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও দু-চারজন উকিল-অ্যাটর্নির অভাব নেই; সুতরাং কলিকাতায় ওকালতি করবার সপক্ষে খানিকটা যুক্তি ছিল। পক্ষান্তরে, ভাগলপুরে আমার সেজদাদা নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ওকালতি ব্যবসায়ে বিস্তৃত পসার, সেখানে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করেছেন; সুতরাং ভাগলপুর যাওয়াও অযৌক্তিক নয়। মনের যখন এই রকম দ্বিধাভিন্ন অবস্থা, তখন একটা গুরুতর গোছের পারিবারিক কারণ ভাগলপুরের দিকের পাল্লায় বেশ খানিকটা ভার চাপিয়ে দিলে। কাজে কাজেই, ট্রাঙ্ক-বাক্স সাজিয়ে বিছানাপত্র বেঁধে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে একখানা ভাগলপুরের মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কেটে ট্রেনে সওয়ার হলাম।

গাড়ি ছাড়তে তখনো বিলম্ব ছিল; একজন সহযাত্রীকে আমার জিনিসপত্রের উপর একটু দৃষ্টি রাখবার জন্য অনুরোধ ক'রে একটা টাইম-টেবল্ খরিদ করবার উদ্দেশ্যে হুইলারের বুক্‌স্টলে উপস্থিত হলাম। টাইম-টেবল্ কিনে প্ল্যাট্‌ফর্মে ফিরে এসে আমার কামরায় উঠতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "মশায়, আপনার হাতে ওটা কি নতুন টাইম-টেবল্?"

বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন।"

ভদ্রলোকের হাতে টাইম-টেবল্ দিলাম। একটা বিশেষ কোনো

পাতা খুলে নিবিষ্ট মনে বোধ করি সময়ের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দীর্ঘাকার নাতিকৃশ দেহ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পরিধানে ধুতি, অঙ্গে কালো রঙের চপকান, মাথায় টুপি। হাওড়া স্টেশনের পরিবর্তে কোনও ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখলে স্টেশন-মাস্টার ব'লে ভুল করলে দোষ দেওয়া চলে না।

দেখা শেষ হ'লে আমার হাতে টাইম-টেবল্ প্রত্যর্পণ করবার সময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ভদ্রলোক সহসা শিউরে উঠলেন, "ইস্! কি দেখলাম!"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দেখলেন?"

আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ রেখে ভদ্রলোক বললেন, "জ্যোতি।"

"জ্যোতি? কিসের জ্যোতি?"

"সৌভাগ্যের।"

"কোথায় দেখলেন?"

"আপনার ললাটে।" ভদ্রলোক ব'লে চললেন, "এ রকম সুস্পষ্ট জ্যোতি কদাচিৎ দেখা যায়। এ কিন্তু কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি প্রোফেসার সতীশচন্দ্র মুখার্জি, অ্যাস্ট্রলজার, নিবাস বালি,—আমি ব'লে রাখলাম, অচিরে আপনি বিপুল অর্থের অধিকারী হবেন। ভুলবেন না আমার নাম; মনে রাখবেন।"

ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ সব কথা ভিতর থেকে বিশ্বাস করতে পারি নি, সেদিনও পারি নি; কিন্তু অচিরে বিপুল অর্থের অধিকারী হওয়ার মতো 'ভাল কথার মিছেও ভাল'। তাই বোধ করি মনে মনে অকারণে খুশি হওয়ার একটা আভা মুখের উপরেও এসে উপস্থিত হয়েছিল। আগেকার জ্যোতি দেখে থাকুন আর না-ই দেখে

থাকুন, বর্তমান আভা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন; দক্ষিণ হস্ত আমার দিকে প্রসারিত ক'রে বললেন, "কিছু অর্পণ করুন।"

মনের মধ্যে কে-একজন সজোরে 'ও!' ব'লে অট্টহাস্য ক'রে উঠল। সংযত কণ্ঠে বললাম, "'কিছু' নয়, অর্পণ করব 'প্রচুর'। কিন্তু আজ একটি পয়সাও নয়। যেদিন বিপুল অর্থের অধিকারী হব, সেদিন আমার প্রথম কর্তব্য হবে বালিতে এসে আতিপাতি ক'রে আপনাকে খুঁজে বার ক'রে প্রচুর অর্থ অর্পণ করা। আজ নমস্কার।" গাড়ির পাদানিতে এক পা দিয়ে ফিরে তাকিয়ে স্মিতমুখে বললাম, "চিন্তা করবেন না,— নিশ্চয় মনে থাকবে, প্রোফেসর সতীশচন্দ্র মুখার্জি, অ্যাস্ট্রলজার, নিবাস বালি।"

কামরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ভদ্রলোকও বোধ হয় নিষ্ফলা ভূমির মতো আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আর কারো ললাটে জ্যোতি দেখবার চেষ্টায় হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে গেলেন।

লোকজনের ভিড়ে, কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার গোলমালে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলাম। ব্যাণ্ডেল জংশন অতিক্রম করার পর ডেলি প্যাসেঞ্জার ও লোক্যাল প্যাসেঞ্জারের ভিড় ক'মে গেলে পাশের দিকের একটা বেঞ্চে শয্যা পেতে ফেলে পা ছড়িয়ে জুৎ ক'রে বসলাম। চিন্তার পথ নিরর্গল হ'তেই মনে পড়ল সতীশ অ্যাস্ট্রলজারের কথা। একটা অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং সংস্কার, যার সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে আসছি, ধীরে ধীরে আমার মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করলে। কে জানে সতীশ অ্যাস্ট্রলজার অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পুরুষ কি-না। সাধারণ লোকের কাছে মানুষের অদৃষ্টের যে ভাষা অনধিগম্য, কে বলতে পারে, সতীশ অ্যাস্ট্রলজার সে ভাষার লিপি-উদ্ধার করতে সমর্থ হয় নি? সে অবস্থায় একটা বিপুল অর্থ আমার ভাগ্যে

যদি আসন্নই হ'য়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কি এমন থাকতে পারে?

কিন্তু, একটা কথা। সৌভাগ্য যদি একান্তই আসে, তা হ'লে আসবেই বা কোন্ পথে? আগে তো পথ, তারপর আসা। যে পথে অর্থ উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে ভাগলপুরে চলেছি, সে পথ তো অন্তত বছর দশেকের মতো অনর্থেরই পথ হ'য়ে থাকবে। অচিরকালের মধ্যে সে পথে বিপুল অর্থ অর্জন করতে হ'লে রাত্রে মক্কেলের ঘরে সিঁদ না কেটে শুধু তার মামলা-মকদ্দমার নথি ঘাঁটলে চলবে না।

সে যাই হোক, একটা কথা আছে—খোদা যব দেতে হৈঁ ছপ্পর ফোঁড়কে দেতে হৈঁ। অতএব হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। অদৃষ্টের ভাগ্যপাঠে সতীশ জ্যোতির্বীর যদি ভুল না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে খোদা ছাপ্পর বিদীর্ণ ক'রেই দেবেন; সৌভাগ্য নিজের পথ নিজে তৈরি ক'রে এসে হাজির হবে। ভাগলপুরে আমার জন্মস্থান, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সেখানে অভাব নেই, বাল্য এবং যৌবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি ভাগলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তবু কলকাতা থেকে নিজেকে উৎপাটিত ক'রে নিয়ে যেতে সারা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে বিরাজ করছিল স্তিমিত বেদনার একটা স্থূল অনুভূতি। তারই মধ্যে কোথায় যেন এক জায়গায় টের পাচ্ছিলাম একটা তীক্ষ্ণতর টনটনানি। বুঝতে পারলাম, সেইটেই বেদনার কেন্দ্রস্থল। টিপে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করতে বিলম্ব হ'ল না, সে কেন্দ্রস্থল 'যমুনা' মাসিক পত্রিকাকে ছেড়ে আসার দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ছেড়ে আসার দুঃখ অবশ্য সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে আসার দুঃখ নয়; তার দুঃখ থেকে, অসুবিধা থেকে, তার সমস্যা থেকে, সঙ্কট থেকে দূরবর্তী হওয়ার দুঃখ।

'যমুনা' আমার নিজের কাগজ নয়, বন্ধুর কাগজ; তার লাভ-

লোকসান ভাল-মন্দর সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো স্বার্থের যোগ ছিল না। কিন্তু তার অতিশয় দুঃখের দিনে পরিপূর্ণভাবে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলাম ব'লে আপনার না-হ'য়েও সে আমার অতি আপনার হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষত সম্প্রতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'যমুনা'র শুভাশুভের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম ব'লে 'যমুনা'র প্রতি আমার ঔৎসুক্য এবং দায়িত্ব প্রবলভাবে বেড়ে উঠেছিল। তাই বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে 'যমুনা'-সম্পাদক বন্ধুবর ফণীন্দ্রনাথ পাল যখন নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত বলেছিলেন, "'যমুনা'র এতটা বাড়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন উপেনবাবু, দেখবেন শেষ পর্যন্ত ভরা-ডুবি যেন না হয়।" তখন উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, "কোনো ভয় নেই ফণীবাবু, গভর্মেণ্টের ডাক বিভাগের কল্যাণে কলিকাতা হ'তে ভাগলপুরের ২৬৫ মাইলের দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে 'যমুনা'র সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বজায় থাকবে।"

সেদিন কলিকাতা হ'তে ভাগলপুর যাত্রার পথে 'যমুনা'কে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য এবং সাহিত্যসাধনার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ অপর সকল আকর্ষণকে ছাপিয়ে মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, বারো বৎসর পরে আবার একদিন ঠিক সেই আকর্ষণই আমাকে ভাগলপুর থেকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে কলিকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে 'বিচিত্রা'র পরিচর্যায় নিযুক্ত করবে,—সে কথা সেদিন সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল।

জীবনে ঘটনাক্রমে তিনটি সাহিত্য-পত্রিকার সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হবার সুযোগ হয়েছিল। আদ্য 'তরণী'; মধ্য 'যমুনা'; এবং অন্ত্য 'বিচিত্রা'। 'তরণী' ছিল আমাদের ভবানীপুর-সাহিত্য-সমিতির হস্তলিখিত মাসিক-পত্রিকা। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং আমি ছিলাম এ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। সৌরেনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং

যত্নের ফলে তৎকালিক হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যে 'তরণী' শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

এ কথার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তখনকার দিনের সাহিত্যমণি-মাণিক্যের জহুরী 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কাছে। ঘটনাক্রমে একদিন এক বৎসরের বাঁধানো 'তরণী' তাঁর হাতে পড়ে। রচনাগুলির উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ এক সময়ে তিনি অনুযোগের সুরে ব'লে উঠলেন, "করেছ কি তোমরা। যে-সব লেখা অনায়াসে ছাপা কাগজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তাদের নির্বাসন দিয়ে রেখেছ হাতের লেখা কাগজের অন্ধকার গুহায়?" তারপর বলা নেই কওয়া নেই, নির্মম শক্তির প্রয়োগে সেই মজবুত-বাঁধানো 'তরণী'র কলেবর হ'তে দু-চারটি রচনা পড়্‌পড়্‌ ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, "আপাতত এগুলি আমার কাছে রইল; একে একে 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় এগুলিকে তোমরা দেখতে পাবে।"

সেদিন সমাজপতি মহাশয়ের বাক্যে ও আচরণে আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের এক দিক হর্ষে এবং আর-এক দিক বেদনায় আরক্ত হ'য়ে উঠছিল।

'তরণী'র বাঁধানো খাতার উপর এই জুলুম-জবরদস্তি একবার ক'রেই সমাজপতি মহাশয় নিরস্ত হন নি, পরেও এর অনুবর্তন করেছিলেন।

যে সময়ে আমরা ভবানীপুরে 'তরণী' প্রকাশ ক'রে চলেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে ভাগলপুরে প্রকাশিত হচ্ছিল 'ছায়া' নামে আর একটি হস্তলিখিত মাসিক-পত্রিকা। 'ছায়া'র পরিচালক দলের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। বিভূতিভূষণের ভগ্নী প্রসিদ্ধ লেখিকা নিরুপমা দেবীও 'ছায়া'র লেখক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সমালোচনার জন্ত 'তরণী' এবং 'ছায়া'র মধ্যে বিনিময়প্রথা প্রবর্তিত ছিল। আমরা তাকে ভাগলপুরে 'তরণী' পাঠাতাম; 'ছায়া'র পৃষ্ঠায় নির্মমভাবে সমালোচিত হবার পর 'তরণী' ফিরে আসত আমাদের হাতে। পক্ষান্তরে, ভাগলপুর থেকে আমাদের নিকট 'ছায়া' উপস্থিত হ'লে 'তরণী'তে কঠোরভাবে তার সমালোচনা করার পর ফেরত পাঠানো হ'ত ভাগলপুরে। আমাদের উভয় পক্ষের সমালোচনার মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা চক্ষুলজ্জার কোনো দুর্বলতা দেখা যেত না। কাগজের পরিবর্তে 'ছায়া' এবং 'তরণী'র দেহ যদি মাংসের দ্বারা গঠিত হ'ত, তা হ'লে উভয়ে যে নিজ নিজ স্থানে রক্তাক্ত কলেবরে প্রত্যাবর্তন করত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সৌরেন 'তরণী'র শুধু সম্পাদকই ছিল না, মুদ্রাকরও ছিল। 'ছায়া'র মুদ্রাকর ছিল গিরীন্দ্র। বলা বাহুল্য, মুদ্রাযন্ত্র ছিল উভয়ের নিজ নিজ লেখনী।

আজকালকার মতো তখনকার দিনের হস্তলিখিত পত্রিকায় চিত্র এবং অপরাপর অলঙ্করণের চোখ-ঝলসানো আড়ম্বর ছিল না। আমাদের 'তরণী' তো ছিল তপস্বিনীর মতো নিরাভরণা। কিন্তু তপস্বিনীর মতোই তার মধ্যে পাওয়া যেত বিভূতির স্নিগ্ধতা এবং সাধনার নিষ্ঠা।

আমার প্রত্যক্ষ যোগের মধ্যযুগের মাসিক-পত্রিকা 'যমুনা'র বিষয়ে পূর্বে অনেক কথাই বলেছি। পুনরায় সে সকল কথার অবতারণা করতে গেলে অনেক সময়ে পুনরাবৃত্তি অপরাধে অপরাধী হ'তে হবে। প্রয়োজনও তার এমন-কিছু নেই।

'বিচিত্রা'র কথা আমার জীবনের একটা বৃহৎ অধ্যায়ের কথা। আমার জীবনের সঙ্গে 'বিচিত্রা' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'বিচিত্রা'র কল্পনা আমার, সৃষ্টি আমার; 'বিচিত্রা'র মৃত্যুও আমার কোলেই

ঘটেছিল। জনক যেমন তার সন্তানকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসে, 'বিচিত্রা'কে আমি ঠিক সেইভাবেই ভালবেসেছিলাম। কিন্তু যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলাম মৃত্যুর কীট তার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় করেছে, সেদিন বোধ করি স্নেহময় জনকেরই মতো তার মৃত্যুর ত্বরিত গতিই কামনা করেছিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে জনকোলাহলময় ভাগলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবতরণ ক'রে সমস্ত পুরাতন জিনিসকে নূতন আলোকে রঞ্জিত দেখে বিস্মিত এবং পুলকিত হলাম। বিহারী পুরুষমানুষদের মুখে মুখে 'মব্‌কিলের' (মক্কেলের) ছাপ ; কোনো বস্তা দেখলে মনে হয় বুঝি তা মামলা-মকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজের বস্তা ; কেউ টাকা গুনছে দেখলে মনে হয় উকিলের ফিস্‌ গুনছে ; আমার অতীতের 'আমি' মৃদু হেসে বর্তমানের 'আমি'কে একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'তবে আর কি ওকিল-সাহেব, আমি এখন বিদায় হই।' সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল,—বোধ করি প্রস্থানোদ্যত রেলগাড়ির একটা কোনো কামরাতেই লাফ মেরে উঠে।

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে বাইরে স্টেশন-প্রাঙ্গণে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে শ্বশুরপুরের পথে রওনা হলাম।

১১

ভাগলপুরে পৌঁছে ওকালতি ব্যবসায়ের উদ্যোগপর্বে মনোনিবেশ করলাম। সেজদাদার পরামর্শে কয়েকজন বড় বড় উকিল এবং দু-চার জন হাকিমের সঙ্গে দেখাশুনা ক'রে বেড়াতে লাগলাম।

উকিলরা অবশ্য অনেকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন, শুভেচ্ছাও জানালেন; কিন্তু খুশিতে মন ভ'রে গেল দীননাথ দের নিকট হ'তে উচ্ছল অকপট অভ্যর্থনা লাভ ক'রে। দীননাথ তখন ভাগলপুরের প্রথম সবজজ, প্রখরবুদ্ধিশালী ব্যক্তি; সহজ সাবলীল বিচার-নৈপুণ্যের গুণে উকিল-ব্যারিস্টার-মক্কেল সকলের চিত্ত থেকে সমভাবে শ্রদ্ধা নিষ্কাশন করেন।

আমার নাম শুনে দীনবাবুর দুই চক্ষে কৌতূহলের রশ্মি দেখা দিলে। "উপেন্দ্রনাথ্ গঙ্গোপাধ্যায়? সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ না-কি আপনি?"

ভারি বিপদে পড়া গেল; হাঁ-ও বলতে পারি নে, না-ও বলতে পারি নে। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ নাম এখন না হয় কোনো প্রকারে বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তখনকার দিনে মাসিক-পত্রে কয়েকটি গল্প ও কবিতা এবং 'সপ্তক' নামে সামান্য একটি গল্পের বই প্রকাশিত হওয়ার দাবিতে কি ক'রে 'সাহিত্যিক' আখ্যা গলাধঃকরণ করতে পারি! বেঙাচিকে বেঙ বললে বেঙাচির যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তার চেয়েও করুণ মনে হ'তে লাগল। কুন্ঠিত স্বরে বললাম, "আজ্ঞে হাঁ, অল্প-স্বল্প একটু-আধটু লিখে থাকি।"

"'প্রতিক্রিয়া' তো আপনার লেখা?"

মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাল্‌কা হলাম। তা হ'লে, অন্তত

দীননাথের মতে আমি 'সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ।' বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ও-লেখাটা আমারই।"

আমার উত্তর শুনে খুশি হ'য়ে দীনবাবু বললেন, "আনন্দের কথা, এখানকার উকিল-মহলে একজন লেখক এসে যোগ দিলেন।" তারপর সাহিত্য বিষয়ে উকিলদের সাধারণভাবে ঔদাস্তের এবং অক্কতিত্বের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ বিষয়ে হাকিমদের দিকটা কিন্তু খুব উজ্জ্বল।"

উত্তরে আমি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন আইন-ব্যবসায়ী লেখকের নাম উল্লেখ করলাম।

দীনবাবু বললেন, "এঁরা সাহিত্যিক সে কথা মানি, কিন্তু যে সাহিত্য-গগনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চাটুজ্জে চন্দ্র, সেখানে এঁরা তারা ভিন্ন আর কিছুই নন।"

হালে পানি পাই না দেখে আমি মহাকবি মাইকেলের নাম করলাম।

মৃদু হেসে দীনবাবু বললেন, "বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এসে মধুসূদন যদি কোনো কিছু প্রমাণ ক'রে থাকেন তো এই কথাই প্রমাণ করেছিলেন যে, আইন-ব্যবসায়ের তিনি কেউ ছিলেন না।"

এই কঠোর সত্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রে গেলাম।

বিদায়গ্রহণকালে দীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "দোসরা জানুয়ারি যোগ দিচ্ছেন তো?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দোসরা জানুয়ারিই।"

আমার একজন তায়িদ (মুহুরী) নিযুক্ত করা হ'ল।

হাকিমের যেমন পেশকার, ডাক্তারের যেমন কম্পাউণ্ডার, উকিলের

জেনলি মুহুরী। আমার মুহুরীর নাম ত্রিলোকনাথ পাঁড়ে, উগ্র গৌর-বর্ণ দেহ, সুশ্রী মুখাবয়ব, বয়স বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সেজদাদার মুহুরী বৈকুণ্ঠনাথ পাড়ের সে খুড়তুত ভাই। আমি ওকালতি করতে আসছি ব'লে ত্রিলোক আমার জন্ম জীয়ানো ছিল। সে এবং আমি একসঙ্গেই জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। সে দিন সকলে বলেছিল, যেমন সওয়ার তেমনি বাহন। সওয়ার অর্থে সেদিন অবশ্য আমাকেই মনে করা হয়েছিল; কিন্তু উত্তরকালে এক-এক সময়ে এমন অবস্থা ঘটত যে, কে সওয়ার কে বাহন তার ঠাহর ঠিক পাওয়া যেত না; অনেক সময়ে আমিই যেন বহন করতাম ত্রিলোকনাথকে।

সকাল-সন্ধ্যা সেজদাদা মক্কেলের দফল নিয়ে কাজে বসেন; আমি তাঁর বাম পার্শ্বে উপবেশন ক'রে মুদ্দই (বাদী), মুদ্দালেহ (প্রতিবাদী) ও গবাহ্‌দের (সাক্ষীদের) কথাবার্তা শুনি, এবং আর্জি (plaint), বিয়ান-তহরির (written statement) ও দরখাস্তের (petition) অর্ধবোধ্য ভাষার মর্মোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করি। একদিন বৈকুণ্ঠ পাড়েকে দিয়ে সেজদাদা একটা দরখাস্ত লেখাতে দিয়ে সম্বোধনের পাঠ লেখালেন, 'গরিবপরবর সলামৎ'। কথাটা নূতন শুনলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, ভিন্ন পরিচ্ছদে একে যেন পূর্বে কোথাও দেখেছি। সহসা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, "সেজদা, এই 'গরিবপরবর সলামৎ'ই কি ইংরিজীর 'Hail cherisher of the poor'?"

স্মিতমুখে সেজদাদা বললেন, "হ্যাঁ। কি ক'রে তা জানলে?"

বললাম, "কলকাতায় দাদার হাইকোর্টের পেপার-বুকে প্রায়ই ও-বাক্যটা দেখতাম।"

পেপার-বুকের মধ্যে 'Hail cherisher of the poor' দেখে একদিন যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলাম। মামলা-মকদ্দমার কঠোর বাস্তব

ক্ষেত্রে এতটা অনাবশ্যক বিনয়ের উচ্ছ্বাস মনকে একটু পীড়িতই করেছিল। আজ 'Hail cherisher'-এর মৌলিক মূর্তি দেখে মনে মনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলাম। একটা বচন আছে, 'এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্য ভেদ নাই।' আদালত সম্বন্ধে এ বচনটি প্রযোজ্য। এখানে বাস্তবিকই গুরু-শিষ্যের ভেদ নেই। 'গরিবপরবর সলামৎ' সে কথার প্রতীক। প্রকৃতই যে গরিব তাকে তো বলতেই হয় 'গরিবপরবর সলামৎ'; বিপুল ধনৈশ্বর্যের অধীশ্বর দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকেও সেই একই বুলি আওড়াতে হয়।

এ না-হয় ধর্মাধিকরণের লোকাতীত মহিমার প্রতি আনুগত্যের অভিভাষণ, এ জিনিস পরিপাক করা কঠিন নয়;—যা আমাকে সত্য-সত্যই পীড়িত করত তা হচ্ছে আইন-আদালতের পরিবেশের মধ্যে মিথ্যার অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তা, এমন কি, উপকারিতা। 'অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তা' কথাটা শ্রুতিকটু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুলও নয়। অনেক সময়ে সত্য মামলাকে জয় করতে হয় মিথ্যা সাক্ষী-সাবুতের সাহায্যে; আবার মিথ্যার দ্বারাই অনেক সময়ে মিথ্যা মামলাকে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন হয়, কতকটা কণ্টকের দ্বারা কণ্টককে উৎপাটিত করার মতো। মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে মিথ্যা যতটা সবল এবং সচল বস্তু, সত্য ততটা নয়। ভাল ক'রে আটঘাট বেঁধে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করাতে পারলে মিথ্যার চকমকানির কাছে সত্য অপ্রতিভ হ'য়ে অবস্থান করে। সেরূপ অবস্থায় অনেক ঘাগী হাকিমও মিথ্যার চোখ-ঝলসানো আলোকের দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়ে নিষ্প্রভ সত্যকে অসত্য ব'লে ভুল করেন।

দেখতে দেখতে দোসরা জানুয়ারি এসে পড়ল। একটু সকাল-সকাল কাজ-কর্ম থেকে উঠে স্নানাহার সেরে পোশাক পরিধানের কার্যে ব্যাপৃত

হলাম। সে বিষয়ে মনে মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। এতদিন ভদ্র-লোকের সহজ সরল পোশাক প'রে এসেছি, মিনিট দুয়েকের মধ্যে বেশ-পরিবর্তন সম্ভব হ'ত। এখন প্যাণ্ট, চোগা, চাপকান, গলায় শক্ত উঁচু কলার, পায়ে লেসবাঁধা শু, গরম মোজা, মাথায় শালের ফিতা জড়ানো শামলা,—সে এক বিপর্যয় ব্যাপার! আধ ঘণ্টা ধ'রে টানা-হেঁচড়া ক'রে, ভাগলপুরের হাড়-কাঁপানো শীতেও ঘর্মাক্ত হ'য়ে, পোশাক পরা শেষ হ'ল। কথায় বলে, অনভ্যেসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে। আমার অনভ্যাসের বেশে সমস্ত দেহ চড়চড় করতে লাগল।

মাথায় শামলাটা দিয়ে আয়নার মধ্যে দৃষ্টিপাত ক'রে না হেসে থাকতে পারলাম না। যাকে বলে—যাত্রার দলের জুড়ি, একবারে হুবহু তাই।

ওদিকে সেজদাদা ইতিমধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে বাইরের ঘরে ব'সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন—সে খবর পেয়েছি। আমার যা পোশাক, এক-মাত্র কড়া কলার বাদে, তাঁরও তাই। কিন্তু পনের-ষোল বৎসরের ক্রমান্বয় ব্যবহারে তারা তাঁর কাছে এমন বশ্যতা স্বীকার করেছে যে, মিনিট তিনেকের মধ্যে যে-যার নিজ নিজ স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মেজ জেঠাইমাকে প্রণাম ক'রে সেজ বউদিদির কাছে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে সহাস্য মুখে সেজ বউদিদি বোধ হয় একটু কৌতুকান্বিত হ'য়েই বললেন, "বেশ দেখাচ্ছে।"

মাথায় শামলা চড়িয়ে বললাম, "ধরব না-কি তা হ'লে ?"

"কি ধরবে ?"

"জুড়ির গান ?"

রহস্যটা বুঝতে পেরে সেজ বউদিদি হাসতে লাগলেন, বললেন, "বেশ

তো, ধর না। একাই বা ধরবে কেন? বাড়িতে তো আরও জুড়ি আছে।"

ভজুয়া চাকর এসে তাগাদা দিলে, বললে, বাবু তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন।

সেজ বউদিদিকে একটা প্রণাম ক'রে বললাম, "তাঁর সঙ্গে জুড়ির গান গাইতে আদালতের যাত্রার আসরে চললাম।"

আদালতে বার-লাইব্রেরিতে পৌঁছানো মাত্র আমার 'সগুণ' অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'য়ে গেল। বড় বড় উকিলরা আমাকে দেখেন আর তাঁদের মুহুরীদেরকে বলেন, "বাবু আজ প্রথম ওকালতি আরম্ভ করলেন, বাবুকে ভাল ক'রে সগুণ করাও।"

সগুণ—অর্থ উপার্জনের মাঙ্গলিক আরম্ভ। নূতন উকিলের প্রথম দিনের সূচনা যাতে অর্থহীন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বড় উকিলেরা তাঁদের মক্কেলদের কাছ থেকে কিছু অর্থ পাইয়ে দেন। চলতি মামলার ওকালত-নামায় সদ্যাগত উকিল নিজের নাম সই করেন ও টাকা দুই ক'রে দক্ষিণা পান। সুদীর্ঘকাল হ'তে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রথার কথা উকিলদের মুহুরীরা তো জানেই, যে-সকল ব্যক্তির আদালতে সর্বদা মামলা-মকদ্দমা থাকে তাদেরও এ প্রথার মর্ম বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। নূতন মুখের উকিল ও নিজের উকিলের মুহুরী একত্র দেখলেই এরা টাকা বার করবার জন্য ট্যাঁকে হাত দেয়।

প্রথমে বৈকুণ্ঠনাথ পাড়ে সেজদাদার মক্কেলদের কাছে সগুণ করাতে আরম্ভ করলেন। ওকালতনামার উল্টো পিঠে আমি নাম সই ক'রে তারিখ বসাই, মক্কেলরা কেউ দেয় দু টাকা, কেউ চার টাকা, কেউ বা পাঁচ।

সেজদাদার মক্কেল শেষ হ'লে অন্য উকিলদের মক্কেল আরম্ভ হ'ল।

দেখতে দেখতে মনিব্যাগ ছাপিয়ে টাকা চাপকানের পকেটে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলে। বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ডান দিকের চাপকানের পকেটের ভিতরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব এমন বৃদ্ধি লাভ করলে যে, তার টান কণ্ঠদেশে উপস্থিত হ'য়ে পীড়ন করতে লাগল। তখন ডান দিকের পকেটের অর্ধেক টাকা বাম দিকের পকেটে চালান দিয়ে দেহের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করলাম।

ইত্যবসরে এক সময়ে একজন আরদালী এসে হাজির। আমাকে অভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারই নাম কি উপেনবাবু?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"হাকিম আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।"

একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ হাকিম?"

"ঔয়ল্ সবজজ।"

বললাম, "আচ্ছা, চল যাচ্ছি।"

তখন এজলাসের সময়। দীননাথ দের এজলাসে উপস্থিত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে বললাম, "আপনি আমাকে ডেকেছেন সার্?"

স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন ক'রে দীননাবু বললেন, "হ্যাঁ, ডেকেছি। একটা মকদ্দমায় আপনাকে নাবালক প্রতিবাদীদের পক্ষে guardian-ad-litem নিযুক্ত করেছি, আর অন্য একটা মকদ্দমায় আপনাকে commissioner করেছি সাক্ষীর এজাহার নেবার জন্যে। অফিসে গিয়ে সেরেস্তাদারের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে যান।"

হাকিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন ক'রে অফিসে উপস্থিত হলাম। তারপর সেরেস্তাদারের কাছ থেকে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় আরম্ভ করলাম।

সেরেস্তাদার বললেন, "প্রথম দিনের একজন উকিলকে বড় বড়

মকদ্দমায় একসঙ্গে গার্জেন করা আর কমিশন দেওয়া সচরাচর বড় দেখা যায় না। হাকিম আপনাকে বিশেষ খাতির দেখিয়েছেন,—বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন।"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই করেছেন।"

সেরেস্তাদার বললেন, "মকদ্দমা দুটিই মাঝারি রকমের বড়। দুটোতে নিদেন পক্ষে শ দেড়েক টাকা উপায় করতে পারবেন।"

পকেটে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, হাতে শ দেড়েক,—মন্দ নয় তো! খুশিতে মন ভ'রে উঠল। ইংরিজীতে একটা কথা আছে, 'morning shows the day'। ওকালতি জীবনের আজকের দিনটা যদি সেই morning হয়, আর বাকি জীবনটা যদি আজকের অনুপাতে day হ'য়ে ওঠে, জয় হোক আজকের দিনের!

১২

আমাদের বার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তিনকড়ি সোম। তিনি আমাদের দাদাদের সহপাঠী এবং সমবয়স্ক ছিলেন, তাই তিনি 'তুমি' ব'লে আমাকে সম্বোধন করতেন, আর আমি তাঁকে বলতাম তিনকড়িবাবু। শুধু আমাকে কেন, জুনিয়ার দলের অধিকাংশ উকিলকে তিনি 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতেন। সিনিয়ার দলেরও পাঁচ-সাতজনকে 'তুমি' বলতেন, তা মনে পড়ে।

মাথায়-খাটো প্রসন্নবদন তিনকড়িবাবু স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন। বারো বৎসরকাল আমি ওকালতি করেছিলাম, তার মধ্যে বোধ করি বারো দিনও তাঁকে কামাই করতে দেখি নি। আর কামাই করলে তাঁর চলতও না, কারণ উকিল মেরে বেশ দু-পয়সা তাঁর উপার্জন ছিল, যেটা আদালতে হাজির না থাকলে হবার উপায় ছিল না। কবে কোন্ সময়ে সহসা সে সুযোগ উপস্থিত হবে অদৃষ্টের মতই অধিকাংশ স্থলে তা অগোচর থাকত।

মকদ্দমার নথিপত্রে কোন উকিলের দস্তখত প্রমাণ করবার প্রয়োজন হ'লে সাধারণত তার দুটি উপায় ছিল। এক, সেই উকিলকে সাক্ষী মেনে এজাহার করিয়ে প্রমাণ করা, দ্বিতীয়ত, সকল উকিলের হস্তাক্ষরের সহিত কার্যগতিকে বিশেষভাবে পরিচিত তিনকড়িবাবুকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেওয়া। উকিলের এজাহার করাতে হ'লে উকিলকে ফিস্ দিতে হ'ত ষোল টাকা; কিন্তু সেই কাজ তিনকড়িবাবুকে দিয়ে করিয়ে নিলে চার টাকা খরচ করলেই চলত। উকিলের মারা যেত ষোল টাকা, কিন্তু তিনকড়িবাবু সুবিধা করতেন চার টাকার। ছোটখাটো মামলায়

মক্কেলরা প্রায়ই সুলভে কাজ সারত তিনকড়িবাবুকে দিয়ে এজাহার করিয়ে। সুতরাং এজলাসে এজলাসে হাকিমদের কাছে তিনকড়িবাবু সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

আমি যখন ওকালতি আরম্ভ করলাম, তখন তিনকড়িবাবুর বয়ঃ-পর্যায়ে একটা সঙ্কটের কাল উপস্থিত হয়েছে। জনশ্রুতি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রতি দুর্জয় ভীতি অথবা বৈরূপ্যবশত, গত দু-তিন বৎসর যাবৎ তিনি ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন; এমন কি, এজলাসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় পর্যন্ত। তিনকড়িবাবু হয়তো মনে মনে ভাবছেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মানুষ প্রবেশ করলে তার দু পা না হোক, অন্তত একটা পা ইহজন্মের কঠিন ভূমিখণ্ড হ'তে তুলে নেওয়া হয়, পরলোকের যাত্রাপথের প্রথম পর্বের ঘণ্টা হয়তো পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই বাজে। তিনকড়িবাবুর দুই-একজন বয়স্থ উকিল বলেন, গৃহ-সংসারে প্রতিপত্তি হানির আশঙ্কায় তিনকড়িবাবু এইরূপে পঞ্চাশ বৎসর বয়সকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ ক'রে চলেছেন।

বয়সের এই প্রসঙ্গটা বিশেষ জোরালো হ'য়ে উঠত আদালতের সাক্ষীর কাঠরায়। এজাহার দিতে তিনকড়িবাবু কাঠগড়ায় প্রবেশ ক'রে দাঁড়িয়েছেন। একটা পরিচিত কৌতুক-রসের আসন্ন প্রত্যাশায় হাকিম থেকে আরদালী পর্যন্ত সকলের মন উৎসুক হ'য়ে উঠেছে।

পেশকার যথারীতি এজাহার-শীটে সাক্ষীর নামধাম লিখতে উদ্যত হল। সাক্ষীর নাম বিশেষভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও অভিনয়টা সরস এবং সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেন, "আপ্‌কা নাম?" (আপনার নাম?)

ব্যাপারটা কোথায় উপনীত হবার উপক্রম করেছে বুঝতে পেরে স্মিতমুখে তিনকড়িবাবু বলেন, "তিনকড়ি সোম।"

"ওয়লদ্ ?" (কার পুত্র ?)

তিনকড়িবাবু পিতার নাম বলেন।

"পেশা ?"

"লাইব্রেরিয়ান।"

"সকুনৎ ?" (বাসস্থান ?)

"ভাগলপুর।"

এইবার রুদ্ধ হাসির তাড়নায় পেশকারের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে; "উমর ?" (বয়স ?)

হাকিমের মুখে হাসি, উকিলদের মুখে হাসি, চাপরাসীর মুখে হাসি।

তিনকড়িবাবু যে পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হুজুর, তিনকড়িবাবু শপথ নিয়ে সত্য কথা বলেন, আশা করি, সে বিশ্বাস আমাদের সকলেরই আছে ?"

সহাস্যমুখে মাথা নেড়ে হাকিম বললেন, "নিশ্চয়ই আছে।"

উকিল বলেন, "দুই বছর পূর্বে শপথ নিয়ে তিনকড়িবাবু নিজের বয়স লিখিয়েছিলেন—উনপঞ্চাশ বৎসর; আজ শপথ নিয়ে কি ক'রে আবার কথার খিলাপ (ব্যতিক্রম) করেন ? সুতরাং আজও উনপঞ্চাশ বছরই লিখে নেওয়া হোক। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ভদ্রলোকের কথা তো আর বদলে যেতে পারে না ?"

একটা উচ্চহাস্যরবে আদালত-কক্ষ উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, এবং সেই অবসরে বাকি যা লেখবার লিখে নিয়ে পেশকার এজাহার শীট হাকিমের সম্মুখে স্থাপন করেন।

ওকালতি ব্যবসায় চালাতে গেলে যে দু-চারটি সারগর্ভ নীতিবাক্য অনুসরণ ক'রে চলতে হয় তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—Cheat and be

cheated; অর্থাৎ ঠকাও এবং ঠকো। আমাদের ভাগলপুরের বার-লাইব্রেরির অন্তর্গত Busy-body Society নামে একটি যে পরছিদ্রান্বেষী বিচিত্র সঙ্ঘ ছিল, 'cheat and be cheated' বাক্যটি তারই একটি সূক্তি অর্থাৎ slogan। সূক্তিটির সদুপদেশ হচ্ছে, বাগে পেলেই মক্কেলকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় কর, কারণ মক্কেলও সুবিধা পেলেই তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মক্কেল মথুরাপ্রসাদ যখন তোমাকে নিশ্চয়ই ঠকাবে, পূর্বাহ্ণে দোয়ারকাপ্রসাদ মক্কেলকে ঠকিয়ে তার ক্ষতিপূরণ ক'রে রাখ।

এই নীতিটি যে একান্ত মূল্যবান, সুতরাং সর্বথা পালনীয়, ভবিষ্যৎ কালের অভিজ্ঞতা থেকে তা মর্মে মর্মে (স্থূল কথায়, হাড়ে হাড়ে) অনুভব করেছিলাম। অদৃষ্টক্রমে ঠকানোর কার্যটা প্রথমে আরম্ভ হবার সুযোগ পেয়েছিল আমার দিক থেকেই। আর, সেই পাপকার্যের দণ্ডস্বরূপ ভবিষ্যতের মথুরাপ্রসাদের হাতে যে টাকাটা আমাকে বারংবার গচ্চা দিতে হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার দ্বারা ঠকানো টাকার মোট তায়দাদের সামঞ্জস্য মেলাতে গেলে মনে মধ্যে কোনো সান্ত্বনাই পাওয়া যায় না। প্রথম ঠকানোর কৌতুকপ্রদ কাহিনী বলবার পূর্বে Busy-body Society সম্বন্ধে সামান্য একটা কথা ব'লে তার ক্রিয়াশীলতার একটু আন্দাজ দিই।

Busy-body Society-র একটি দপ্তর ছিল। দপ্তর অর্থে একখানি বাঁধানো খাতা। তদ্ভিন্ন তার আর কোনো স্বতন্ত্র উপকরণ অথবা সজ্জা-সরঞ্জাম ছিল না। বাদামের কঠিন খোলের মধ্যে সুস্বাদু শাঁসের মতো উকিলখানার রসহীন আবেষ্টনের মধ্যে Busy-body Society-র এই খাতাখানি ছিল সরস বস্তু। আদালতের চতুঃসীমার মধ্যে যেখানে যা কৌতুকরসাশ্রিত ব্যাপার ঘটত, এই দপ্তরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে তা

রসিকজনের উপভোগের বস্তুরূপে অবস্থান করত। হাকিম-হোমরা পর্যন্ত তার এলাকা থেকে বাদ পড়ত না। নমুনাস্বরূপ হাকিম-সংক্রান্ত একটা ব্যাপারের কথাই বলি।

একজন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একটা ফৌজদারী মামলার রায় লিখতে গিয়ে রায়ের মধ্যে 'ভাগাড়' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শব্দটি ব্যবহার ক'রে মনে হ'ল, তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, এবং ঘটনাক্রমে বিচারের জন্য আপীলটি যদি কোনও ইংরেজ হাকিমের নিকট উপস্থিত হয়, তা হ'লে বিদেশী ভদ্রলোক 'ভাগাড়' কথাটা নিয়ে একটু বিব্রত হ'তে পারেন; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে কথাটার ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া ভাল। ইতি চিন্তা ক'রে তিনি লিখলেন, "Bhagar is a place inhabited by dead cows," অর্থাৎ ভাগাড় হচ্ছে সেই স্থান যেখানে মৃত গরুরা বাস করে।

নকল নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রায়টি Busy-body Society-র সম্পাদকের হাতে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সদ্য-লব্ধ অমূল্য রত্নটি খাতার মধ্যে অন্যান্য রত্নের সহিত একসূত্রে গেঁথে নিলেন। উক্তিটির মধ্যে এমন এক সূক্ষ্ম কৌতুকরসের ব্যবস্থা আছে, সচরাচর সত্যই যা দুর্লভ। Dead cows-এর সহিত inhabited শব্দটি গরুদেরও পক্ষে এমন উত্তেজকভাবে বিদ্রূপাত্মক যে, ইংরেজী ভাষা জানা থাকলে ভাগাড়ের মৃত গরুরা হয়তো শিং নেড়ে হাকিমকে গুঁতোবার জন্যেই দৌড়ত।

এবার মক্কেল-ঠকানোর কাহিনীটা বলি।

মাত্র মাস চার-পাঁচ ওকালতি করছি। কাজ শেখবার জন্যে সেজদাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি; সুযোগমতো কোনো কোনো মামলায় ওকালতনামায় সই ক'রে সাক্ষীর এজাহার লিখি,—তাতে টাকা দুয়েক ক'রে ফিস্ পাই। আমার মতো নতুন উকিলের পক্ষে দু টাকা

ঊর্ধ্বদিকের একরকম শেষ কথা। তিন টাকা ফিস্ সাধারণত হয় না; চার টাকা নাগালের বাইরে। নিম্নদিকে তাই ব'লে দু টাকা শেষ কথা নয়। ভাঙাভতি দেড় টাকার মধ্যে একটা হীনতার প্রকাশ আছে; কিন্তু পুরোপুরি একটা অখণ্ড রৌপ্যনির্মিত টাকার মধ্যে তাহার গ্লানি নেই সুতরাং দু টাকার ব্যবস্থা না হ'লে এক টাকাও চলে, মক্কেলের তো স্বচ্ছন্দেই, উকিলেরও অগত্যা।

অবস্থা যখন এই রকম, একদল মক্কেল একটা মার্ডার কেসের বক্তৃতার সেজদাদাকে নিযুক্ত করার অভিপ্রায়ে আসা-যাওয়া লাগিয়ে দিলে। সেজদাদার ফিস্ অনেক, বিশেষত ফৌজদারী খুনের মামলায়। কিছু কমাবার জন্য মক্কেলদের পক্ষ থেকে চেষ্টাচরিত্র চলতে লাগল।

সেজদাদার মুহুরী বৈকুণ্ঠনাথ পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি পাঁড়েজী, এ মকদ্দমায় আমি থাকব তো?"

পাঁড়েজী বললেন, "নিশ্চয় থাকবেন। বাবুর ফিস্টা তয় (স্থির) হ'য়ে গেলে আপনার কথা ঠিক ক'রে নোব "

উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম, "মার্ডার কেস,—ফিস্টা একটু উঁচিয়ে করবার চেষ্টা করবেন। প্রথমে পাঁচ টাকা হাঁকবেন; রাজী না হ'লে চার টাকার জন্যে চেষ্টা করবেন, তাতেও যদি অস্বীকার যায়, তা হ'লে সনাতন দু টাকা তো আছেই।"

পাঁড়েজী বললেন, "আজ বৈকালে ওরা এসে বাবুর ফিস্ স্থির ক'রে সগুণ দিয়ে যাবে। আপনি সে সময়ে বাবুর কাছে ঘরের ভিতর না ব'সে বারান্দায় বসবেন।"

সগুণ অর্থে নিয়োগ-দক্ষিণা (engagement fee),—আসল ফিসের অতিরিক্ত অর্থ।

সে সময়ে গ্রীষ্মকাল, যথারীতি মর্নিং কাছারি চলছে। বেলা চারটা

আন্দাজ বার-বড়িতে এসে বারান্দায় জমিয়ে বসলাম। জমিয়ে, অর্থাৎ দু-চারটে মোটা মোটা আইনের বই আর ফিতে-বাঁধা গোটা দুই অবান্তর মকদ্দমার নথি সংগ্রহ ক'রে। দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা, তার পশ্চিম প্রান্তের খানিকটা স্থান জুড়ে পাঁড়েজীর দপ্তরখানা, পূর্বপ্রান্তে চেয়ার-টেবিল পাতা। আমি বসলাম সেই চেয়ার-টেবিল অধিকার ক'রে।

ক্ষণকাল পরে মক্কেলের দল এসে উপস্থিত হ'ল। দলে তারা সেদিন বেশ ভারি,—আট-নয়জনের কম নয়। দু-চার মিনিট প্রাথমিক কথোপ-কথনের পর মক্কেলদের মধ্যে জন তিনেককে সঙ্গে নিয়ে পাঁড়েজী ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। কিছু পূর্বে সেজদাদা বাইরে এসে বসেছেন। দু-চার মিনিট কথাবার্তার ভন্‌ভনানি শোনা গেল, তারপরেই রূপালী টাকার ঝন্‌ঝনানি। বঁড়শিতে মাছ গেঁথে ক্লান্ত হ'য়ে ডাঙায় উঠেছে, সে কথা সুস্পষ্ট হ'ল।

ক্ষণকাল পরে পাঁড়েজী মক্কেলদের নিয়ে নিজের দরবারে এসে সমাসীন হলেন। এবার আমার পালা। বুঝলাম, সে পালার সুর ভাঁজা আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

পূর্ব প্রান্তে অকস্মাৎ আমি কাগজ-পত্র এবং আইনের বইগুলির মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হ'য়ে পড়ি। এ-বই খুলি, ও-বই খুলি, তারপর হঠাৎ এক সময়ে মকদ্দমার নথির ভিতর থেকে একটা কাগজ টেনে বার ক'রে নিবিষ্ট চিত্তে খানিকটা কিছু প'ড়ে দেখে মোটা আকারের একটা বই খুলি; পর-মুহূর্তে সশব্দে সেটা টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে অন্য একটা বই তুলি।

জীবনটা আমাদের অভিনয় ক'রে ক'রেই কাটে। আমিও এ পর্যন্ত অনেক অভিনয় করেছি, এখনও ক'রে চলেছি, কিন্তু সেদিন যেমন গভীর নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সহিত করেছিলাম, তেমন বোধ করি

আর কোনদিনই করি নি। নিরবসর অভিনয়ের তন্ময়তার মধ্যে কানটি কিন্তু নিযুক্ত ক'রে রাখি বারান্দার পশ্চিম দিকে। আমার টেবিল-চেয়ার থেকে পাঁড়েজীর ফরাসের ব্যবধান অন্তত বিশ-বাইশ ফুট হবে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাই "আইনে ভারি পাকা" "বাবুর দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে উঠছেন" ইত্যাদি বাক্যাংশ। এদিকে আমি উৎসাহিত হ'য়ে অভিনয়ের চাকার গতি বাড়িয়ে দিই।

একটা অত্যন্ত মোটা নজিরের বইয়ের মধ্যে অহেতুক মনোযোগী হ'য়ে অবস্থান করছি, এমন সময়ে জন তিনেক মক্কেল সঙ্গে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ান পাঁড়েজী। বই থেকে, বোধ হয় একটু বিরক্ত হ'য়েই, মুখ তুলে বলি, "কি পাঁড়েজী ?"

পাঁড়েজী বলেন, "এঁদের একটা মকদ্দমা আছে।"

কাজের মধ্যে বিঘ্নিত হওয়া একজন আইনে-পাকা উকিলের পছন্দ করা উচিত নয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দেখিয়ে বলি, "এক মিনিট।" তারপর ক্ষণকাল নজিরের বইয়ের মধ্যে অকারণ মগ্ন হ'য়ে থেকে একটা কাগজের টুকরা দিয়ে পাতাটাকে চিহ্নিত ক'রে রেখে বই বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করি, "কি মকদ্দমা ?"

পাঁড়েজী বলেন, "ফৌজদারী মার্ডার কেসের বহস্ (বক্তৃতা)। এঁরা বাবুর সঙ্গে আপনাকে বাহাল করতে চান।"

বলি, "বেশ, আপত্তি নেই।"

কয়েকটা টাকা, আন্দাজে মনে হয় গোটা পাঁচেক, আমার সম্মুখে স্থাপন ক'রে পাঁড়েজী বলেন, "ফী সম্বন্ধে বাবু এঁদের প্রতি বেশ একটু মেহেরবানি (দয়া) করেছেন। আপনার যা মামুলি ফী তা আমি এঁদের বলেছিলাম, কিন্তু ওতটা এঁরা দিতে পারছেন না। আপনাকে কিছু

মেহেরবানি করতে হবে।" ব'লে পাড়েজী যেন মক্কেলদের পক্ষ হ'য়েই যাজ্ঞায় করুণ হাসি হাসতে থাকেন।

যুক্তকরে ঈষৎ অবনত দেহে মক্কেল তিনজন পাড়েজীর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলে, "জী হুজুর, মেহেরবানি করনেহি পড়েগা। তবা হো গয়ে।" (আজ্ঞে হুজুর, দয়া করতেই হবে। জেরবার হ'য়ে গেছি।)

তা না-হয় মেহেরবানি করাই যাবে, কিন্তু ব্যাপারখানা কি! দেখে তো মনে হয় পাঁচ টাকাই বটে। শুনেছি কেসটা দিন তিনেক চলবার সম্ভাবনা। তা হ'লে পাঁচ টাকা সমস্ত কেসটার ফুরণ ফিস্ না-কি? পাড়েজী তো বললেন, আমার মামুলি ফিস্ চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার মামুলি ফিস্ তো দু টাকাই। তা হ'লে তিন দুগুণে ছ টাকা থেকে মেহেরবানির এক টাকা বাদ দিয়ে বাকি পাঁচ টাকা নয় তো? সব দিক থেকে হিসেবে পাঁচ টাকা অবশ্য মিলে যাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহেই বা ক্ষতি কি? এ কেসে তো আর এজাহার লেখবার হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে না। কথায় বলে, প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা, এ তো পাঁচ টাকা। তবু জিজ্ঞাসু নেত্রে পাড়েজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

পাড়েজী বলেন, "আমি আপনার পঁচিশ টাকা দৈনিক ফী-ই চেয়েছিলাম, এঁরা পনের টাকা দিতে চান। অনেক খরচ-পত্র ক'রে এঁরা বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। পনের টাকাতেই রাজী হোন।"

পুনরায় যুক্তকরে পূর্বোক্ত মক্কেলটি ব'লে ওঠে, "জী হুজুর, রাজী হবা যায়।" (আজ্ঞে হুজুর, রাজী হওয়া হোক।)

কি সর্বনাশ। এ তো রাজী হওয়া নয়,—এ যে রীতিমত পকেট মারা। পনেরো টাকা দৈনিক ফিস্ একজন দশ বৎসরের উকিলের পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা! এত বড় অবৈধ অর্জন পরিপাক করি

বিবেকের নিকট কোন্ কৈফিয়ৎ পেশ ক'রে ? অন্তরের অন্তরতম 'আমি' বাইরের 'আমাকে' ছি-ছি করতে লাগল।

কিন্তু নাচতে উঠে ঘোমটা টানাও তো চলে না। অভিনয় যখন করতে আরম্ভ করেছি, তখন যবনিকাপাত পর্যন্ত ক'রে যেতেই হবে। আইনে পাকা উকিল হ'য়ে পঁচিশ টাকা থেকে পনেরো টাকার অবতরণে যদি নির্বিবাদে রাজী হ'য়ে যাই তা হ'লে ব্যাপারটার মধ্যে খোলতাইয়ের একটু লাঘব হয়, পাঁড়েজীর ফিস্ কমিয়ে দেবার গৌরব তেমন সুস্পষ্ট হয় না, আর, মক্কেলের দশ টাকা সাশ্রয়জনিত আনন্দের মূল তেমন সবল হ'য়ে উঠতে পারে না। বলি, "পনেরো টাকা বড্ড কম হ'য়ে গেল, টাকা কুড়িক হ'লে ভাল হ'ত।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলি, "আচ্ছা, তাই হবে।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মক্কেল প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে। আমার সামনে একটা ওকালতনামা রেখে টাকা কয়েকটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে পাঁড়েজী বলেন, "ওতে সগুণের পাঁচ টাকা আছে।"

ক্ষণকাল পূর্বে যে পাঁচ টাকাতে তিন দিনের ফিস্ মনে ক'রেও কতকটা আনন্দিত হয়েছিলাম, এখন তা সগুণের টাকা জেনেও খুশি হ'তে পারছি নে। যে টাকার সহিত সগুণের এই পাঁচ টাকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে টাকা ঠকিয়ে নেওয়া টাকা। বৃন্ত তিক্ত ব'লে ফলও তিক্ত হ'য়ে গেছে।

কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মক্কেলরা প্রস্থান করার পর পাঁড়েজীকে বললাম, "পাঁড়েজী, এ পনেরো টাকা আমার ভাল লাগছে না। পাঁচ টাকাই ভাল ছিল।"

বিস্মিতকণ্ঠে পাঁড়েজী বললেন, "কেন ?"

বললাম, "এ টাকা ঠকিয়ে নেওয়া টাকা।"

পাঁড়েজী বললেন, "কিন্তু পাঁচ টাকা যে ঠকিয়ে দেওয়া টাকা নয়, তাই বা আপনি মনে করছেন কেন? তা ছাড়া, এ যদি ঠকিয়ে নেওয়া টাকাই হয় তার জন্তে দুঃখ করবার দরকার নেই। ভবিষ্যতে অনেক মক্কেল আপনাকে ঠকাবে, তা নিশ্চয় জেনে রাখুন।"

পাঁড়েজী "Cheat and be cheated' সূক্তিটা জানতেন কি-না জানি নে; কিন্তু যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে—Cheat and be cheated।

পরবর্তী কালে এক লছমীপুর কেসেই তিন হাজার টাকা ঠকেছিলাম। সে কাহিনী পরে বলব।

১৩

ইংরাজি Tact শব্দের মনের মতো বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'কৌশল' বললে ট্যাক্ট-এর ঠিক মর্মস্থলে পৌছানো যায় না, 'উপস্থিতবুদ্ধি' অথবা 'বিচারবুদ্ধি' বললে ট্যাক্ট-কে খানিকটা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। 'ফন্দি' শব্দ অনেকটা কাছাকাছি যায় বটে ; কিন্তু ফন্দির মধ্যে অসাধুতার যতটা দুর্গন্ধ আছে, ট্যাক্টের মধ্যে ঠিক ততটা নেই। Tact এবং ফন্দি উভয়ের মধ্যেই প্রতারণার একটু সংস্পর্শ আছে , ট্যাক্টে কিছু কম, ফন্দিতে বেশি।

সে যাই হোক, ওকালতি করতে হ'লে বিদ্যা, বুদ্ধি, আইন-জ্ঞান, বাগ্মিতা প্রভৃতি যে সকল গুণের একান্ত প্রয়োজন, তন্মধ্যে ট্যাক্ট একটি প্রধান গুণ। এই ট্যাক্টের অভাবে বড় মকদ্দমায় পাকা ঘুঁটিকে কাঁচিয়ে যেতে দেখেছি। হাকিম থেকে আরম্ভ ক'রে বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী, পেয়াদা সকলেই মানুষ , সুতরাং, যতই আব্বা-জোব্বা আঁটুক না কেন অথবা ভাব-ভঙ্গি ধারণ করুক না কেন, সকলেরই একটি ক'রে মানবীয় হৃদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় হৃদয়ের দুর্বলতা আছে। এই মানবীয় হৃদয়ের দুর্বলতার উপর ক্রিয়াশীল হ'য়ে যে উকিল যত কাজ বাগাতে পারে সে উকিল তত tactful, অর্থাৎ কৌশলী।

অপরের মানবীয় হৃদয়ের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে হ'লে উকিলকে সর্বাগ্রে নিজের মানবীয় হৃদয়কে নিষ্ক্রিয় করতে হয় 'পেশাদারি হৃদয়ের' প্রভাবে। এই পেশাদারি হৃদয় অক্ষয় অব্যয় নির্বিকার হৃদয়। অপরের হৃদয়কে টলানো যায় একমাত্র এই পেশাদারি হৃদয়ের অটলতার দ্বারা। একটা কথা আছে—লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। উকিলের

পক্ষে এ তিন থাকতে তো নিশ্চয় নয়,—চতুর্থ বস্তু ক্রোধ থাকতেও নয়। হাকিমের উপর অথবা সাক্ষীর উপর, এমন কি প্রতিপক্ষের উকিলের উপর, ধৈর্য হারিয়ে বহু উকিলকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে দেখেছি। নির্বিকল্প ধৈর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার নাম ট্যাক্ট।

আমার ওকালতি-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে নিতান্ত আত্মরক্ষার চেষ্টার মধ্য দিয়েই এই কৌশলবুদ্ধি উদ্ভূত হয়েছিল,—একবার এক সাক্ষীকে জেরা করবার সময়ে এবং দ্বিতীয় বার ভাগলপুর ডিভিশনাল কমিশনার ম্যাকিন্‌টশ সাহেবের এজলাসে একটি আপীল মামলার বক্তৃতাকালে। প্রথমে সাক্ষীকে জেরার কথাটাই বলি।

যে সকল ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ আসামী, একান্ত অর্থহীনতাবশত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল নিযুক্ত করতে সক্ষম হয় না, সেই সকল অসমর্থিত মামলায় (undefended case-এ) আসামী-পক্ষ সমর্থনের জন্য ডিস্ট্রিক্ট জজ নবাগত জুনিয়ার উকিলগণকে আহ্বান করেন। কোনো উকিল দয়াপরবশ হ'য়ে আসামীপক্ষ গ্রহণ করলে তার দ্বারা দুটি সুফল পাওয়া যায়। প্রথমত একতরফা বিচারের দুর্ভাগ্য থেকে আসামী পরিত্রাণ লাভ করে এবং দ্বিতীয়ত কাজ করবার সুযোগ লাভ ক'রে নূতন উকিল কাজ শেখার সুযোগ পায়। অবশ্য এ কাজের জন্য জুনিয়ার উকিল সরকারের নিকট হ'তে আর্থিক পারিশ্রমিক কিছু পায় না; কিন্তু আসামীকে সমর্থন করার জন্য আদালতের মকদ্দমার নথিপত্র পরিদর্শনের পূর্ণ অধিকার লাভ করে।

মাস চার-পাঁচ ওকালতি করছি, এমন সময়ে একদিন ঐরূপ একটি অসমর্থিত মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য ডিস্ট্রিক্ট জজের নিকট হ'তে আমন্ত্রণ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং সযত্নে

মামলার নথিপত্র পরিদর্শন ক'রে তা থেকে আমার ব্যবহারের উপযোগী মাল-মসলা সঙ্কলন ক'রে নিয়ে আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হলাম। মনের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ, নিজে স্বাধীন এবং অনন্যসহায় হ'য়ে মামলা পরিচালিত করতে পারব; কোনো সিনিয়ার উকিলের তাঁবেদার হ'য়ে দুটি রজতখণ্ডের পরিবর্তে সারাদিন এজাহার লিখে অঙ্গুলিপীড়ন করতে হবে না।

মকদ্দমার তারিখের দিন যথাসময়ে এজলাসে উপস্থিত হ'য়ে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বসলাম। সেদিনকার প্রথম কাজ একজন কন্‌স্টেব্‌লকে জেরা করা। কোনো এক পূর্ব তারিখে সরকারী উকিল—পাবলিক প্রসিকিউটার কর্তৃক তার প্রধান এজাহার (examination-in-chief) হ'য়ে আছে।

কনস্টেবলটি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এজাহার-স্লিপে পেশকারকে নিজের নাম-ধাম লেখাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে অনল বর্ষণ করছে। ভাবটা, উঃ! সেদিনের এক ছোকরা উকিল, এখনো গায়ে কলেজের গন্ধ লেগে আছে,—উনি আমাকে জেরা ক'রে বিপর্যস্ত করবেন, এই দুরাকাঙ্ক্ষা! আচ্ছা, দেখা যাক, কে কাকে ওল্‌টায়!

সেই দর্পকষায়িত নেত্রের নিঃশব্দ আস্ফালন দেখে মনে মনে একটু ভীতও হলাম, খানিকটা কৌতুকও বোধ করলাম। আচ্ছা, আমার বহুপরীক্ষিত 'দাওয়াই'টা কন্‌স্টেব্‌ল সাহেবের উপর প্রয়োগ করলে কি রকম হয় দেখাই যাক না একবার। এ পর্যন্ত তো কোনো ক্ষেত্রে নিষ্ফল হ'তে হয় নি।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আত্ম-জাগরণ তেমনভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করে নি। লেখনীচালনার দ্বারা

জীবিকা-অর্জন তখনকার দিনে ছিল কৌলীন্যের প্রধান পরিচয়। সুতরাং চাকর-বাকর পেয়াদা-পাইক থেকে আরম্ভ ক'রে পুলিস কন্‌স্টেব্‌ল পর্যন্ত সকলেই অকৌলীন্যের 'তুম্' অর্থাৎ 'তুমি' সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হ'ত। তারা যে অবধারিত 'তুমি'—এ কথা শুধু কলম-বাজেরাই মনে করত না, তারা নিজেরাও তাই মনে করত। কন্‌স্টেব্‌লদিগকে এজাহার করবার সময়ে উকিলেরা তো 'তুম্' সম্বোধন ব্যবহার করতই, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর জনসাধারণও তাদের সম্পর্কে কখনো 'আপ' (আপনি) শব্দ ব্যবহার করত না। যে কন্‌স্টেব্‌লটিকে আমি জেরা করব, তাকেও প্রধান এজাহারের সময়ে পাবলিক প্রসিকিউটার 'তুম্' ব'লেই সম্বোধন করেছেন।

নাম ধাম প্রভৃতি প্রাথমিক পরিচয়গুলি লেখা শেষ হ'লে পেশকার এজাহার-স্লিপটি হাকিমের সম্মুখে স্থাপন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও জেরা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, সুস্পষ্ট কণ্ঠে, যাতে ঠিকমতো শুনতে সাক্ষীর কিছুতেই অসুবিধা না হয়, বললাম, "কহিয়ে তো সিপাহিজী, আপ গাভার্মিণ্টকা কনিস্টিবিউলারিমে (Constabulary) কাম করতে হৈঁ?" (বলুন তো সিপাহি মশায়, আপনি গভর্মেণ্টের কন্‌স্টেব্‌ল সঙ্ঘে কাজ করেন?)

অন্ধকার ঘরে ইলেকৃট্রিক বাতির সুইচ নামিয়ে দিলে কক্ষটি যেমন অকস্মাৎ আলোকিত হ'য়ে ওঠে, আমার মুখ থেকে 'আপ' (আপনি) সম্বোধন শুনে ঠিক তেমনিভাবে কন্‌স্টেব্‌লের মুখ প্রসন্নতার আভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই মনে মনে এই ধরনের কিছু ভাবতে লাগল,—দেখ দেখি কাণ্ড। রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত একজন উকিল, খানদানি ঘরের সন্তান, যার অঙ্গের চোগা-চাপকানেরই মূল্য কোন্ না চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা হবে,—আমার মতো একজন নগণ্য সেপাইকে

'আপ' ব'লে সম্বোধন করছে! এ সৌজন্যের পাল্টা আপ্যায়ন না করা অসম্ভব। যথাসম্ভব বিনয়প্রকাশক কণ্ঠে বললে, "জী হুজুর, কানিষ্টিবুলকা কাম করতে হেঁ।" (আজ্ঞে হুজুর, কনস্টেব্‌লের কাজ করি।)

এই হুজুর শব্দটি 'আপ' সম্বোধনের সুদ।

জিজ্ঞাসা করলাম, "জিস্ ওয়কৃথ্ ওকু হুয়া, উস ওয়কৃথ্ আপ উহা হাজির থেঁ, ইয়া কুছ বাদ পঁহুছেঁ?" (যে সময়ে ঘটনা ঘটেছিল, সে সময়ে আপনি ওখানে হাজির ছিলেন, অথবা কিছু পরে পৌঁছেছিলেন?)

সাগ্রহে মাথা নেড়ে কনস্টেব্‌ল বললে, "কুছ বাদ পঁহুছেঁ।" (কিছু পরে পৌঁছেছিলাম।)

প্রশ্ন করলাম, "ওকুকা হালাৎ আপ এক-আধ আদমিসে শুনা? ইয়া বহুৎ আদমিসে?" (ঘটনার বিবরণ আপনি এক-আধ জনের কাছে শুনেছিলেন, অথবা অনেকের কাছে?)

এ পর্যন্ত সাক্ষী পাল্টা-আপ্যায়নের অন্যমনস্কতায় বোধ করি কতকটা আল্‌গা হ'য়েই চলেছিল। সম্ভবত আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্ষে অসন্তোষের কোনো ভ্রূকুটি লক্ষ্য ক'রে ঈষৎ সচেতন হ'য়ে দু-কুল রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে বললে, "নহি হুজুর, দো-চার আদমিসে শুনা।"

অর্থাৎ এক-আধ জনের কাছেও নয়, বহু লোকের কাছেও নয়। কিন্তু আইনের চক্ষে এক-আধ জনও যা, দু-চার জনও তাই, এবং বহু জন হ'লেও কোনো পার্থক্য করে না। সাক্ষীর উপরি-উক্ত উক্তিগুলির দ্বারা প্রধান এজাহারের মূল্যে বেশ খানিকটা ঘাটতি পৌঁছে গিয়েছিল। বাঁ হাতের কনুই দিয়ে আমার দেহে খোঁচা মেরে গিরীশ-বাবু বললেন, "আরে, তুমি তো আচ্ছা ফাজিল ছোকরা দেখছি! 'আপ'

ব'লে ব'লে ওটাকে এমন আহুরে গোপাল ক'রে তুলেছ যে, শেষ পর্যন্ত hostile declare ক'রে জেরা করতে না হয় আমাকে!"

গিরীশবাবু আমার দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেইজন্তে আমিও তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করি। ঈষৎ অবনত হ'য়ে নিম্নকণ্ঠে বললাম, "কি করি বলুন দাদা? আপনার সাক্ষী আমার দিকে যে রকম ভ্রূকুটিকুটিল চোখে তাকাচ্ছিল তাতে ওকে 'তুম্' ব'লে সম্বোধন করতে সাহস হ'ল না। আমি 'তুম্' বললে ও-ও বোধ হয় আমাকে 'তুম্' ব'লেই সম্বোধন করত।"

যে কয়েকজন উকিল কাছাকাছি ব'সে ছিলেন আমার কথা শুনে মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন।

কঠিন পাথরকে 'আপ' ব'লে সম্বোধন ক'রে নরম ক'রে নিয়ে কিছু রস নিষ্কাশিত করতে সেদিন সমর্থ হয়েছিলাম।

কমিশনর ম্যাকিন্‌টশ সাহেবের এজলাসের ব্যাপারটা কিন্তু অন্ত প্রকারের। সেখানে নিছক ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে যে পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, পরে শুনেছিলাম, তারই নাম ট্যাক্ট।

তখন বছর দুয়েক ওকালতি করছি। তার মধ্যে ছোট বড় মাঝারি অনেক মকদ্দমায় কাজকর্ম করার ফলে বিদ্যেবুদ্ধি যত না বাড়ুক, সাহস খানিকটা বেড়েছে। এই তত্ত্বটুকু তখন উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি যে, মকদ্দমা করতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নেহাত অপদার্থ ব'লে মনে না করতে পারলে খানিকটা পদার্থের প্রমাণ দেওয়া চলে।

কিন্তু একদিন সকালে একটা মকদ্দমার নথি আমার হাতে দিয়ে সেজদাদা যখন বললেন, কমিশনরের কোর্টের সেই আপীলটি সেদিন আমাকে করতে হবে, যেহেতু তিনি অন্ত কোনো এজলাসে একটা চলতি মামলায় ব্যাপৃত আছেন, তখন পদার্থতা-অপদার্থতা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত তত্ত্ব

এমন সুদূর দেশে আত্মগোপন করলে যে, তাকে খুঁজে বার করতেই পারি নে। বংশবোনাস্তি কড়া হাকিম এই ম্যাকিন্‌টশ সাহেব। বেঁটে-খাটো স্কচম্যান; পুঁছিয়ে-ছাঁটা গোঁফ এবং মাথার চুল অসম্ভব রকম ছন্দে, হাসি ব'লে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকা উচিত ম্যাকিন্‌টশের মুখ তা আদৌ স্বীকার করে না, সর্বোপরি মেজাজ এমন তিরিক্ষি যে, সব সময়ে যেন সপ্তমেই চ'ড়ে আছে।

এই ম্যাকিনটশের এজলাসে আমাকে আপীল করতে হবে।

মনের অসহায় অবস্থার একটা সুস্পষ্ট ছাপ বোধ করি আমার মুখের উপর আত্মপ্রকাশ করেছিল,—বুঝতে পেরে সেজদাদা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই,—সহজ মামলা। তা ছাড়া, আমরা রেস্‌পণ্ডেন্ট্‌।"

শুনে বিশেষ আশ্বস্ত হলাম না। ম্যাকিন্‌টশের তাড়না খাওয়ার ফলে জেতা মামলা যদি হারতে হয়, তা হ'লে সে লজ্জা রাখবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "অপর পক্ষে উকিল কে আছেন জানেন?"

সেজদাদা বললেন, "চন্দ্রবাবু।"

চন্দ্রবাবু অর্থাৎ চন্দ্রশেখর সরকার,—শুধু ভাগলপুরেরই নয়, তৎকালের সারা বিহার প্রদেশের শ্রেষ্ঠ উকিল তিনি। তাঁর বাগ্মিতার কাছে, তাঁর আইনজ্ঞানের কাছে, তাঁর ঘটনা বিন্যাসের নিকট পরাভব স্বীকার করে না এমন শক্তিশালী মামলা খুব কমই দেখা যায়। তিনি কি তাঁর হারা মামলাকে দয়া ক'রে হারা রেখেই নিরস্ত থাকবেন? এমন প্রত্যাশা তো কিছুতেই করা যায় না।

একবার কলিকাতা হাইকোর্টের একটা খুব বড় আপীলে চন্দ্রশেখর-বাবু কলিকাতায় এসেছিলেন এক পক্ষের পরামর্শদাতা হ'য়ে। ভাগলপুরে তিনি ছিলেন সে পক্ষের প্রধান উকিল। হাইকোর্টে সে আপীলে চন্দ্র-

শেখরবাবুর মক্কেলের পক্ষে বক্তৃতা করবার জন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন তখনকার দিনের কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানতম ব্যারিস্টার সার্ এস. পি. সিংহ, অর্থাৎ পরবর্তী কালের লর্ড সিংহ।

বক্তৃতা করতে উঠে মকদ্দমা আরম্ভ করবার পূর্বে সার্ এস. পি. জজদিগকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "এ মকদ্দমায় আমার সঙ্গে আছেন ভাগলপুর বারের স্বনামধন্ত উকিল বাবু চন্দ্রশেখর সরকার। যে কেসে তিনি নিযুক্ত আছেন সে কেসে আমার বক্তৃতা করা, শুধু অপরাধ নয়, পাপ ব'লে আমি বিবেচনা করি। কিন্তু যেহেতু তিনি উকিল এবং আমি ব্যারিস্টার, সেইজন্ত আমাদের ব্যবসায়-নীতি অনুযায়ী আমি তাঁর সিনিয়ার। সুতরাং তাঁর উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি ব'লে সর্বাগ্রে আমি তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি।"

এত বড় উকিল ছিলেন চন্দ্রশেখর সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে আপীল চালাতে হবে ম্যাকিন্‌টশ সাহেবের মতো দুর্দান্ত হাকিমের এজলাসে!

মনে মনে বিপন্ন বোধ করতে লাগলাম।

কর্তব্যের যে গুরুভার অনিবার্যরূপে মাথার উপর এসে বসেছে, বৃথা হা-হুতোশ্মি না ক'রে তা বহন করবার জন্তে যথাসম্ভব শক্তি আহরণ করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। সুতরাং অকারণ কালক্ষয় না ক'রে মকদ্দমার কাগজপত্র নিয়ে সুদৃঢ় চিত্তে ব'সে পড়লাম।

গভীর মনোযোগের সহিত নিম্ন আদালতের সাক্ষ্যসবুত রায় প্রভৃতি পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার স্বার্থের প্রতিকূলে যেখানে যা নজরে ঠেকে, লাল পেন্‌সিল দিয়ে বিপদের লাল বর্ণে চিহ্নিত করি; অনুকূল বস্তু যত কিছু পাই, চিহ্নিত করি আশ্বাসের নীল পেন্‌সিল দিয়ে। নিম্ন আদালতের রায়কে নাকচ করবার উদ্দেশ্তে পরাজিত পক্ষ যে ওজুহাতনামা (Grounds of Appeal) দাখিল করেছে, তার প্রত্যেকটি ওজেহ্‌কে (হেতুকে) যুক্তি-বিচারের ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত করি।

একটা কথা আছে, একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর। রামচন্দ্ররূপী চন্দ্রশেখর সুগ্রীবরূপী ম্যাকিন্‌টশের দুর্দম যোগের দুশ্চিন্তায় ক্ষণকাল পূর্বে মনের মধ্যে সন্ত্রাসের যে কালো ছায়া দেখা দিয়েছিল, তার পাশে দেখা দেয় উল্লাসের স্তিমিত প্রভা। নিম্ন আদালতে দয়াপরবশ হ'য়ে যে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের শিবিরে এসে প্রবেশ করেছিল, আমার দুর্বল বাহুর বন্ধন ছিন্ন ক'রে সে কি আজ বিপক্ষ শিবিরে গিয়ে যোগদান করবে? কোনো মতেই কি পারব না তাকে আমাদের পক্ষে ধ'রে রাখতে? প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত নিমগ্ন হলাম শক্তি সঞ্চয়ের কাজে।

ক্ষণকাল পরে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মক্কেল এসে উপস্থিত হ'ল। বলা

বাহুল্য যে-আপীলে আমাকে 'বহস্' (বক্তৃতা) করতে হবে, সেই আপীলের মক্কেল। সেজদাদার মুহুরী বৈকুণ্ঠ পাড়ের সহিত দু-চার কথায় আলাপ-আলোচনার পর সে যখন বুঝতে পারলে, অন্ত মামলায় হাল ধরবার উদ্দেশ্যে তার নিজের মামলায় ঝানু মাল্লা অপর এক অর্বাচীন মাঝির হাতে হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন ভরাডুবির দুশ্চিন্তায় অস্থির হ'য়ে উঠল। এই অচিন্তিত বিপর্যয়-জনিত সমস্ত আক্রোশ এসে পড়ল একান্ত নিরপরাধ আমার ওপর। নিজের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে আমিই যেন ব্যাপারটার এই রকম ব্যবস্থা করিয়েছি, এই ধরনের বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে সে দূর থেকে আমার উপর অসন্তোষের অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে উঠে এসে আমার নিকটে একটা বেঞ্চে উপবেশন ক'রে অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, "ইয়ে ক্যায়সা বাত শুনতে হেঁ ওকিল সাহেব?" (এ কেমন কথা শুনছি উকিল সাহেব?)

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা শুনছেন?"

"শুনতেহেঁ হমারা অপীলমে নবীনবাবু বহস্ নহি করেঙ্গে; করেঙ্গে আপ?" (শুনছি আমার আপীলে নবীনবাবু বক্তৃতা করবেন না, করবেন আপনি?)

বললাম, "ঠিকই তো শুনছেন।"

হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে মক্কেল বললে, "ইয়ে তো পুরা মুশকিলকা বাত হুয়া!" (এ তো পুরা মুশকিলের কথা হ'ল!)

একবার ভাবলাম বলি, মুশকিলের কথাটাই যদি তোলো, তা হ'লে যে মুশকিলের ভেলায় তুমি ভাসছ, সেই একই ভেলায় আমিও ভাসছি। কিন্তু সে কথা বললে প্রথমত আমার প্রতিষ্ঠাহানির খানিকটা আশঙ্কা থাকে, এবং দ্বিতীয়ত মক্কেলকে আরও একটু ভাবিয়ে তোলা হয়;

তাই সে কথা না ব'লে বললাম, "কুছ মুশকিলকা বাত নহি হায়; নিশ্চিন্ত রহিয়ে।" (কিছু মুশকিলের কথা নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন।)

"ওকিল সাহেব!"

"কিয়া?"

"ইস্ কাম আপসে হো সকেগা?" (এ কাজ আপনার দ্বারা হ'তে পারবে?)

এ প্রশ্ন তো আমারও একান্ত অন্তরের প্রশ্ন। তবু অপরের মুখ থেকে শুনে একেবারেই ভাল লাগল না। ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "আপনি যদি অকারণ এ রকম ব্যস্ত না হ'য়ে আমাকে তৈরি হবার জন্যে সময় দেন, তা হ'লে না হ'তে পারবার তো কারণ দেখি নে।"

আমার মুখ থেকে এই আশ্বাসের বাণী শুনে মক্কেল বিশেষ আশ্বস্ত হ'ল ব'লে মনে হ'ল না, দুঃখিত কণ্ঠে সে বললে, "অব্ বাবা বুঢানাথ যো করে।" (এখন বাবা বুঢানাথ যা করেন।)

অর্থাৎ, আমার উপর কোনো ভরসাই সে রাখে না, বাবা বুঢানাথ উপস্থিত অবস্থায় একমাত্র ভরসা। আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগল; ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে বললাম, "এক কাম্ কিজিয়ে।" (একটা কাজ করুন।)

কৌতূহলী হ'য়ে মক্কেল বললে, "কৌন্ কাম কহিয়ে?" (কি কাজ বলুন?)

বললাম, "বুঢানাথকা মন্দিরমে যা কর্ হজার বিলপাত বাবাকা মাথেমে চড়হাইয়ে। বাবা আপকা মুকদ্দমা জিতা দেঙ্গে।" (বুঢানাথের মন্দিরে গিয়ে এক হাজার বিল্বপত্র বাবার মাথায় চড়ান। বাবা আপনার মকদ্দমা জিতিয়ে দেবেন।)

বুঢানাথ ভাগলপুর শহরের অধিদেবতা।

কিন্তু তা হ'লে কি হয়! একজন আনাড়ি উকিলের উপর মকদ্দমা ছেড়ে দিয়ে বাবা বুঢানাথের শরণাপন্ন হ'য়ে হাজার বেলপাতা চড়ালে মকদ্দমা-জয়ের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, এতটা আস্থা বাবা বুঢানাথেরও উপর তার ছিল না। তাই আমার এ প্রস্তাবের কোনো উত্তর তার যোগাল না।

দূর থেকে বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে আমাদের বিবাদ-বিতর্ক লক্ষ্য করছিলেন, বোধ হয় কিছু কিছু কথাবার্তাও কানে যাচ্ছিল।

নিকটে উঠে এসে মক্কেলকে বললেন, "বাবুকো ফিজ্ দিয়া?" (বাবুকে ফিস্ দিয়েছেন?)

তখনো পর্যন্ত বোধ হয় বেচারা মক্কেল উপস্থিত অবস্থায় কি করা উচিত মনে মনে স্থির ক'রে উঠতে পারে নি, ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে বললে, "অভি তক তো নহি দিয়া।" (এখনো তো দিই নি।)

ঈষৎ বিরক্তির সহিত পাড়েজী বললেন, "ফিজ্ দে কর্ বাবুকো নিশ্চিন্ত্ সে তৈয়ার হোনে দিজিয়ে। ইয়ে সব ফজুল বাৎচিৎসে ফায়দা পঁহুছেগা কুছ?" (ফিস্ দিয়ে বাবুকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রস্তুত হ'তে দিন। এ সকল বৃথা কথোপকথনে লাভ হবে কি কিছু?)

দুটো অশুভ বস্তুর মধ্যে একটাকে বেছে নেবার যে সঙ্কট-মুহূর্ত, সেই মুহূর্ত মক্কেলের সম্মুখে উপস্থিত। অগত্যা সে বিরক্তি-বিরূপ মুখে কয়েক খণ্ড রৌপ্যমুদ্রা বার ক'রে আমার সম্মুখে স্থাপন করলে।

টাকাগুলো তুলে নিয়ে গুনে দেখে পাড়েজী বললেন, "ইয়ে তো ছও রুপেয়া। বাকি চার রুপেয়া?"

বোধ হয় পাড়েজী দশ টাকা ফিস্ দাবি করেছিলেন। মক্কেল বললে, "চার রুপেয়া পিছে দেঙ্গে।" (চার টাকা পরে দোব।)

বুঝতে আমার বাকি রইল না, মকদ্দমা যদি জিততে না পারি, সেই অপরাধের জরিমানাস্বরূপ ঐ চার টাকা মক্কেল আগাম কেটে রাখলে। সেজদাদা কেস করতে না পারায় আমাদের দিক থেকে একটু অন্যায় করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং পুরা ফিস্ দশ টাকা চুকিয়ে নেবার জন্যে পাঁড়েজী অথবা আমি—কেউ পীড়াপীড়ি করলাম না।

যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হ'য়ে বেলা সাড়ে এগারোটা আন্দাজ বার-লাইব্রেরি থেকে কমিশনরের গৃহের উদ্দেশে নির্গত হলাম। ক্লিভল্যাণ্ড রোডের অপর পার্শ্বে সুবিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে কমিশনরের বৃহৎ অট্টালিকা। তারই একটা অঞ্চল জুড়ে এজলাস এবং অফিসের ব্যবস্থা। বার-লাইব্রেরি থেকে পদব্রজে কমিশনরের গৃহে পৌঁছতে মিনিট দুই-আড়াই সময় লাগে।

বাঘের পিছনে ফেউয়ের মতো এই সময়টা মক্কেল আমার পিছনে পিছনে দৌড়তে থাকে, আর আমাকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বলে, "ওকিল সাহেব, ঘবড়াইয়ে মৎ। পুরা বহস্ কিজিয়ে গা।" (উকিল সাহেব, ঘাবড়াবেন না। পুরো বহস্ করবেন।) সে একটুও বোঝে না, একজন জুনিয়ার অর্বাচীন উকিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যখন ঘাবড়াতে আরম্ভ করেছে, তখন তাকে ঘাবড়াতে নিষেধ করার মানেই হচ্ছে তার ঘাবড়ানোর প্রবৃত্তিকে আরও খানিকটা চাগিয়ে দেওয়া।

এই নাছোড়বন্দ অতি-আগ্রহশীল ব্যক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

ক্ষণকাল পরে কমিশনরের এজলাস-কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখি, সুদীর্ঘ টেবিলের মাঝ-বরাবর উকিল-তারকাগণের মধ্যে 'একশ্চন্দ্রঃ' হ'য়ে চন্দ্রবাবু ব'সে আছেন। সম্মুখে টেবিলের উপর নজিরের ষোলখানা আইন ও নজিরের বই। দুই চক্ষু হ'তে বিকীর্ণ হচ্ছে অসামান্য প্রতিভার জ্যোতি; বোধ হয় কোনো গভীর চিন্তা-সলিলে নিমগ্ন হ'য়ে অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বিরলকেশ দাড়ি চোমরাচ্ছেন। মূর্তি দেখেই বুঝলাম, যে-গাওনা এখনি আরম্ভ করবেন, মনে মনে তারই সুর ভাঁজছেন।

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় স্মিতমুখে বললেন, "কই, নবীনবাবু এলেন না?"

বললাম, "আজ্ঞে না, তিনি আসতে পারবেন না। একটা ফৌজদারী কেসে সাক্ষী-দেবার মধ্যে আটকে পড়ছেন।"

"কে argue (বক্তৃতা) করবে?—তুমি?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।"

প্রসন্নমুখে চন্দ্রবাবু বললেন, "খুব ভাল কথা।"

ভাল কথা কার পক্ষে,—তাঁর পক্ষে, তাঁর মক্কেলের পক্ষে, অথবা আমার পক্ষে, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এজলাস ঘরে আশ্রয় নিয়েও একটু সুস্থ হবার উপায় আছে কি? পিছন দিকে পিঠের উপর মক্কেল ধীরে ধীরে খোঁচা মারছে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে বলি, "কিয়া বাত হায়?" (কি কথা?)

কানের নিকট মুখ নিয়ে এসে মৃদুস্বরে মক্কেল বলে, "তরফসানিকা বকিল ওহনা কিতাব লায়া,—আপ তো একঠো ভি নাহি লায়া?" (শত্রুপক্ষের উকিল অত বই এনেছে, আপনি তো একটাও আনেন নি?)

মনে মনে উত্তর দিই, নিরীহ উকিলের আইন-নজিরের বই থাকে না। তা ছাড়া, তরফসানির উকিল নায়কী কানাড়ার দ্রুপদ গাইবেন, তার মৃদঙ্গ পাখোয়াজের দরকার। আমি চুটকি গাইব, তুড়ি দিয়েই আমার কাজ চ'লে যাবে। প্রকাশ্যে বললাম, "ঘবড়াইয়ে মৎ। তরফসানিকা কিতাবহিসে হমারা কাম্‌ নিকাল লেঙ্গে।" (ঘাবড়াবেন না, শত্রুপক্ষের বই থেকেই আমার কাজ বার ক'রে নোব।)

মিনিট দশেক পরে কমিশনর মিস্টার ম্যাকিনটশ ফোঁস ফোঁস ক'রে এজলাস কক্ষে প্রবেশ করলেন, তারপর নিজেদের মধ্যে বিচারবেদীর উপর উঠে প'ড়ে ধড়ফড় ক'রে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

হাকিম কক্ষে প্রবেশ করলে আমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাকিম আসন গ্রহণ করার পর পুনরায় উপবেশন করলাম।

একরাশ বই সাজিয়ে খাড়া হ'য়ে চন্দ্রবাবু ব'সে আছেন দেখা মাত্র একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির তাড়নায় ম্যাকিন্‌টশের মুখ কালো হ'য়ে উঠল, দুই চক্ষুর ভ্রূ গেল কুঁচকে। আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার মধ্যে ভদ্রলোক দশ-পনেরটা মামলার নির্বাণ ঘটিয়ে এজলাস পরিত্যাগ করেন। অতগুলো বই ব্যবহৃত হ'লে এক চন্দ্রবাবুর মামলাতেই তো ঘণ্টা দুই সময় নষ্ট হবে!

ভাগলপুর বারের চন্দ্রবাবু অবিসংবাদিত অধিনায়ক, তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আইনজ্ঞান এবং অনন্যসুলভ বাগ্মিতার মর্যাদাকে অভিনন্দন জানায় না, এমন দেশী অথবা বিলাতী হাকিম এ পর্যন্ত ভাগলপুরে পদার্পণ করে নি। সুতরাং তাঁর শেষ কথা উচ্চারিত হবার পূর্বে তাঁকে নিরস্ত করা কঠিন কায; এবং সে কঠিন কায সম্পন্ন করবার যোগ্যতাও সুদুর্লভ বস্তু। ম্যাকিন্‌টশ সাহেবের বুঝতে বাকি রইল না, নিজের সহজ স্রোতে নৌচালনার সৌভাগ্য আজ তাঁর অদৃষ্টে নেই।

মিনিট ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে গোটা তিনেক কেস শেষ হ'য়ে গেল। ম্যাকিন্‌টশের পদ্ধতি হাতে হাতে নগদ বিদায়ের পদ্ধতি। অর্থাৎ মামলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে রায় লিখে ফেলে তিনি আপীল ভূতের গয়ার পিণ্ড সারেন।

এবার ডাক পড়ল আমাদের আপীলের। চন্দ্রবাবু উঠে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। সে কি অদ্ভুত অপরূপ বক্তৃতা! নিম্ন আদালতের রায়ের সে কি সাংঘাতিক মারাত্মক বিশ্লেষণ! দেখতে দেখতে মিনিট দশেকের মধ্যে শিথিলগ্রন্থি হ'য়ে সে রায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে আর কি! নিজের কেসের দুর্বলতা এবং অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি ক'রে একটা গ্লানিজনক লজ্জায় আমারই মন ছ্যা-ছ্যা করতে লাগল। কি অসঙ্কতভাবে ফাঁকি

দিয়ে নিচের আদালতের রায়টা বাগানো গিয়েছিল। এমন দুর্বার যুক্তি-স্রোতের সম্মুখে সে বালুকার ন্যায় কতক্ষণ তিষ্টতে পারবে? নিজের যুক্তির সারবত্তায় নিজেই উল্লসিত হ'য়ে চন্দ্রবাবু তাঁর বিচার-বিতর্ককে উত্তরোত্তর আরও সারালো এবং ধারালো ক'রে চললেন।

কিন্তু তাতে কি হয়? এদিকে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। গৌরচন্দ্রিকার আড়ম্বর দেখে আসল পালার দুশ্চিন্তায় ম্যাকিনটশ উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছেন। কখনো এটা টানছেন, কখনো ওটা টানছেন, কখনো এ-ফাইল দেখছেন, কখনো ও-ফাইল দেখছেন, কখনো পায়ের বুট ঘষছেন, কখনো মুখের গোঁফ ফোলাচ্ছেন। অর্থাৎ, আর সকলই করছেন,—করছেন না শুধু চন্দ্রবাবুর বক্তৃতার মর্মগ্রহণের চেষ্টা।

চন্দ্রবাবুও যে সে কথা বুঝতে পারেন নি, তা নয়। বুঝতে পেরে তিনি অবুঝকে বোঝাবার চেষ্টায় আর একবার সাড়ম্বরে আত্মনিয়োগ করলেন। তার ফলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে চলল একটা বিষম পাপচক্রের আলোড়ন। চন্দ্রবাবু ম্যাকিনটশকে বোঝাবার জন্য যত সচেষ্ট হন ম্যাকিনটশ ততই অবুঝ হ'য়ে ওঠেন, আর ম্যাকিনশট যতই অবুঝ হ'য়ে ওঠেন চন্দ্রবাবু ততই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

অবশেষে আর একবার শেষ চেষ্টা দেখে হতাশ এবং বিরক্ত হ'য়ে চন্দ্রবাবু যখন আসন গ্রহণ করলেন, তখন আমি কাঁপছি। ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে খোঁচাখুঁচি ক'রে তিনি যে মৌচাককে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন, চন্দ্রবাবু ব'লেই রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু তার সমস্ত কামড়টা যে আমার দেহে পড়বে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

বিপদে প'ড়ে কিন্তু তৎক্ষণে আমার মনে সাধু বুদ্ধিও বহির্গতা হয়েছে। এ ঔষধ যদি কাজে লাগল তবেই রক্ষে। নইলে সমূহ বিপদ—আমারও, আমার মক্কেলেরও।

দাঁড়িয়ে উঠে চেয়ে দেখি, সে যেন মানুষের মুখই নয়, একটা টক্‌টকে পাকা আপেল। মনে হ'ল, দুই ভুরুর চুল যেন ফুলে উঠেছে।

বললাম, "Your Honour, my friend on the otherside has made a mountaiu of a molehill. I won't take more than five minutes in arguing mv part of the case." (হুজুর, ও-পক্ষের আমার বন্ধু একটি ছুঁচোর ঢিবিকে পর্বত ক'রে তুলেছেন। আমার অংশটুকু নিবেদন করতে আমি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নোব না।)

তাকিয়ে দেখি, টক্‌টকে আপেল একটু যেন সবুজ মেরে এসেছে,—ভুরুর চুলও খানিকটা যেন শান্ত হ'য়ে নেমেছে। উৎসাহিত হ'য়ে বললাম, "The case is a very simple one. There are only three points in this case." (মামলাটি অতিশয় সরল। এই মামলায় মাত্র তিনটি সূচিকা (point) আছে।)

দেখি, ম্যাকিনটশ একটা কাগজে কি যেন লিখতে আরম্ভ করেছেন, আর মৃদুস্বরে বলছেন, হুঁহুঁ....হুঁহুঁ....হুঁহুঁ। এই হুঁহুঁ..হুঁহুঁ....হুঁহুঁ-র মধ্যে যেন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে একটা পরিপূর্ণ প্রশান্তির স্নিগ্ধ আমেজের। তা হ'লে আগুনে জল পড়েছে।

বললাম, "My first point is so on .."

হুঁহুঁ....হুঁহুঁ....হুঁহুঁ

"My second point is so on .."

হুঁহুঁ .. হুঁহুঁ .. হুঁহুঁ

"My third point is so on ...

হুঁহুঁ....হুঁহুঁ...হুঁহুঁ

My submission is that, on the strength of these

three points, the appeal should be dismissed with cost. (আমার নিবেদন, এই তিনটি সূচিকার (point) জোরে আপীলটি মায় খরচা ডিস্‌মিস হবার উপযুক্ত।)

হুঁ হুঁ...হুঁ হুঁ...হুঁ হুঁ...

বলেছিলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। কার্যত তা অবশ্য হ'ল না। মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ ক'রে ব'সে পড়লাম।

কিন্তু ব'সে কি নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে! পিছন দিক থেকে আমার মক্কেল কোমর ধ'রে ঠেলে তোলে আর কি।

"হায় বাপ ওকিল সাহেব। আপ্‌তো কুছভি নহি বোলা!" (হায় বাপ উকিল সাহেব, আপনি তো কিছুই বললেন না!)

ওদিকে ততক্ষণে ম্যাকিনটশের হাত থেকে রায় নিয়ে পেশকার চন্দ্রশেখরবাবুকে দিচ্ছেন। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত রায়,—যে পাতায় আরম্ভ সেই পাতাতেই শেষ। পড়া শেষ হ'লে আমার হাতে রায়টা দিতে দিতে মুখ নিচু ক'রে চশমার উপর দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে চন্দ্রবাবু বললেন, "Upendra, you have taken advantage of my weakness." (উপেন্দ্র, তুমি আমার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছ।)

চন্দ্রশেখরবাবুর তখনকার মুখের ছবিটি আজও আমার মনে সুস্পষ্ট-ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। বোধ হয় জীবনের বাকি কয়েকদিনও থাকবে।

উকিলদের ভাবে-ভঙ্গিতে, অপর পক্ষের মক্কেলদের বিমর্ষ মুখের রেখা পাঠ ক'রে, আমার মক্কেল বুঝতেই পেরেছিল তার জয় হয়েছে। তথাপি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কিয়া হুয়া ওকিল সাহেব?"

বললাম, "অপীল মায় খরচা ডিস্‌মিস্‌ হুয়া। আপ জিত গয়ে।"

আমার বাকি ফিস্‌ চার টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, একটা শুক ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে 'জয় বাবা বুঢ়ানাথ!' ব'লে তিন লাফে এজলাস-ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

প'ড়ে দেখলাম রায়টা ঠিক এই রকম—

The case is a simple one. There are only three points in this case. The first point is so on... The second point is so on··· The third point is so on···· On the strength of these three points the appeal is dismissed with cost.

রায় প'ড়ে মনে মনে না হেসে থাকতে পারলাম না। এ একেবারে যৎ বলিতং তং লিখিতং। এখন আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, ইংরিজী হুঁ হুঁ মানে বাংলা হাঁ-হাঁ। আমি যা বক্তৃতা করেছি, হুঁ-হু ক'রে হোক, অথবা হু হু ক'রেই হোক, ম্যাকিনটশ সাহেব অবিকল তা লিখে গেছেন। প্রায় হুবহু।

একটা জমাট-ঘন খুশি মনের মধ্যে বহন ক'রে এজলাস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। চার টাকা অনাদায়ের জন্য মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ করছিলাম না। ম্যাকিনটশের এজলাসে চন্দ্রশেখরবাবুর বিরুদ্ধে জয়লাভের চার সহস্র টাকার আনন্দে সে দুঃখ ডুবে ম'রে গিয়েছিল।

সেদিন তো মক্কেলের দেখা পাই-ই নি, পরে আর কোনোদিন পেয়েছিলাম ব'লে মনে পড়ে না। মনে হয়, একজন আনাড়ি উকিল সত্ত্বেও মকদ্দমায় জয়লাভ হওয়ার কৃতজ্ঞতায় ঐ চার টাকা দিয়ে সে বাবা বুঢ়ানাথের পূজা চড়িয়েছিল।

আমার প্রথম রচনা কি, অর্থাৎ আমার কোন্ লেখা সর্বপ্রথম ছাপাখানার ধাতু-অক্ষরের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হ'লে আমি নিঃসন্দেহে বলব—"সন্ধ্যা" নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা। আজ হ'তে সুদীর্ঘ সাতান্ন-আটান্ন বৎসর পূর্বের ধুসর অতীতের কোনো একদিনে উক্ত কবিতাটি ছেলেদের এক মাসিক পত্রিকায় দেখা দিয়েছিল। মাসিক পত্রিকাটির নাম ঠিক ক'রে বলা আজ আমার পক্ষে কঠিন; তবে, 'সাথী', 'সখা ও সাথী' ও 'মুকুল'—তৎকালীন-প্রচলিত এই তিনটি ছেলেদের কাগজের মধ্যে কোনো একটিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সে কথা বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে না।

যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটি পয়ার ছন্দে রচিত, আর আয়তনে চোদ্দ কিংবা ষোল লাইনের বড় নয়। মাসিক পত্রের বাঁ-হাতি পৃষ্ঠার তলার দিকে কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল, এমন ছবিও স্মৃতির পটে অঙ্কিত হ'য়ে দেখা দেয়। "সন্ধ্যা" শীর্ষলিপির নিম্নে ব্র্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে ছিল কবিতাটির বিষয়ে কৌতুকোদ্দীপক তথ্য—"বারো বৎসর বয়স্ক বালকের রচনা", আর কবিতার প্রান্তদেশে মুদ্রিত ছিল সে পৃষ্ঠার সর্ব-প্রধান চিত্তাকর্ষক বস্তু: শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অর্থাৎ কবির অভিধা।

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় বাস করি। কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম, কিন্তু লেখার পর ভাল লাগত না; হয় ছিঁড়ে ফেলতাম, নয় অবহেলার অভিমানে তারা নিজেরাই গা-ঢাকা দিত। বালক-কবির উদ্যম এবং ব্যর্থতার পৌনঃপুনিকতা দেখে একদিন বোধ

হয় পূর্ণিয়ার সন্ধ্যাদেবীর করুণা হ'ল ; অক্ষম কলমের ডগা দিয়ে এমন একটু সহানুভূতিশীলা হ'য়ে কাগজের উপর তিনি অবতরণ করলেন যে, প'ড়ে দেখে একটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জাগ্রত হ'ল। সযত্নে নকল ক'রে গোপনে সকলের অগোচরে "সন্ধ্যা"কে কলিকাতায় পত্রিকার কার্যালয়ে দিলাম পাঠিয়ে।

মাসের ত্রিশটি দিন অধীর অপেক্ষায় যাপন করি। কাগজ এলে তাড়াতাড়ি মোড়ক ছিঁড়ে সূচীপত্রের উপর চোখ বুলোই,—নেই। সূচীপত্রে নাম ছাপতে ভুল হ'তেও পারে, প্রত্যেক পাতাটি উল্টে-পাল্টে দেখি—নেই। তিন-চার মাস ঠিক একই ব্যাপার ঘটায় মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, পূর্ণিয়ায় ব'সে যে-কার্য আমার করা উচিত ছিল, কলকাতায় ব'সে সম্পাদক মশায় সেই কার্যটি নিজে করেছেন ; অর্থাৎ কবিতাটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

মনের অবস্থা তখন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ফেরা ক্ষ্যাপার মতো। কাগজ এলে মোড়ক খুলে অভ্যাসবশে সূচীপত্রের ওপর একবার অসতর্ক আলগা দৃষ্টি বুলোই,—বেশ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করি নে। সকলেরই অদৃষ্টলিপিতে কবিখ্যাতি লেখা থাকে না —মনকে সে কথা একরকম বুঝিয়েছি।

মনের যখন এই রকম প্রশমিত-স্তিমিত অবস্থা, একবারকার কাগজের সূচীপত্র দেখতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠি! এ কি কাণ্ড বটে! নাম যে বেরিয়েছে দেখা যায়! বিশ্বাস সহসা যেন ধরা দিতে চায় না! পাতার অঙ্কটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বইয়ের ভিতরকার পাতাটা খুলি। প্রথমেই চোখে পড়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে দুই চক্ষু। মনে মনে তখন কোনো আনন্দের ধ্বনি উচ্চারিত ক'রে উঠেছিলাম কি-না মনে নেই,—ইংরেজ বালক হ'লে বলতাম, হুর্‌রে।

প্রথমবার তাড়াতাড়ি সমস্ত কবিতাটা প'ড়ে যাই, দ্বিতীয়বার ধীরে ধীরে পড়ি, তারপর বার দুই মধ্য লয়ে। প্রতি পাঠের শেষে চোখ দুটো ক্ষণকাল "শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র উপর আঁকড়ে ব'সে থাকে। আশ্চর্য কাণ্ড! ছাপাখানার ভদ্রলোকটি একটির পর একটি ক'রে সাজিয়েছেন আমারই নামের অক্ষরগুলি! আমারই নামের,—সযত্নে একটি একটি ক'রে ধৈর্যসহকারে, নির্ভুলভাবে। তারপর কাগজের উপর ছাপা হ'য়ে হাজার হাজার সংখ্যায় দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা বিস্মিত-উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছে "সন্ধ্যা" কবিতার কবি শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম আবির্ভাব-লিপির উপর। কাণ্ড আর কাকে বলে!

ক্ষণকাল পরে বউদিদির হাতে পত্রিকাখানা দিলাম,—বলা বাহুল্য, সেই বিশেষ পৃষ্ঠাটি খুলে রেখে। আমার নামের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্মিতকণ্ঠে বউদিদি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কে উপীন?—তুমি?"

কোনো উত্তর না দিয়ে বউদিদির দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগলাম। বউদিদি জানতেন আমার কবিতা লেখার বাতিক আছে,—উৎফুল্ল মুখে ছুটলেন মাকে শোনাতে। অবিলম্বে সকলেরই কানে কথাটা উঠল। আমাদের গাঙ্গুলী-পরিবারের ইতিহাসে ছাপার অক্ষরে লেখা প্রকাশিত হওয়া সেই প্রথম। সংসারে একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হ'ল। পিতৃদেব আনন্দের হাসি হাসলেন, মা আশীর্বাদ করলেন, দাদা পিঠ চাপড়ে দিলেন, আর বউদিদি অবিরত প'ড়ে প'ড়ে কবিতাটা প্রায় কণ্ঠস্থ ক'রে ফেললেন।

বিকালে বয়স্যদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বললাম, "একটা বেরুলো।"

উৎসুক হ'য়ে তারা জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

বললাম, "কবিতা।" তারপর মাসিক পত্রখানা তাদের হাতে দিয়ে গম্ভীর হলাম। গম্ভীর না হ'য়ে উপায় ছিল না, কারণ তখন তো আমি আর একেবারে সাধারণ মানুষ নই। তখন বাংলা দেশের লেখকের তালিকায় আমার নাম লিখিয়ে নিয়েছি। তখন আমি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। লেখক ব'লে কলকাতার ছাপাখানা আমাকে স্বীকার করেছে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রকম হৃদয়ঙ্গম করার পর বন্ধুরা হর্ষ-ঈর্ষা-বিস্ময়-মিশ্রিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইল। একটা দিকে আমি যে তাদের নাগালের অনেকখানি বাইরে চ'লে গেছি, এ কথা বুঝতে তাদের বাকি থাকে নি।

রাত্রে শোবার সময়ে সকলের অলক্ষিতে পত্রিকাটি কাছে নিয়ে শয়ন করলাম। এ কথা স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের মতো শেষবার আমার নামটি দেখে নিয়ে পত্রিকাটি বালিশের তলায় রেখে তবে নিদ্রাগত হয়েছিলাম; আর, পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথম কাজ ক'রেছিলাম পত্রিকাটি বালিশের তলা থেকে বার ক'রে চুপিসাড়ে আমার নামটির উপর দৃষ্টিপাত করা।

সে একদিন গেছে।

"সন্ধ্যা" কবিতা প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত লেখা লিখেছি, প্রায় সবই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু "সন্ধ্যা" প্রকাশিত হওয়ায় মনের মধ্যে যে অপরিমেয় আনন্দ পেয়েছিলাম, তার সামান্য ভগ্নাংশও পরবর্তী কোনো রচনার প্রকাশে পাই নি। আজকাল যা-কিছু আনন্দ পাই, একমাত্র তা লেখবার সময়েই পাই। তারপর সে লেখা যখন প্রকাশকের প্রসাধন-গৃহ হ'তে সেজে-গুজে ভব্য হ'য়ে বেরিয়ে আসে, তখন একবার হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখেই নিরস্ত

হই। এখন সে-লেখা বালিশের তলায় নিয়ে শুলে সারারাত্রি অস্বস্তির উৎপাতে অনিদ্রায় কাটানো ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

পূর্ণিয়ায় অবস্থানকালে কাব্যচর্চার রূপ ধারণ ক'রে যে সাহিত্য-সাধনা শীর্ণ ধারায় আরম্ভ হয়েছিল, ভবানীপুরে এসে সাউথ সুবার্বন স্কুলের উচ্চ দিকের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তা স্ফীততর আকার ধারণ করলে। ছাত্র সমিতি নামে একটি মিলনকেন্দ্র গঠিত ক'রে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করলাম। ছাত্র সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নলিনীমোহন শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র ঘটক, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেন, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের এই যৌথ সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত চার বৎসরের আট খণ্ডের 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকা অবলম্বন ক'রে। 'সাধনা' প্রকাশিত হ'ত কলিকাতা জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ি হ'তে। নামে সম্পাদক না হ'লেও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'সাধনা'র অস্থি এবং রক্ত। বিষয়বস্তুর ষোল আনার মধ্যে বারো আনা থাকত তাঁর রচনা। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমরা বন্ধুরা একত্র হ'য়ে 'সাধনা'র পাতা খুলে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করতাম। একজন ধীরে ধীরে প'ড়ে যেত এবং বাকি সকলে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করত। তারপর চলত আলোচনা, এমন কি, সময়ে সময়ে সমালোচনাও।

দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা 'সাধনা'র নিকট পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। তার ফলে সাহিত্য বিষয়ে আমাদের ধারণা যত না বিস্তৃত হয়েছিল, গভীর হয়েছিল ততোধিক। গভীর যে হয়েছিল, তার বাহ্য প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি, মূল্যবান মজবুত চামড়ায় বাঁধানো আট খণ্ড 'সাধনা' আমাদের

ব্যবহারের এবং দুর্ব্যবহারের ফলে ছিন্ন অবসন্ন দেহে দ্বিতীয় বার দপ্তরী-বাড়ির হাসপাতালে যাত্রা করার উপযুক্ত হয়েছিল। 'সাধনা' নিয়ে সাধারণত আমরা পঠন-পাঠনই করতাম, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়ে সময়ে ব্যবহারের তারতম্যও যে দেখা যেত না, এমন নয়। পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য আমাদের মধ্যে একজন হয়তো গান ধরত, আর অপর একজন উৎসাহিত বোধ ক'রে দু খণ্ড পুষ্ট 'সাধনা' টপ ক'রে কোলে তুলে নিয়ে বাঁয়া-তবলা বিবেচনায় সংগত আরম্ভ করত। আমাদের মধ্যে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়েরই বাঁয়া-তবলা বাজাবার কতকটা অভ্যাস ছিল, 'সাধনা' বাজাতেন তিনিই। আর গান গাইতে হ'ত ছাই ফেলতে একমাত্র ভাঙা কুলো আমাকেই। সাহিত্য সমিতির অন্যতম গায়ক সতীশচন্দ্র ঘটক তখনো সমিতির সদস্য হন নি।

কখনো বা দীর্ঘকাল পাঠের পর ক্লান্তি বোধ করলে যে কয়েক খণ্ড 'সাধনা' ফরাসের উপর পাড়া থাকত, এক একটা টেনে নিয়ে বালিশ ক'রে মাথার তলায় দিয়ে শ্রান্তি অপনোদন করা যেত। তবলা বাজানো এবং বালিশ করা—এই দ্বিবিধ বিলক্ষণ আচরণের ফলে চামড়া অতিশয় মজবুত এবং বাঁধাই অত্যন্ত দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও 'সাধনা'র পাতাসমূহের সংহতি বজায় থাকতে পারে নি।

'সাধনা'র পালা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্কুলের পালা শেষ ক'রে প্রবেশিকা পরীক্ষার, অর্থাৎ তখনকার এন্ট্রান্স পরীক্ষার, বেড়া ডিঙিয়ে কলেজের এলাকায় প্রবেশ করলাম। নিতান্ত ঘরোয়া বৈঠকে এতদিন যে সাহিত্য-সাধনা চলেছিল ইচ্ছাসুখের কতকটা এলো-মেলো ছন্দে, একটা ধরাবাঁধা কাঠামোর উপর তাকে মূর্তি দান করবার কল্পনা উদিত হ'ল। সে কল্পনা রূপান্বিত হ'তে বিলম্ব হ'ল না। ১৩০৭

সালের চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কলিকাতা ভবানীপুরের বহুখ্যাতি অর্জয়িত্রী "সাহিত্য-সমিতি"।

যে কিশোর উদ্যম এতদিন সাহিত্য বৃন্দাবনের পথে মাঠে-ঘাটে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াত, জাঁকজমকের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে চতুর্দিকে সে ডাক লাগিয়ে দিলে। সপ্তাহে সপ্তাহে চলতে লাগল সাধারণ অধিবেশন, বৎসরে বার-দুই বিশেষ অধিবেশন এবং সমিতির বর্ষশেষে একদিন বার্ষিক উৎসব। আমাদের বার্ষিক উৎসবে ও নববর্ষের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হবার জন্য কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক উৎসুক হ'য়ে থাকতেন। সঙ্গীতে আবৃত্তিতে ও পাঠে আমাদের প্রত্যেক উৎসব সভা অপরূপ শ্রী ধারণ ক'রে শোভনীয় হ'য়ে উঠত। সাহিত্য-সমিতির গান ও সুর সে সময়ে কলিকাতা শহরের মধ্যে অপরিমিত খ্যাতি অর্জন করেছিল। আমরা আমাদের উৎসব-অধিবেশনে কখনো অপরের রচিত গান ব্যবহার করতাম না। প্রত্যেক উৎসবে আমরা নূতন নূতন গান রচিত করতাম, নিজেরা সুর দিতাম এবং নিজেরাই গাইতাম।

একবারকার বার্ষিক সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন দেশবরেণ্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সভা বসেছে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রশস্ত হলে। ভিতরে দ্বিতলের অলিন্দে সতীশচন্দ্র এক ও আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাচ্ছি। অস্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারী শেষ ক'রে আমরা আভোগ ধরেছি,

ঐ হের পথরেখা,
হে পথিক চল, চল!
চঞ্চল চল নভে সমীরণ উচ্ছল।

তরু-মর্মরে জাগে চল চল সুরে গীতি,
দুর্বার গতি ছন্দে
দূর কর জড়তাকে ॥

ইংরেজনিপীড়িতা পরাধীনা দেশজননীর উদ্ধারকল্পে সমস্ত দেশ তখন তড়িতান্বিত হ'য়ে রয়েছে। আমাদের চিন্তায় মননে তড়িৎ, চলনে বলনে তড়িৎ। গান শেষ হওয়ামাত্র উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, "আবার গাও। আবার গাও।"

আমরা ধরলাম,

ঐ হের পথরেখা,
হে পথিক, চল চল।

পুনরায় দাঁড়িয়ে উঠে শাস্ত্রী মহাশয় গর্জন ক'রে উঠলেন, 'শুধু শেষ-টুকু নয়, আগাগোড়া—সমস্ত"

তখন আমরা উৎফুল্ল মনে গাইতে আরম্ভ করলাম,—

শোন রে শোন রে সবে,
শোন রে, আজি কে ডাকে!
মাতার কণ্ঠ শুনি
থেকো না ভুলিয়া মাকে।
পূর্বগগন-ভালে
ফুটেছে উষার হাসি,
অরুণ আলোক জাগে
সঘন আঁধার নাশি',
জাগ, জাগ ভাই সবে,
জাগ হে ভারতবাসী,

স্বপনের মোহ ছাড়ি
বিনাশো হে, তমসাকে।
বৃথা কাজে দিন বাহি'
বৃথা যাপি' দিনরাত্রি
এতদিন ভ্রমিয়াছি
মিথ্যা-পথের যাত্রী।
ঐ হের পথরেখা,
হে পথিক, চল চল।
চঞ্চল-চল নভে
সমীরণ উচ্ছল।
তরু মর্মরে জাগে
চল চল সুরে গীতি,
তবার গতি ছন্দে
দূর কর জড়তাকে॥

সে এক অদ্ভুত দিনের কাহিনী! সুদীর্ঘ দেড় শত বৎসরের তামস নিদ্রা থেকে জেগে ওঠবার জন্য ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলা দেশ, তখন আড়ামোড়া ভাঙতে আরম্ভ করেছে। দাসত্বের দুর্বিষহ নাগপাশ ছিন্ন ক'রে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায় তার দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা স্ফীত। তখনকার দিনের সেই নিঃস্বার্থ নিরলস কঠোর তপশ্চর্যার কথা স্মরণ করলে জীবন-সায়াহ্নের এই অবসন্ন প্রাণও উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে।

এখন দিন-কাল বদলে গেছে। এখন আর সেই কঠোর তপশ্চর্যাও নেই, সেই পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গও আত্মগোপন করেছে। তখন ছিল খাদ্য আহরণের জন্য দুই বাহুর দুর্বার সংগ্রামের দিন; এখন খাদ্য আহৃত হয়েছে, দুই বাহু এখন নিষ্ক্রিয়। এখন সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে উদর,—

সর্বস্ব গ্রাসের লোভে, আর, সর্বস্বের বৃহত্তম অংশই আজকাল পরস্ব। আজকাল 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। অতিলোভের কালো পাইপের মধ্য দিয়ে আত্মগোপন ক'রে আজকাল নিম্নবিত্তের ধন বিত্তশালীর ঘরে উঠছে। নিম্নবিত্ত বললাম, কারণ চোরা-কারবারের কালো পাইপের শোষণ-ক্রিয়া ইতিমধ্যেই মধ্যবিত্তকে নিম্নবিত্ত ক'রে এনেছে। আর কিছুকাল মহাজনদের এই কৌতুক-কার্য চলতে থাকলে নিম্নবিত্তও কাঙালে পরিণত হবে।

অবান্তর কথা থাক্। আমাদের সাহিত্য-সমিতির ঠমক দেখে অভিভাবকদের অনেকের মনে চমক লাগল। অনেকে অবশ্য খুশিও হলেন। কিন্তু যে প্রচেষ্টা পরিণামে টাকা আনা-পয়সারূপী অর্থের আমদানি করে না, সে প্রচেষ্টা নিরর্থক প্রচেষ্টা ব'লে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা হলেন বিচলিত। তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র সেই সাহিত্য প্রচেষ্টাই সার্থক, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পক্ষে মাত্র যথেষ্ট। অর্থাৎ, যে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অর্থোপার্জনের পক্ষেই সাহায্য করে।

অন্নবস্ত্রকেন্দ্রিক সংসারের বস্তুধর্মী মন নিয়ে তাঁরা একমাত্র নিরেটেরই বিশ্বাসী ছিলেন, ফাঁকার নয়। ফাঁকা অর্থে তাঁরা মনে করতেন ফাঁকি। এ কথা একবারও ভাবতেন না যে, মৃত্তিকা জলে গঠিত বিন্দুবৎ এই ধরিত্রীর চতুর্দিকে সীমা-পরিসীমাহীন মহাব্যোমের ফাঁক যদি না থাকত তা হ'লে শুধু জীব-জন্তুই নয়, বোধ করি পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত দম আটকে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মারা পড়ত। উপনিষদের ঋষিরা তেমন কথা ভাবতেন ব'লেই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন, 'কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'—কেই বা শরীর চেষ্টা করত, আর কেই বা জীবিত থাকত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকত। জীবনধারণের

জন্য তাঁরা নিরেট পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে ফাঁকা আকাশের আনন্দের দিকে দৃষ্টি চালনা করতেন।

সজীব করবার সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপায় নিয়ে আমরাও আমাদের সাহিত্য সমিতিকে পরিব্রত করতাম গীতবাদ্য উৎসব আয়োজনের ফাঁক দিয়ে, যে ফাঁকের মধ্যে বাস করত সেই আনন্দ যার দ্বারা 'জাতানি জীবন্তি',—অর্থাৎ জাতরা জীবিত থাকে।

কার্যগতিকে দিকে দিকে আমাদের স'রে যাওয়ার পর আমাদের যে অগ্রজ গোষ্ঠীর উপর সাহিত্য-সমিতি পরিচালনার ভার পড়েছিল, বেশি দিন তাঁরা সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। আমি তখন ওকালতি ব্যবসায়সূত্রে ভাগলপুরে গিয়েছি। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে কচিৎ কদাচিৎ সাহিত্য-সমিতির সংবাদ পেতাম। শুনেছিলাম আমাদের পরবর্তী দল আনন্দের দিক খানিকটা কমিয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার দিক কতকটা বাড়িয়ে সমিতির মধ্যে একটু পরিবর্তন আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রবন্ধ এবং আলোচনার বাহুল্য ও উৎকর্ষের অসমঞ্জসতাতে দম বন্ধ হ'য়ে সমিতির অপমৃত্যু ঘটেছিল—এমন কথা আমি নিশ্চয় বলছি নে। তবে যে গাছ থেকে লোকে বরাবর যে ফল পেয়ে এসেছে, সে গাছে সে ফল বন্ধ হ'লে অথবা হ্রাস পেলে গাছের আকর্ষণ-শক্তিরও লাঘব হয়।

আমাদের সময়ে সাহিত্য সমিতি থেকে 'তরণী' নামে একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। 'তরণী'র কথা পূর্বে আমি অল্প কিছু লিখেছি। সৌরীন্দ্রমোহন ও আমি 'তরণী'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম। 'তরণী'র আমি যদি দেহ ছিলাম তো সৌরীন ছিলেন প্রাণ।

সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত অবসরের মধ্যে দুর্ঘটনায় কম পড়তে হয় নি; কিন্তু তন্মধ্যে মৃত্যু সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিরে গিয়েছিল বার দুই। ফিরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দিয়ে গিয়েছিল এমন অপূর্ব অনুভূতির অভিজ্ঞতা, নিপুণতম অভিব্যক্তির দ্বারাও যে অনুভূতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের প্রতিদিবসের জীবনের পরিচিত মনোবৃত্তি অথবা মনোবৃত্তিনিচয়ের রঙ দিয়ে সেরূপ অনুভূতিকে অঙ্কিত করা চলে না। অনাস্বাদিত ফলের আস্বাদ যেমন বর্ণনার দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

সে অনুভূতির মধ্যে ত্রাস হয়তো খানিকটা ছিল, কিন্তু সে ত্রাস ঠিক আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ত্রাস নয়, দুঃখ যা ছিল, তা-ও অপরিচিত শ্রেণীর দুঃখ; এমন কি বৈরাগ্য বলতে সাধারণত আমরা যে ঔদাসীন্য অথবা উপেক্ষার কথা বুঝি, সে অনুভূতির বৈরাগ্য ছিল তদপেক্ষা উদাস এবং নিরানন্দ এক স্বতন্ত্র গোত্রের বৈরাগ্য।

আমার প্রথম অভিজ্ঞতা পূর্ণিয়ায় অবস্থানকালে সর্পদংশনের অভিজ্ঞতা। মৃত্যুর সুদৃঢ় প্রস্তাব বহন ক'রে এনে যিনি সেদিন আমাকে অনুগৃহীত করেছিলেন, তিনি অবশ্য অহিরাজ গোক্ষুর ভিন্ন অকুলীন কোনো সর্পই ছিলেন না, কিন্তু আমি ছিলাম নিতান্তই বালক, তাই হয়তো সেদিনকারকার ঘটনার গুরুত্ব যথার্থ মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারি নি। কিন্তু দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কালে আমি ভাগলপুরে ওকালতি করি, বৃদ্ধা জননী এবং স্ত্রী-পুত্র কন্যা সমন্বিত একটি নাতিক্ষুদ্র সংসার-তরণীর তখন আমি পরিণত বয়সের মাঝি, সুতরাং নানা বস্তুকে

অবলম্বন ক'রে আমার অনুভূতি সেদিন বিস্তৃত এবং গভীর হ'তে সক্ষম হয়েছিল। সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথাই প্রথমে বলি।

একটা ফৌজদারি মামলায় প্রজাদের পক্ষে আমি উকিল; অপর পক্ষ পরাক্রান্ত জমিদার রাজ বনেলী। মামলার হাকিম সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেশবচন্দ্র রায় সরেজমিন তদন্তের (local enquiry) তারিখ ফেলেছেন। অকুস্থান গঙ্গা নদীর উত্তর পারের এক মৌজার সংলগ্ন ভূমি। সেখানে উপনীত হবার উপায় নৌকা অথবা অপর কোনো জলযানে মাইল সাতেক ভাটিয়ে গিয়ে গঙ্গার উত্তর উপকূলে অবতরণ ক'রে স্থলপথে মাইল তিনেক উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া। স্থলপথে যেতে গুটি দুয়েক অতি ক্ষুদ্র নদী পড়ে। এ নদীগুলি উত্তীর্ণ হ'তে কোনো জলযানের প্রয়োজন হয় না, জানু পরিমাণ জল, বস্ত্র একটু সামলে নিয়ে পদব্রজেই পার হওয়া চলে।

ভাগলপুরে আমাদের একটি নামহীন মিলন-সঙ্ঘ ছিল, যার কথা পূর্বে কিছু কিছু বলেছি। এই সঙ্ঘের চাঁদা ছিল না, খাতাপত্র ছিল না, সদস্যসংখ্যাও আট-দশ জনের অধিক ছিল না, সুতরাং বিভূতি ছিল না। কিন্তু এই বিভূতিহীনতার ক্ষতিপূরণ হয়েছিল এর গভীরতার দ্বারা। আমাদের একতা বহুত্বকে হার মানিয়েছিল।

সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বায় আমাদের দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন, এবং স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী কালে আমাদের দলের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। আমাদের দলের দলপতি ছিলেন ভাগলপুরের কমিশনারের পার্সনাল অ্যাসিস্টাণ্ট রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস। যে বহুবিধ কারণে ইনি দলপতি হবার যোগ্য ছিলেন, তার অন্যতম কারণ ছিল সদস্যদের দক্ষিণহস্তগুলিকে ব্যাপৃত এবং প্রসন্ন রাখবার বিষয়ে এঁর প্রবৃত্তির প্রাচুর্য। অধিবেশন

বসবার আমাদের দুটি কেন্দ্র ছিল,—প্রথমত, আমার গৃহের বৈঠকখানার ফরাসে মাঝে মাঝে ; এবং দ্বিতীয়ত, অমরেন্দ্রনাথের গৃহের গঙ্গাতীরবর্তী কম্পাউণ্ডের শ্যামশষ্পের আস্তরণের উপর সর্বদা। সম্মুখে বইতে থাকত সাগরাভিমুখগামিনী একটানা ভাগীরথী নদী, মাথার উপর সুনীল স্নেহে তাকিয়ে থাকত উন্মুক্ত আকাশ এবং যে-কোন মুহূর্তে গঙ্গাগর্ভে আত্ম-সমর্পণ করবার জন্য অদূরে অপেক্ষা করত ক্ষয়িতমূল হেলে-পড়া সেই সাহিত্যপ্রসিদ্ধ অশ্বত্থগাছ, যার শিকড়দেশে বাঁধা ডিঙি খুলে নিয়ে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ ভাগলপুরের বর্ষাকালের উত্তাল গঙ্গার মধ্যে পাড়ি জমাত।

আমাদের এই চিত্তাকর্ষক দলটির সহিত পরামর্শ এবং যুক্তি ক'রে কেশববাবু সরেজমিন তদন্তের তারিখ ফেলেছিলেন এক ছুটির দিনে। আমরা মতলব করেছিলাম, মকদ্দমার দল এবং আমাদের মিলন সঙ্ঘের দল, দুটি দল একত্র হ'য়ে একটি সুবৃহৎ দল বেঁধে সমারোহের সহিত জলাভিযানে যাত্রা করা যাবে ; এবং পরপারে উপনীত হ'য়ে সরেজমিন-তদন্তের দল তদন্তের কাজ সম্পন্ন ক'রে ফিরলে গান-বাজনা, আহার চা-পান, কৌতুক-আনন্দের মধ্য দিয়ে আকাশ পথে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আমাদের জলযান ভাগলপুরের অভিমুখে পক্ষ বিস্তার করবে।

দুটি হাকিমের কথা যেখানে বর্তমান, মক্কেলদের দিক হ'তে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এক ষ্টিমার কোম্পানি একখানা ছোট সাইজের ষ্টিমার আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের জন্য নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হ'ল। মক্কেলরা সেদিনকার কয়লার খরচের মূল্য দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রত্নখচিত মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়ে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হ'তে চায়, আংটির বাক্সর দেড় টাকা মূল্য গ্রহণ ক'রে সে কি কখনো আসল ব্যাপারে ক্ষতি পৌঁছতে পারে?

নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকেই যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গেল। আমাদের অধিকারী অমরেন্দ্রনাথ ষ্টিমারে সকলের জলযোগের ভার গ্রহণ করেছেন। চোদ্দ-পনেরো জন বলিষ্ঠ লোকের উন্মুক্ত নদী-বায়ুর কল্যাণে সুবর্ধিত ক্ষুধা-নিবারণের ব্যবস্থা নিতান্ত সামান্য কথা নয়। সের আড়াই-তিন ময়দা এবং তদনুপাতে তরি-তরকারি যথোপযুক্ত আতিথ্য পালনের জন্য খাদ্যবস্তুতে পরিণত হবার উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছে। ও-দিকে ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন টিকরি এবং গোপালভোগের জন্য মিঠুয়ানন্দন বিশ্বেশ্বর হালুয়াইয়ের দোকানে পূর্বদিনে অর্ডার দেওয়া আছে। যথাসময়ে যাতে জিনিসগুলি ঠিক এসে পৌঁছয় সে বিষয়ে তাগাদা দেবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ তাঁর অফিসের একজন আরদালীকে বিশ্বেশ্বরের দোকানে পাঠালেন, ফেরবার পথে আমার বাড়ি থেকে সে হারমোনিয়ম নিয়ে আসবে। ষ্টিমারের পাটাতনে প্রশস্ত ফরাস রচনার জন্য শয্যার বিবিধ উপকরণ, যথা শতরঞ্চ, দরি, তোষক, জাজিম, তাকিয়া, বালিশ প্রভৃতি একত্র করা হ'তে লাগল।

বেলা বারোটার সময়ে আমাদের রওয়ানা হবার কথা। স্নানাহার সেরে পৌনে বারোটার সময়ে অধিকারী মশায়ের গৃহে পৌঁছে দেখি, আমরার মধ্যে আমিই প্রথম, আর কেউ এখনো আসে নি, এমন কি, যাদের গরজ সকলের চেয়ে বেশি সেই মক্কেলরাও অনুপস্থিত, হাকিম তো বটেই।

অমরেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। ষ্টিমারের ডেকের উপর সুবিস্তৃত লোভনীয় শয্যা বিছানো হয়েছে। এক দিকে হারমোনিয়মের বাক্স, তার পাশে মণি মজুমদারের বেহালা। দেখে মনে হয় না, এ ফৌজদারি মামলায় সরেজমিন তদন্তে যাবার উদ্যোগ, এ যেন কোনো তরুণ রাজকুমার নৃত্যগীতবিদ্যায় পারদর্শিনী চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা

সুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে জলবিহারে নির্গত হবেন, তারই আয়োজন। পুষ্পের গর্ভকোষে আবৃত কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় ফৌজদারি মকদ্দমার গ্লানি উৎসব-আয়োজনের গর্ভকোষে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করেছে।

একে একে সকলে এসে জুটতে লাগল। প্রথম আমার মক্কেলদের জন দুই পৈরবিকার (তদ্বিরকার) হাজির হ'ল ; তার পর রাজ-বনেলীর একজন সুদক্ষ মোক্তারের সহিত জন দুই কারপরদাজ (কর্মচারী); সর্বশেষে হাকিম কেশবচন্দ্র রায় স্বয়ং।

সমস্ত জোগাড়-যন্ত্র শেষ করতে করতে, সমস্ত জিনিসপত্র স্টিমারে ওঠাতে ওঠাতে, কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে ভুল হ'ল কি-না বারম্বার খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এবং এক-আধবার ভুল খুঁজে পেতে পেতে অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেল। পানীয় জলের তিনটে পাত্র উঠেছে তো একটা প'ড়ে আছে, পানের ডিবে দুটো এসেছে তো মসলার কৌটোটা ভুল হ'য়ে গেছে, দাবার বলগুলো মণিবাবু আসবার সময়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে এনেছেন কিন্তু ছকখানা তাঁর টেবিলের উপর প'ড়ে আছে,—এই ধরনের ছোট-খাটো ভ্রমসংশোধন শেষ হওয়ার পর গম্ভীরস্বরে তিনটে ভোঁ দিয়ে স্টিমার যখন ন'ড়ে উঠল আমাদের ঘড়িতে তখন দেড়টা। অর্থাৎ, যে সময়ে আমাদের পরপারে উপনীত হবার কথা, সে সময়ে আমরা এ পারেই অবস্থান করছি। 'পরপারে' বলতে ভবনদীর পারে নিশ্চয়ই বলছি নে, গঙ্গানদীর পারেই বলছি, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে অন্তত দুজন যে সেদিন ভবনদীর বক্ষে পরপারের ভেলায় ক্ষণকালের জন্য সওয়ার হয়েছিলাম, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মিনিট দশ-পনেরো সোজা হ'য়ে ব'সে সকলে মিলে উৎসাহের সহিত গল্প-গুজব এবং হাস্য-কৌতুক চালানো গেল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই

বোঝা গেল, সে উৎসাহের তরঙ্গ ভঙ্গে বেশ একটু মন্দা দেখা দিয়েছে। ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজনটা সেদিন সকলেরই কিছু জুৎসই হয়েছিল, তার উপর নদীবক্ষের শীতল ঝিরঝিরে বায়ু; এই দুই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ ক'রে মায়াবী বালিশ এবং মায়াবিনী তাকিয়াগুলো আকর্ষণের এমন উৎপাত লাগালে যে, একে একে সকল উৎসাহ তাদের সুকোমল অঙ্কে সমাধিলাভ না ক'রে নিস্তার পেলে না।

মক্কেলরা ডেকের পিছন দিকে কি করছিল বলতে পারি নে, কিন্তু আমাদের দিকে সকলেই, মায় রাজ-বন্দীর বিহারী মোক্তার সাহেব, একযোগে ঐকতানে সুনিদ্রার প্রশস্তি-কীর্তন লাগিয়েছিলেন। মাত্র আমরা তিনটি প্রাণী জেগে ছিলাম। আমি আর মণিবাবু দাবার ছক পেতে মুখোমুখি হ'য়ে খেলতে বসেছিলাম,—আর আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু মতীন্দ্রমোহন বসু অস্থিরভাবে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন, বরং দাবাখেলাকে কোনমতে সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু এমন ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমোনোকে কিছুতেই নয়। ও-কায একান্তই যদি করতে হয়, তা হ'লে বাড়ি কোন অপরাধ করেছিল?

কথাটা যে এক দিক দিয়ে সমর্থনের যোগ্য, সে বিষয়ে মণিবাবু এবং আমি একমত হলাম, কিন্তু মিনিট পাঁচ-সাত পরে উচ্চতর এক নাসিকা-ধ্বনিতে কৌতূহলী হ'য়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, সমস্ত দেহ প্রসারিত ক'রে মতিবাবু প্রসন্নভাবে 'ও কায' ক'রে চলেছেন। নাসিকা-ধ্বনিতে যে সুর, তার অর্থ হচ্ছে, রামচন্দ্র। এ ঘুমের সঙ্গে বাড়ির ঘুমের তুলনাই হয় না! বাড়ি বেচারা কাছে থাকলে সেদিন অপ্রতিভের একশেষ হ'ত।

তখন বিশ্ব জুড়ে সাম্যবাদের নীতি প্রবল হ'য়ে উঠেছে; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা ও প্রজার মধ্যে বৈষম্য বিচার বারংবার অস্বীকৃত হ'য়ে

চলেছে। মণিবাবু এবং আমার চক্ষেও সাম্যদর্শন তখন এমন ঘনীভূত হ'য়ে এসেছে যে, কাঠের হ'লেও রাজা এবং মন্ত্রীর বৈষম্য সব সময়ে আমরা ঠাহর করতে পারছি নে,—রাজা চালতে মন্ত্রী চালছি, আবার কখনো বা মন্ত্রী চালতে রাজা। তখন স্পষ্ট বোঝা গেল, এরূপ অবস্থায় একমাত্র কর্তব্য, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ নীতি অবলম্বন করা। আপাতত যতীন্দ্রমোহন-মহাজন নিদ্রাগত হয়েছেন, সুতরাং নিদ্রাই একমাত্র পন্থা। দাবা তুলে ফেলে আমরা দু'জনে দুটো বালিশের পাশের দিকে মাথা রেখে একাগ্রভাবে 'ঐ কার্য' আরম্ভ ক'রে দিলাম। নাসিকা-যন্ত্রের যে ঐকতান বাদন চলেছিল, আমরা দুজনেও তাতে নূতন কোন সুর যোগ করেছিলাম কি না, সে কথা অবশ্য আমাদের জানবার কথা নয়।

একটা গভীর ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দ করতে করতে ষ্টিমার এগিয়ে চলেছিল। সে শব্দ নিদ্রার বিঘ্ন উৎপাদন না ক'রে বরং একটা ঘুমপাড়ানিয়া ছন্দের সৃষ্টির দ্বারা আমাদের নিদ্রাকে ঘনীভূত ক'রেই চলেছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি নে, ষ্টিমারের বাঁশির ঘন ঘন বিকট শব্দে জাগ্রত হ'য়ে দেখলাম, গঙ্গার উত্তর উপকূল নিকটবর্তী হয়েছে এবং খানিকটা দূরে উচ্চ পাড়ের উপর এক দল লোক এবং একটা হাতী দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকে দেখেও বনেলীর লোকেরা চিনতে পারলে, হাতীটা তাদেরই হাতী। আমার মক্কেলদেরও একটা হাতী আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের হাতী নয়, ধার-করা অনুগ্রহের হাতী। হয়তো শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহের আশ্বাস প্রত্যাহৃত হয়েছে। সওয়ারি ব্যতিরেকে উকিল সাহেব কি উপায়ে সরেজমিনে উপস্থিত হবে, এ হ'ল তাদের দারুণ দুশ্চিন্তা।

এক ফুৎকারে কেশববাবু সে আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন; বললেন, "তোমাদের হাতী আসে নি তার জন্যে কাজ আটকে থাকবে না কি? ঐ হাতীতেই আমরা সকলে যাব।"

আমার মক্কেল বললে, "হুজুর, বনেদীর ও হাঁথি তো আমরা জানি। ও হাঁথিতে বেশি লোক সওয়ার হ'তে পারবে না।"

কেশববাবু বললেন, "বেশি লোকের দরকার কি? হাতীতে মোক্তার সাহেব, উপেনবাবু আর আমি যাব। বাকি তোমরা যেমন ক'রে হোক পৌঁছো, না পৌঁছলেও ক্ষতি নেই।"

হাকিমের এ ব্যবস্থায় আমার মক্কেলের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হ'ল। কিন্তু হাকিম হ'লে কি হবে? হাকিমও শেষ পর্যন্ত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ ব্যবস্থা করে, আর দৈব কনিষ্ঠাঙ্গুলির তাড়নায় নিমেষের মধ্যে তা উল্টে দেয়।

দেখে-শুনে ঘাটের ঠিক সুবিধামতো জায়গায় ষ্টিমার লাগাতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল। তার মধ্যে আমরা বিস্কুট ও মিষ্টান্নসহযোগে চা পান সেরে নিলাম। তদন্তের কাজ শেষ ক'রে এসে প্রত্যাবর্তনের পথে নিরন্তর আহার আর পান, হাস্য আর কৌতুক চালানো যাবে। সেই আনন্দময় ভবিষ্যতের কল্পনা মনের মধ্যে জাগ্রত রেখে আমরা সরেজমিনের দল ষ্টিমার পরিত্যাগ ক'রে তীরে অবতরণ করলাম।

ষ্টিমার থেকে পারে উঠে শোনা গেল, আমার মক্কেলদের পক্ষেও একটা হাতী উপস্থিত হয়েছিল; সে হাতীটা বৃহৎ আকারের দস্তুর হাতী। অকারণ বেলা দশটার সময়ে উপস্থিত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে ক'রে অধীর হ'য়ে হাতীর মাহুত আধ ঘণ্টাটাক আগে হাতী নিয়ে ফিরে গেছে। আমাদের অবশ্য ঘণ্টা দুই-আড়াই বিলম্ব হয়েছিল; কিন্তু তাই ব'লে বেলা দশটা থেকে তার জের টেনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বের মতো অধীর হওয়া মাহুতের পক্ষে উচিত হয় নি। ধার-করা অনুগ্রহের হাতী, সেজন্য আমার মক্কেলরা জোর ক'রে আটকে রাখতে পারে নি; বিশেষত পূর্বে এই সরেজমিন তদন্তেরই আর এক তারিখে কোনো কারণে হাকিম আসতে না পারায় অপেক্ষা ক'রে ক'রে হতাশ হ'য়ে ফিরে যাওয়ার কষ্টকর নজির ছিল।

সে যাই হোক, অল্পকাল আলোচনার পর মক্কেলদের উভয় পক্ষই একমত হ'ল যে, ষ্টিমার থেকে একটি মাত্র হাতী দেখে কেশববাবু যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছাড়া নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে গমনায়। হাতীটি বৃহৎ আকারের না হ'লেও একেবারে ছোটও নয়; মাঝারি আড়ার। মাহুত সহ কেশববাবু, মোক্তার সাহেব ও আমি—এই চারজনের স্থান একরকম হ'তে পারে। মাহুত হাতীকে উপবেশন করালে আমরা সকলে উঠে বসলাম। কেশববাবু বসলেন মাহুতের ঠিক পিছনে, মোক্তার সাহেব দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠে, আমি বাম দিকের।

মাহুতের আদেশে হাতী দল্‌মল্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে। হাতীর পেটের উপর দু পা ঝুলিয়ে শক্ত ক'রে দড়ি ধ'রে আমি

সন্তর্পণে ব'সে রইলাম। পূর্ণিয়ায় থাকতে বাল্যকালে এক-আধবার হাতী চড়বার সুযোগ হয়েছিল, তারপর দীর্ঘকাল পরে আজ এই পুনরায়। মনের মধ্যে বেশ একটা সানন্দ উত্তেজনা বোধ করতে লাগলাম।

পল্লীর ভিতরের পথ ধ'রে আমাদের গজ মহারাজ চললেন হেলতে দুলতে লীলায়িত গতিভরে। আমরাও সেই হেলা-দোলার ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দুলতে দুলতে চললাম। গজেন্দ্রগমনের তালে তালে গজেন্দ্রের গলদেশে বিলম্বিত ঘণ্টি বাজতে লাগল টুং-টাং টুং-টাং রবে। কৌতুকোল্লসিত ছেলেমেয়ের দল চতুর্দিক থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে পথপার্শ্বে জমতে লাগল হাতী দেখবার আগ্রহে। গৃহাঙ্গণ হ'তে চকিত-নয়না পুরস্ত্রীগণ সকৌতূহল নেত্রে গজ এবং গজের উপরে উপবিষ্ট চারটি বিচিত্র আকৃতি এবং পরিচ্ছদের আরোহীকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে গ্রাম শেষ ক'রে আমরা উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করলাম। খামারে খামারে গৃহস্থেরা শস্যের পরিচর্যায় রত; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কৃষকেরা তরি-তরকারির পাট করছে। গ্রামাঞ্চলে হাতী অজানা বস্তু না হ'লেও প্রতিদিবসের সাধারণ জিনিসও একেবারে নয়,—ঘণ্টার শব্দে উৎসুক হ'য়ে কাযে বিরতি দিয়ে সকলেই ক্ষণকালের জন্য চেয়ে দেখছে। এক জায়গায় গোটা চার-পাঁচ গরু নিশ্চিন্ত মনে চ'রে বেড়াচ্ছিল, ঘণ্টার শব্দে তাকিয়ে দেখে, ভয়েই হোক অথবা কৌতুকেই হোক, উৎকর্ণ হ'য়ে পুচ্ছ তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটে পালাল। অদূরে গোটা দুই কুকুর, হাতী দেখেই হোক অথবা গরুদের লাফালাফি দেখেই হোক, তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ ক'রে দিলে।

শরৎ-অপরাহ্ণের নির্মল আকাশে আনন্দের প্রসন্নতা; বাতাসে সুশীতল স্পর্শ। নদীর তীরে তীরে সুদূরবিস্তৃত কাশবনের হিল্লোলিত

শীর্ষদেশে শুভ্রের উল্লাস। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের গজরাজ ধীর মন্থর একটানা ছন্দে গন্তব্যস্থলের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। আমাদের মনের মধ্যেও এমন একটা অবর্ণনীয় আনন্দের উদ্দীপনা, একমাত্র সরেজমিন তদন্তে গমনের ব্যাপারের দ্বারা যার কারণ নির্ণয় করতে গেলে ভুল হবে। প্রসন্ন-নিশ্চিন্ত চিত্তে আমরা কথোপকথন করতে করতে হেলতে দুলতে চলেছিলাম। কিন্তু আমাদের মনের এই আনন্দঘন অবস্থার মধ্যে মহা এক দুর্বিপাক নিঃশব্দপদসঞ্চারে আমাদের অগ্রে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তার সামান্যতম আভাসও আমরা টের পাই নি।

গ্রাম ছাড়িয়ে পোয়াটাক পথ এগিয়ে আসার পর হঠাৎ এক সময়ে মাহুতকে সম্বোধন ক'রে কেশববাবু ব'লে বসলেন, "তুম পিছে আ কর বয়ঠো, হাম হাঁথি চালায় গা।" (তুমি পিছনে এসে ব'সো, আমি হাতী চালাব।)

প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগল না,—মাহুতেরও না। বিনীত কণ্ঠে সে বললে, "হুজুর, নয়া হাঁথি, পুরা শায়েস্তা অবতক্ নহি হুয়া হায়,—বিগড়নে সে তাজ্জব নহি।" (হুজুর, নতুন হাতী, পুরো দমিত এ পর্যন্ত হয় নি; বিগড়োয় যদি, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।)

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেশববাবু বললেন, "আরে নেহি, নেহি,—নেহি বিগড়েগা। ইয়ে কি তুমহারা হাঁথি হায়?—ইয়ে তো ছাগল হায়।" (আরে, না না, বিগড়োবে না। এ কি তোমার হাতী? এ তো একটা ছাগল।)

বাহনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশে বাহক বোধ করি অপমানিত বোধ করলে। কোনো উত্তর না দিয়ে, সম্ভবত ঈষৎ রুষ্ট মুখে, সে নিঃশব্দে চালিয়ে চলল।

কেশববাবুর কথার উত্তর দিলাম আমি; বললাম, "এ হাতী যদি ছাগল হয় কেশববাবু, আমরা তা হ'লে ইঁদুর। ইঁদুরের পক্ষে ছাগল যথেষ্ট, সে কথা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন। তা ছাড়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

স্মিতমুখে কেশববাবু বললেন, "ভয় পাচ্ছেন বুঝি?—কি কথা বলুন না?"

বললাম, "হাতী চালাবার অভিজ্ঞতা আছে তো?"

সহাস্যমুখে কেশববাবু বললেন, "যথেষ্ট আছে। আসামে ছিলাম অত দিন, আর হাতী চালাবার অভিজ্ঞতা নেই? আর, আসামের সে কি হাতী উপেনবাবু?—সে যেন এক একটা ঐরাবত! আর, বেঁটে-খাটো, এতটুকু—এ আবার হাতী না কি? না বসিয়ে লাফ মেরে এ হাতীর পিঠে চড়া যায়।"

স্বর্গলোকের অধিবাসী নই, সুতরাং ঐরাবত সম্বন্ধে কোনো তর্ক তুললাম না, বললাম, "কিন্তু বেঁটে মানুষের গুণ্ডা হ'তে তো আটক নেই কেশববাবু?"

কেশববাবু বললেন, "না, তা নেই, কিন্তু বেঁটে মানুষ গুণ্ডা হ'লে মাথায় অঙ্কুশ মেরে সহজেই সায়েস্তা করা যায়। আপনার কিছু ভয় নেই, দেখুন না, কেমন চালাই।" তারপর মাহুতকে সম্বোধন ক'রে পুনরায় বললেন, "এই মাহুত, তুম হামারা পিছে আ কর্ বয়ঠো। হামকো হাথি চালানে দেও।" (এই মাহুত, তুমি আমার পিছনে এসে ব'স। আমাকে হাতী চালাতে দাও।)

কেশববাবুকে নিরস্ত করতে মাহুত আরও এক-আধ বার ক্ষীণভাবে চেষ্টা করলে, কিন্তু হাকিম-মানুষের সঙ্গে বেচারা কতক্ষণ যুঝতে পারে? অগত্যা উঠে এসে একেবারে হাতীর পিছন দিকে বসল,—

বোধ হয় কেশববাবুর সঙ্গে সহযোগিতার দূরতম স্থান বেছে নিয়ে। সম্ভবত মনে মনে একটু রেগে গিয়েছিল।

সোৎসাহে কেশববাবু মাহুতের স্থান অধিকার ক'রে বসলেন।

মানুষের মতো কথা কইতে পারে না ব'লে ইতরপ্রাণীকে আমরা যতটা নিবোধ মনে করি, বস্তুত সব সময়ে তারা ততটা নির্বোধ নয়। মনুষ্যসুলভ বুদ্ধির অভাব তারা পরিপূরিততর করে তাদের প্রখর সহজ বুদ্ধির দ্বারা। কাঁধের উপরে কর্তৃত্বের রদবদল হয়েছে, সে কথা আমাদের হাতী নিমেষের মধ্যে বুঝে নিয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সিদ্ধান্ত করেছে যে, নূতন কর্তৃত্বকে স্বীকার ক'রে চ'লে শান্ত ব'লে পরিগণিত হওয়ার দুর্নাম সে কিছুতেই সহ্য করবে না। তার প্রথম লক্ষণ সে দেখালে তার এতাবৎ লীলায়িত ছন্দের গতি ভঙ্গ ক'রে। যে মসৃণ মন্থর তালে এতক্ষণ সে চলছিল ক্ষণে ক্ষণে তার লয় খণ্ডিত হ'তে লাগল।

ব্যাপারটা আমার চেয়ে কম উপলব্ধি করেন নি কেশববাবু,—বেটেকে ঈষৎ সায়েস্তা করবার অভিপ্রায়ে মস্তকে মৃদু অঙ্কুশাঘাত ক'রে বললেন, "চল্ শ্যাম।"

নানাবিধ স্বতন্ত্র নাম থাকলেও 'শ্যাম' যে হস্তীগণের চিরচলিত সাধারণ সম্বোধন, সে কথা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা আছে। হস্তীমাত্রেই শ্যাম, কিন্তু বৃন্দাবনের শ্যাম নয় ব'লে হস্তিনীরা রাধা নয়,—হস্তিনীরাও শ্যাম। হাতীকে চালাতে হ'লে 'চল্ শ্যাম,' বসাতে হ'লে 'বৈঠ্ শ্যাম', ওঠাতে হ'লে 'উঠ্ শ্যাম' প্রভৃতি বোল ব্যবহার করতে হয়, হস্তীচালনা বিদ্যা এটুকু প্রাথমিক জ্ঞান আমারও ছিল।

বেটে অঙ্কুশাঘাতের প্রতিবাদ জানালে পথ থেকে প্রান্তরে পদার্পণ ক'রে। হাতীই যে স্বেচ্ছায় মাঠে উঠেছিল, সে কথা বুঝতে আমার বাকি

ছিল না; শুধু কথাটা মোলায়েম করবার উদ্দেশ্যে বললাম, "মাঠে উঠলেন কেন কেশববাবু? পথ ধ'রেই চলুন না।"

কেশববাবু বললেন, "মাঠ দিয়েই একটু যাওয়া যাক না। এখানে মাঠে আর পথে বিশেষ কি প্রভেদ আছে?"

তা অবশ্য নেই, কিন্তু হাতীর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী গতি এবং মতির মধ্যে যে মারাত্মক প্রভেদ বেড়ে উঠছে, তারই হ'ল প্রশ্ন। কিন্তু গুরুতর অবস্থায় ঘাবড়ে দেওয়া উচিত নয় ব'লে আর কোনো মন্তব্য করলাম না।

পথ আমাদের বাঁ দিকে প'ড়ে ছিল, আর ক্রমশই আমরা পথ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছিলাম। কেশববাবুও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটা পছন্দ করছিলেন না। পথ হারিয়ে অনভিপ্রেত স্থানে না গিয়ে পথ ধ'রে চলতে পারলে অন্তত একটা দিক বজায় থাকে। তাই পথে পড়বার উদ্দেশ্যে কেশববাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, "বাঁয়ে শ্যাম, বাঁয়ে।" তারপর তাঁর আদেশ যাতে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে প্ররোচনা দানের অভিপ্রায়ে হাতীর মাথায় অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করলেন। ফল হ'ল ঠিক বিপরীত। হঠাৎ একটা হেঁচকা টান মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাতী মারলে দৌড়। কোনো রকমে আমরা পড়তে পড়তে দড়ি আঁকড়ে সামলে গেলাম।

পিছন দিক হ'তে মাহুত উচ্চৈঃস্বরে বললে, "কুছ মৎ কীজিয়ে হুজুর। হাথি গরমা গিয়া হায়, থোড়া দৌড়নেসে আপনে হি ঠণ্ডা হো যায়গা।" (কিছু করবেন না হুজুর। হাতী গরম হ'য়ে গিয়েছে, কিছু দৌড়লে আপনিই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।)

অগত্যা তাই। বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনাভীষণ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা মনে মনে ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগলাম,—আর মত্ত মাতঙ্গ হুদ্দাড়িয়ে ছুটে চলল তার স্বেচ্ছানির্বাচিত পথে।

প্রায় আধ মাইল পথ নিরন্তর ধাবনের পর অদূরে একটা উচ্চ বৃক্ষ দেখতে পেয়ে হাতী সেই দিকে তার গতি পরিবর্তিত করলে। মত্ত অবস্থায় হাতীর প্রধান কাম্য হয় আরোহীকে বিনাশ করা, আর বিনাশ করবার যতগুলি উপায় তার জানা থাকে তার অন্যতম হচ্ছে, এমন গাছের তলা দিয়ে ছুটে যাওয়া যার শাখা তাকে আঘাত না ক'রে করে আরোহীকে। এ বিষয়ে হাতীদের অনুমানশক্তি অদ্ভুত। আমার আশঙ্কা হ'ল, হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই হাতী গাছ লক্ষ্য ক'রে ছুটছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দূর থেকে দেখেই বুঝলাম, গাছের নিম্নতম শাখাও আমাদিগকে আঘাত করবার নাগালের বাইরে। সুতরাং সে ভয় অন্তর্হিত হ'ল।

কিন্তু গাছই যে হাতীর লক্ষ্য ছিল, সে কথা অনুমান করা আমাদের ভুল হয় নি। দৌড়তে দৌড়তে গাছতলায় পৌছে সহসা সে থম্ ক'রে পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, আমরাও দলমলিয়ে উঠে কোনো প্রকারে সামলে গেলাম। মাহুত বললে, গাছের ছায়ায় মিনিট পাঁচ-সাত দাঁড়ালেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

ঘুরে ঘারে অপথ কুপথ দিয়ে আমরা কিন্তু অকুস্থানের কাছাকাছিই এসে পৌছেছিলাম। কিছুদূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল; মাহুত বললে, ঐ গ্রামেরই উত্তর দিকে অকুস্থান। হাতী ঠাণ্ডা হওয়ার পর মাহুত চালিয়ে নিয়ে গেলে তথায় পৌছতে মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।

যাক। কোনো প্রকারে প্রলয়-প্রলয় বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। গাছতলায় এসে হাতীর দাঁড়িয়ে পড়বার মতি হয়েছিল তাই রক্ষে,—নইলে সর্বনাশের কোন্ মুখে যে নিয়ে গিয়ে ফেলত, কে বলতে পারে। কিন্তু হায়, তখন যদি জানতাম, এ পর্যন্ত যে ব্যাপারটুকু ঘটেছে তা আসল পালার অকিঞ্চিৎকর গৌরচন্দ্রিকা মাত্র,

তা হ'লে কি মোক্তার সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি।

মাহুতকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন মোক্তার সাহেব। নিমেষের মধ্যে তিনি সার সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললেন, যে কারণেই হোক উন্মত্ত হস্তী একবার যখন গতিরোধ ক'রেছে, তখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, অবিলম্বে তার পিঠ থেকে নেমে পড়া। তারপর পুনরায় ওঠা-না-ওঠা প্রশ্নের বিবেচনা নিরাপদ মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে তৎকালীন অবস্থা বুঝে পরে করলেই চলবে। এমন এক ধরনের শারীর প্রচেষ্টার অবস্থা তিনি ব্যক্ত করলেন, যার জন্যে মাহুতকে তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়ে হাতীর লেজের সাহায্যে কোনো রকমে তাঁকে নামিয়ে নিতেই হ'ল।

মোক্তার সাহেবের কর্মপটুতা দেখে আমি ঈর্ষান্বিত হলাম। হায়, হায়! আমি যদি প্রথমে এই কৌশল অবলম্বন করতাম তা হ'লে কত পাকা কাজই না হ'ত! অবশ্য একই সময়ে এক ধরনের শারীর প্রচেষ্টা দুজন ব্যক্তির যে হ'তে পারে না তা নয়,—বিশেষত মত্ত হাতীর পিঠে একনাগাড়ে মাইল দেড়েক দৌড় দেওয়ার পর, কিন্তু অত পিঠোপিঠি একই কথা উত্থাপিত ক'রলে পাছে পরবর্তী লোকের সততার বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়, সেই কথা ভেবে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলাম।

অপর কোন উপায়ে মৃত্তিকার স্পর্শলাভ ক'রে ধন্য হ'তে পারি মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময়ে হাতীর পিঠের সমস্ত চামড়াটা বার দুই ঝাঁকে উঠল। তার অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে কিন্তু বুঝেছিলাম, আমরা দুজনে তখনো যে তার পিঠের ওপর অবস্থান করছিলাম তারই প্রতিবাদ। আমার বিশ্বাস, ভূমিতলে মাহুতকে দেখতে পেয়ে হাতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্ব'লে উঠেছিল। যে তার পরিচর্যা

করে, যে আহার যোগায়, যে তাকে চালিত করে, যাকে সে স্বীকার করেছে, সেই মাহুত মাটির উপরে, আর দুজন অর্বাচীন অবান্তর ব্যক্তি পিঠ আঁকড়ে ব'সে থাকে?—তবে দাও তাদের ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে হাতীর সমস্ত দেহ আলোড়িত হ'তে আরম্ভ করলে,—পেট পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই,—বোধ করি পা পর্যন্তও। সে কি ভীষণ আর দুরন্ত আলোড়ন, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা যার নেই সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এ-পাশে ও-পাশে, দক্ষিণে বামে, অগ্রে পশ্চাতে। ফেলে দেয় আর কি। দু হাতে দু দিকের দড়ি সজোরে চেপে ধ'রে হাতীর পিঠের উপরকার শয্যার সহিত নিজের দেহের যোগ কোনোমতে বজায় রাখতে লাগলাম। ডান পাশে ঈষৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, স্থূলদেহ খাকি রঙের হাফপ্যাণ্ট পরা কেশববাবু হাতীর কাঁধের উপর দু হাত আর দু হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গীতে ব'সে অতি কষ্টে বিপদ সামলাচ্ছেন।

চতুর্দিকে শতাবধি লোক জ'মে গেছে। নির্বাক আতঙ্কে কিংকর্তব্য-বিমূঢভাবে তারা তাকিয়ে আছে, বোধ করি আমাদের দুজনের অপমৃত্যু দেখবারই অপেক্ষায়। কারো কিছু বলবার নেই বা করবার নেই। উৎকট পরিণতির দুশ্চিন্তায় সকলের স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ দেখি নিঃশব্দ পদে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যু,—দুর্বার, সুনিশ্চিত, অনতিবর্তনীয় মৃত্যু। চোখাচোখি হ'তেই সহাস্যমুখে সে বললে, নিতে এসেছি ভাই। চল তা হ'লে আমার সঙ্গে। বিস্মিত হ'য়ো না, দুঃখ ক'রো না। এর আগে কোটি কোটি লোকের তোমার চেয়ে ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু ঘটেছে। কেউ আগুনে পুড়েছে, কেউ জলে ডুবেছে, কেউ বা ট্রেনের চাকায় কাটা পড়েছে। তুমি যে অপমৃত্যুতে

"মারা যাবার দলের একজন নও, তোমার যে আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত পালঙ্কের উপরে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে, এমন প্রতিশ্রুতি কে তোমাকে দিয়েছে ?

সত্যি। কিন্তু তাই ব'লে এত শীঘ্র! চোখের দুই কোল একটু যেন ভিজে এল। নিমেষের মধ্যে মনে প'ড়ে গেল স্নেহময়ী জননী ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ, বিদায়কালে যাদের ব'লে এসেছি—রাত নটার মধ্যে ফিরে আসব। ফিরে হয়তো যাব, কিন্তু যে দেহ নিয়ে এসেছিলাম সে দেহ নিয়ে নয়; দলিত পিষ্ট নিষ্প্রাণ এক শোচনীয় দেহ নিয়ে। আমার সেই নিদারুণ প্রত্যাবর্তন দেখে গৃহে যে-হাহাকার উঠবে, তার করুণ রোল যেন কানে এসে পৌঁছল।

সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল একটা স্তিমিত উদাস বৈরাগ্যে। কেমন ধীরে ধীরে অলক্ষিতে একটা ঘটনার পর আর এক ঘটনা মানুষকে পৌঁছে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, নিমেষের মধ্যে মনের আকাশে খেলে গেল সেই ঘটনাবলী, যা আমাকে আজ এই কদর্য মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেছে। সরেজমিন তদন্তের তারিখ পড়া, তার সঙ্গে জড়িয়ে স্টিমার পার্টির ব্যবস্থা, স্টিমার পার্টির উদ্যোগে ঘণ্টা দুই বিলম্ব হ'য়ে যাওয়া, তার ফলে আমাদের হাতী ফিরে যাওয়ায় কেশববাবুর সঙ্গে এক হাতীতে আরোহণ এবং সর্বোপরি কেশববাবুর হাতী চালাবার দুর্মতি! বাঃ! চমৎকার! আয়োজনের পৌর্বাপর্য দেখে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত কৌতুকরস অনুভব করতে লাগলাম। সব মৃত্যুতেই এইরূপ আয়োজন হ'য়ে থাকে, আমরা শুধু ভাল ক'রে চেয়ে দেখি নে।

এদিকে সমানে কুৎসিত নিষ্ঠুর নির্দয় আলোড়ন চলেছিল, বিরামহীন বিরতিহীন আক্রোশে।

হঠাৎ মনে হ'ল একটা কথা। এখানে এত লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে, জীবিত অবস্থাতেই হোক অথবা মৃত অবস্থাতেই

হোক, যা-হয় একটা গতি হ'তে পারবে; কিন্তু উৎকটের (মত্ত হস্তীর নাম উৎকট) মতিস্থির তো কিছু নেই, হঠাৎ খেয়ালবশে আলোড়ন পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় যদি দৌড় মারে,—আর এবার নিভুর্লভাবে হিসাব ক'রে নিম্নশাখা বৃক্ষের তলদেশ ভেদ করবার সুযোগে বৃক্ষকাণ্ডের আঘাতে আমাদের দুজনের মস্তক চূর্ণ করে, তা হ'লে সেই নির্জন বন্ধুহীন প্রান্তরে 'আহা' বলবার পর্যন্ত কেউ থাকবে না!

সুতরাং, আর দ্বিতীয় কথা নয়,—মরেছি তো মরতে আছি,—যাঁহাতক হাতী বাম দিকে হেলা অমনি সঙ্গে সঙ্গে 'দুর্গা' ব'লে দু হাত ছেড়ে দিয়ে ঝুপ ক'রে মাটিতে পড়া। প্রথমে মস্তিষ্কের মধ্যে একটা আঘাত পেয়ে মাথাটা গেল ঘুরে, পায়ের ভরে দাঁড়াতে না পেরে ব'সে পড়লাম; কিন্তু তখনি উঠে প'ড়ে হাত দশেক দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আঃ, বেঁচে গেছি! বেঁচে গেছি! মৃত্তিকার কল্যাণময় স্পর্শে সমস্ত দেহের মধ্যে জীবন তড়িতাযিত হ'ল। পুনরায় রঙিন হ'য়ে উঠল বৈরাগ্যপাংশু ধরিত্রী।

কিন্তু কেশববাবু?

হাতীর দিকে তাকিয়ে দেখি, হাতী তেমনি ভাবেই দুলে চলেছে, আর, গভীরচিন্তিত মুখে তার কাঁধে ব'সে হাতে-হাঁটুতে ভর দিয়ে দুলছেন কেশববাবু। তাড়াতাড়ি মাহুতের কাছে গিয়ে বললাম, "তুমি উঠে প'ড়ে হাতীকে সামলাও। বাবুকে বাঁচাও।"

মাহুত বললে, "সর্বনাশ! এখন হাতীর দেহে একটি আঙুল ছোঁয়ালে হাতী দৌড় মারবে, আর, তা হ'লে বাবুকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।"

বললাম, "তবে উপায়?"

"চুপচাপ অপেক্ষা করা।"

"হাতী আপনা-আপনি ঠাণ্ডা হবে ব'লে মনে হয় তোমার ?"

উপর দিকে হাত দেখিয়ে মাহুত বললে, "খোদার মর্জি হ'লে হ'তে পারে।"

এমন সময় ধপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখি, হাতীর সামনের দিকের বাঁ পায়ের একটু পিছন দিকে প'ড়ে আছেন কেশববাবু। হাতীর কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছেন অথবা লাফিয়ে পড়েছেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পর-মুহূর্তেই, অর্থাৎ সাহায্য করবার জন্য আমরা কেউ ছুটে যাবার পূর্বেই, দেখলাম হাতীর প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাঁ হাত আর বাঁ পায়ের ভরে একপেশে হ'য়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে দ্রুতগতিভরে হাতী থেকে দূরে স'রে চলেছেন কেশববাবু। তারপর হাত আট-দশ ঐভাবে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুদ্দাড় ক'রে হাত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ছুটে পালিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন।

আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম দেখে! ওরূপ অদ্ভুত কসরৎ একমাত্র মৃত্যুভয়-তাড়িত মরিয়া মানুষের দ্বারাই সম্ভব। একপেশে হ'য়ে এক দিকের হাতে-পায়ে ভর দিয়ে এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কেউ যে অত দ্রুতগতিতে সরতে পারে, আগে তা ধারণার অতীত ছিল। কেশববাবুর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বললাম, "খুব লেগেছে নাকি কেশববাবু ?"

উত্তেজনায় কেশববাবুর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, হাসিমুখে বললেন, "তা কিছু লেগেছে বইকি।"

বললাম, "উঠে দাঁড়িয়ে অমন ছুটে পালালেন কেন বলুন তো ?"

গম্ভীরমুখে কেশববাবু বললেন, "আপনি জানেন না উপেনবাবু, ভারি dangerous animal হাতী, শুঁড় দিয়ে চেপে ধ'রে পা দিয়ে চিপে দেয়।"

প্রকাশ্যে কিছু বললাম না,—মনে মনে বললাম, চেপা আর চাপার

এমন বিপজ্জনক তথ্য যখন জানা ছিল, তখন ও-ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হ'লেই হ'ত।

জনতার উল্লাসধ্বনিতে চেয়ে দেখি, ইত্যবসরে কখন হাতীর উপর চ'ড়ে ব'সে মাহুত বৃক্ষকে কেন্দ্র ক'রে পাঁই-পাঁই বেগে হাতীকে চক্রাকারে দৌড় করাচ্ছে। চার-পাঁচ চক্র দিয়ে হাতীকে বৃক্ষতলে নিয়ে এসে মাহুত বললে, "বয়ঠ্ শ্যাম।"

সুবোধ বালকের মতো শ্যাম ব'সে পড়ল।

মাহুত বললে, "উঠ্ শ্যাম।

ভদ্রলোকের মত শ্যাম উঠে দাঁড়াল।

মাহুত বললে, "চল্ শ্যাম।"

অনুগত জনের মতো শ্যাম পুনরায় চক্র দেবার জন্যে ছুট দিলে। শ্যাম এখন আর বিন্দুমাত্র বাম নয়, এখন সে ষোল-আনা 'যো-হুকুম'। কে বিশ্বাস করবে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে দুর্দান্ত প্রাণী প্রলয় দোলন চালাচ্ছিল, এই নিরীহ নির্বিরোধ জন্তুটি সে ভিন্ন আর কেউ নয়! কেউটে একেবারে কেঁচোয় পরিণত হয়েছে।

ঘটনার বৈপরীত্যে সরেজমিন তদন্ত সকলেন, এমন কি আমাদের মক্কেলদের পর্যন্ত, মাথায় উঠেছিল। কিছু সওয়াল জবাব ক'রে, কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে, কিছু ধমক-ধামক দিয়ে উপস্থিতের মতো কেশববাবু ও-পর্ব আধ মাইল দূর থেকেই সারলেন।

উৎকট বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের পর আমাদের স্নায়ুর টান একটা টিলা মেরে গিয়েছিল যে, প্রথমত স্টিমারে এবং তৎপরে গৃহে ফেরবার জন্য আমরা মনে মনে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলাম। আমাদের আগমন হয়েছিল গজে, প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হ'তে লাগল ঘোটকে। এবার প্রত্যাবর্তনের কাহিনীটা একটু বলি।

১৯

মাহুতের পরিচালনায় হাতী যতই ভাল চলুক না কেন, মোক্তার সাহেব এবং আমি জনান্তিকে একমত হলাম, সমস্ত পথ যদি পদব্রজে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাও স্বীকার, কিন্তু ও ভয়ঙ্কর বাহনে আর নয়। পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যের ফলে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে বিবেচনার দোষে শেষ পর্যন্ত ঐ গজই যদি আমাদের অপমৃত্যুর কারণ হয়, তা হ'লে দুঃখে ও অনুশোচনায় প্রেতলোকে গিয়েও কান মলতে হবে। হাতীতে চড়তে আমাদের আপত্তির কথা অবগত হ'য়ে মক্কেলরা প্রস্তাব করলে ঘোটকে প্রত্যাবর্তনের।

সে বরং ভাল। ক্রোধান্বিত হ'য়ে ঘোড়া আর যাই করুক না, টপ ক'রে দাঁড়িয়ে প'ড়ে দুলতে আরম্ভ করবে না। তা ছাড়া, ঘোড়ার শুঁড় নেই, সে এক মস্ত বাঁচোয়া। শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে পা দিয়ে পেট ফাটাবে না, সে নিতান্ত কম আশ্বাসের কথা নয়।

কেশববাবু কিন্তু হাতীর পিঠে ফেরাই মনস্থ করলেন। তার কারণও ছিল একাধিক। প্রথমত অনেক দুঃখ আর অনেক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে মর্মে মর্মে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ না ঘটলে কোনো বিভ্রাটও ঘটত না। সে কথা আমরাও যে খানিকটা উপলব্ধি করি নি, তা নয়, তবে কেশববাবুর অপরাধচেতন মন হাতীর উপর যতটা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিল, আমাদের অবুঝ সাবধানী মন ঠিক ততটাই স্থাপন করছিল অবিশ্বাস। বারংবার আমাদের ঘা-খাওয়া মন মাথা নাড়ছিল, আর বলছিল, কাজ কি!

দ্বিতীয়ত, ভারী শরীর নিয়ে অত উঁচু থেকে মাটিতে পড়ার ফলে

গুরুতর চোট কেশববাবুর দেহের মধ্যে ক্রমশ যে বেদনা বাড়িয়ে তুলছিল, তা নিয়ে একটা সজীব প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে সক্রিয়ভাবে তাকে চালিয়ে যাওয়া কষ্টের কথা। তা ছাড়া, ছোটখাটো একটা মনস্তত্ত্বের কথাও এর মধ্যে ছিল। আসামে হাতী চালানোর যে গরীয়সী অভিজ্ঞতা ক্ষণকাল পূর্বে বৃক্ষতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছিল, হস্তীপৃষ্ঠে ফিরতে পারলে তার সামান্য একটুর গতি হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতীর পিঠে সমারূঢ় হ'য়ে কেশববাবু স্টিমার-ঘাটের অভিমুখে রওনা দিলেন। আমরা বিশ-বাইশজন উকিল, মোক্তার, মক্কেল ও সাধারণ দর্শক উৎসুকচিত্তে হাতী এবং কেশববাবুর পশ্চাদ্দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীর শান্তগামী গজের দুই পাছার মধ্যে দক্ষিণে বামে মৃদুমন্দ দোল, তার মধ্যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তির আশ্বাস। তা হোক, আমাদের ঘোড়াই ভাল।

ঘোড়ার ব্যবস্থা হ'তে লাগল। হাতীর কাহিনী চলছে ব'লে কেউ যেন মনে না করেন, ব্যবস্থা হ'তে লাগল গতিবেগশালী অশ্বারোহণ আসব অশ্বের। সামনের দু পা একত্র ক'রে দড়ি-বাঁধা গুটি চার-পাঁচ নিরীহ নির্বিরোধ পাতি ঘোড়া মাঠে ইতস্তত চ'রে বেড়াচ্ছিল, তারই মধ্যে দুটিকে দৌড়াদৌড়ি ক'রে ধরা হ'ল। পিছনের দু পা এবং সামনের এক ক'রে বাঁধা দু পা—এই তিন পা নিয়ে লাফালাফি ক'রে খানিকটা তারা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু অবিলম্বেই আত্মসমর্পণ ক'রে সুবোধ বালকের মতো স্থির হ'য়ে দাঁড়াল।

কার ঘোড়া কেউ জানে না; অদূরবর্তী গ্রামের অধিবাসীদের কারও হবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে-যায় না। প্রবলপ্রতাপ রাজ-বনেলীর গোমস্তা-পাটোয়ারি উপস্থিত থেকে ব্যবস্থা করছে, কার সাধ্য কথা কয়! স্টিমার-ঘাট থেকে ফিরিয়ে এনে আবার যদি দু পা

বেঁধে যথাস্থানে ছেড়ে দেয় তা হ'লেই যথেষ্ট। ঘোড়া দুটির পায়ের দড়ি খুলে নিয়ে মুখে বাঁধা হ'ল। তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে আমার মক্কেল বললে, "সওয়ার হুয়া যায় হুজুর।" (অর্থাৎ, আরূঢ় হওয়া হোক হুজুর।)

কি সর্বনাশ! জিন রেকাব লাগাম নেই, সওয়ার হুয়া যায় হুজুর—কি রকম? লাগাম নেই সে কথা অবশ্য ঠিক বলা চলে না,—পায়ের দড়ি উপস্থিত মুখের লাগামে পরিণত হয়েছে।

অপ্রতিভ-স্মিত মুখে হাত জোড় ক'রে মক্কেল বললে, "ঈ ময়দানমে বিছৌনা ক্যায়সে মিলেগা হুজুর?" (এ মাঠের মধ্যে ঘোড়ার শয্যা কেমন ক'রে পাওয়া যাবে হুজুর?)

মোক্তার সাহেব সম্ভবত এই ধরনের ব্যাপারে অভ্যস্ত, তিনি ইতিমধ্যে তাঁর ঘোড়ায় উঠে বসেছেন; আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "উঠে পড়ুন উকিল সাহেব।"

বললাম, "ঘোড়ার এই নগ্ন দেহের ওপরেই?"

স্মিতমুখে মোক্তার সাহেব বললেন, "তা ছাড়া উপায় কি আছে?" ভরসা দিলেন, খুব বেশি কষ্ট হবে না।

অগত্যা কতকটা নিজের চেষ্টায় এবং কতকটা মক্কেলের সাহায্যে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলাম। মোক্তার সাহেব আগে আগে চললেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। মক্কেলদের জন পাঁচেক লোক পদব্রজে আমাদের পিছনে আসতে লাগল। তাদের দুজন ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসবে, বাকি তিনজন আমাদের সঙ্গে ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করবে।

অপরাহ্ণ শেষ হ'য়ে আসছে। পূর্বদিকে আমরা চলেছি, পিছন থেকে অলস পড়ন্ত রৌদ্র এসে পড়ছে আমাদের দেহে, আমাদের দেহের ছায়া

পড়েছে পথের উপর আমাদের সম্মুখে; সেই ছায়া অনুসরণ ক'রে আমাদের ঘোড়া চলেছে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক। দুলকি চালে নয়, হেঁটে। চাবুক না মারলে এ সব ঘোড়া দৌড়য় না,—তাই রক্ষে! এ অবস্থায় দৌড়লে ঘোড়ার দেহের সঙ্গে নিজের দেহের সদ্ভাব বজায় রাখা কঠিন হ'ত।

নূতন মেয়াদ পাওয়া জীবনের একটা অননুভূতপূর্ব আনন্দ মনের মধ্যে বহন ক'রে চতুর্দিক দেখতে দেখতে চলেছিলাম। পথ ঘাট মাঠ আকাশ বাতাস গাছপালা একটা নূতনতর আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে দুই চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করছিল। যাবার সময়ে এই অঞ্চল দিয়েই গেছি, কিন্তু তখন এসব কিছুই এমন ক'রে চোখে পড়ে নি। তখন বিপদের ঝঞ্ঝাধূলিতে দেহের দুই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, শুধু মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছিলাম, সঙ্কট-উগ্র ভবিষ্যতের ভয়াবহ মূর্তি।

দেখতে দেখতে নদী এসে পড়ল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাত চওড়া জলপ্রবাহ, একে নদী বলাও চলে না, নালা বললেও অন্যায় হয়। জমিদারকে রাজা বললে যে অপরাধ হয়, একে নদী বললেও হয় সেই অপরাধ, আবার জমিদারকে কৃষক বলা যেমন অসঙ্গত, একে নালা বলাও তেমনি।

মোক্তার সাহেবের ঘোড়া অবলীলাক্রমে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। বোধ হয় এ পথ তার নূতন নয়, এ পথে সে পূর্বে হয়তো যাওয়া-আসা করেছে। দুই হাঁটু উপর দিয়ে জুতাশুদ্ধ দু পা প্রায় ঘোড়ার পিঠের কাছ বরাবর তুলে জল থেকে জুতো বাঁচাবার অভিপ্রায়ে মোক্তার সাহেব এক বিশেষ ভঙ্গী অবলম্বন ক'রে বসলেন। আমি কিন্তু মোক্তার সাহেবের এ কায়দার অনুসরণ করলাম না। জল থেকে জুতো বাঁচাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে নিজে যদি জলের মধ্যে পড়ি, তা হ'লে নদীর অগভীর জলে না

হোক, লজ্জার গভীর জলে ডুবে মরতে হবে। জুতো ভিজলে একদিনে জুতো শুকিয়ে যাবে, কিন্তু লজ্জার জলে নিজেকে এমন ক'রে ভেজালে সে ভেজা বহুদিনেও শুকোবে না। পাছে নিজের ভারকেন্দ্র হারিয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ি, সেই ভয়ে এ পর্যন্ত দুটি পায়ের দ্বারা সাঁড়াশির মতো ঘোড়ার পেট চেপে ধ'রে এসেছি। ঘোড়া জলে নামবার পূর্বে সেই সাঁড়াশির চাপ এতটা বাড়িয়ে দিলাম যে, দৈবক্রমে ভারকেন্দ্র হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে এক দিকে হেলে পড়লেও ঘোড়ার দেহে ঠিক লগ্ন হ'য়েই থাকব, বড় জোর মাথাটা ঝুলে পড়বে ঘোড়ার পেটের তলায়, পা দুটো খাড়া হ'য়ে উঠবে আকাশের দিকে, কিন্তু মাটি স্পর্শ করব না।

যা হোক, জলে অবতরণ ক'রে একরকম নিরাপদেই ওপারে গিয়ে উঠলাম। পা নীচু ক'রে রাখার ফলে জুতো জোড়াই শুধু ভিজল না, বস্ত্রের নিম্নাংশও খানিকটা ভিজে গেল তা যাক, বৃহত্তর লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অল্পতর লজ্জাকে বরণ করাতে দোষের কিছু নেই।

ওপারে উঠে অগ্রসর হ'তে হ'তে হঠাৎ মনে পড়ল, পূর্ণিয়ার উকিল মহেন্দ্রবাবুর ঘোড়ায় চড়ার কাহিনী। সে কাহিনীর সহিত আমার ঘোড়ায় চড়ার কাহিনীর তেমন মিল না থাকলেও এমন একটু আছে, যাতে একটির কথা স্মরণ করলে অপরটির কথাও মনে পড়ে। কাহিনীটি শুনলে রসিক পাঠক হয়তো খুশিই হবেন।

পূর্ণিয়ার দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় আদালতেই মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত পসার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় কৃশ, তামাটে বর্ণের খিটখিটে মানুষ; কিন্তু একদম খাঁটি; বচনে বাচনে মহেন্দ্রনাথ শুধু স্পষ্টই ছিলেন না, সময়মতো রূঢ়ও হতেন। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং'—শ্লোকটির মধ্যে যে

তিনটি মূল্যবান নীতির নির্দেশ আছে, তার প্রথমটি তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করতেন, দ্বিতীয়টি পালন করতেন কদাচিৎ, এবং তৃতীয়টি লঙ্ঘন করতেন সর্বদা। প্রিয় এবং অপ্রিয় সত্য নির্বিচারে বলতেন; আর অপ্রিয় সত্য বলতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করতেন না।

এই অমিষ্টভাষিতার জন্য লোকে কিন্তু মহেন্দ্রনাথের উপর অসন্তুষ্ট ছিল না। যে কঠিন পর্বত সত্যের অমৃতনির্ঝর দান করে, মিষ্ট কথার ইক্ষুদণ্ডও কেন সে উৎপন্ন করে না ব'লে কেউ অনুযোগ করত না।

দেওয়ানি আদালতের এক এজলাসে কয়েক দিন ধ'রে একটা বড় মামলায় মহেন্দ্রনাথ নিযুক্ত আছেন, তারই মধ্যে এসে পড়ল একটা ফৌজদারি মকদ্দমার পূর্ব-নিরূপিত তারিখ। যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হ'য়ে উঠে ফৌজদারি মকদ্দমার মক্কেল বললে, "এ তো বড় বিপদ হ'ল হুজুর।"

চশমার উপর দিয়ে মক্কেলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহেন্দ্রবাবু বললেন, "কেন, কি বিপদ হ'ল ?"

মক্কেল বললে, "যে রকম বুঝাচ্ছ তাতে আপনার দেওয়ানি মামলা এখনো চার পাঁচ দিনের আগে শেষ হবে না,—এদিকে আগামী কাল আমার মামলার তারিখ।"

গম্ভীর স্বরে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "সেটা বিপদ ব'লে মনে করছ কেন ?"

মক্কেল বললে, "আমার মকদ্দমার যখন 'পুকার' (ডাক) হবে, আপনি যদি তখন দেওয়ানি মকদ্দমায় ব্যাপৃত থাকেন ?"

মহেন্দ্রনাথ বললেন, "সে চিন্তা তোমার নয়, আমার। তুমি শুধু তোমার মামলা পুকার হবার আগে আন্দাজমতো আমাকে সংবাদ দিয়ো।"

বর্তমানে কি অবস্থা বলতে পারি নে, যে সময়ের কথা বলছি তখন পূর্ণিয়ায় দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতের মধ্যে ব্যবধান ছিল এক

মাইলের। সেইটেই ছিল ফৌজদারি মামলার মক্কেলের দুশ্চিন্তার আসল কারণ।

পরদিন বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। মহেন্দ্র উকিল তাঁর দেওয়ানি মকদ্দমায় নিজ পক্ষের একটি সাক্ষীকে প্রশ্ন ক'রে সবেমাত্র আসন গ্রহণ করেছেন, অপর পক্ষের উকিল জেরা আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে হন্তদন্ত হ'য়ে ফৌজদারি মকদ্দমার মক্কেল এজলাস কক্ষে প্রবেশ ক'রে মহেন্দ্রনাথের পাশে উপস্থিত হ'য়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "ওকিল সাহেব, চলিয়ে; অব পুকার হোনেবালা হায়।" (উকিল সাহেব, চলুন; এবার মকদ্দমার ডাক হবার উপক্রম হয়েছে।)

মহেন্দ্রবাবু একবার মক্কেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, চশমা খুলে খাপের মধ্যে পুরে পকেটে রাখলেন, পার্শ্বোপবিষ্ট জুনিয়ারের কানে দু-চার কথায় কিছু উপদেশ দিলেন, তারপর চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে হাকিমের নিকট অনুমতি গ্রহণ ক'রে এজলাস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা পেরিয়ে প্রাঙ্গণে অবতরণ ক'রে বললেন, "কাঁহা? সবারি কাঁহা?" (কোথায়? যান কোথায়?)

অদূরে এক ব্যক্তি লালচে রঙের একটা ঘোড়ার লাগাম ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। বেঁটে-খাটো নাদুস-নুদুস মসৃণ-দেহ ঘোড়া; পিঠের উপর যথেষ্ট পুরু ধপধপে সাদা রঙের শয্যা, তার চতুর্দিকে লাল শালুর ঝালর; দুটো সমান্তরাল চওড়া মজবুত ফিতে দিয়ে ঘোড়ার পেটের সঙ্গে শয্যা ক'রে বাঁধা। গতিলাভের উদ্দেশ্যে ঘোড়া সামনের দক্ষিণ পা দিয়ে ঈষৎ অধীরভাবে মাটি খুঁড়ছে।

সেই ঘোড়াটা দেখিয়ে মক্কেল বললে, "সবারি উয়হ ঘোড়া। দুসরা সবারি নহি মিলা হজুর।" (সওয়ারি ঐ ঘোড়া। অন্য সওয়ারি পাওয়া গেল না হুজুর।)

শুনে মহেন্দ্রবাবুর তো চক্ষুস্থির! প্রতিবাদ-কঠোর স্বরে বললেন, "ঘোড়ামে হম্ কভি নহি যায়গা। হম্ ঘোড়া চড়নে নহি জানতা হ্যায়।" (ঘোড়ায় আমি কখনো যাব না। আমি ঘোড়া চড়তে জানি নে।)

কাতর কণ্ঠে মক্কেল বললে, "ইয়হ হমারা খাশ ঘোড়া হ্যায় হুজুর। বড়া ঠণ্ডা জানবর। কুছ ডর নহি হ্যায়, খুশিসে আপ বৈয়ঠ রহিয়ে,—ঘোড়া সলতনৎসে আপকো পঁহুচা দেগা।" (এ আমার খাশ ঘোড়া হুজুর। ভারি ঠাণ্ডা জানোয়ার। কোনো ভয় নেই। সানন্দে আপনি ব'সে থাকবেন, ঘোড়া নিরাপদে আপনাকে পৌঁছে দেবে।)

মহেন্দ্রবাবুর কিন্তু সেই এক কথা, ঘোড়াতে তিনি চড়বেন না। বললেন, "গাড়ি লে আও।"

মক্কেল বললে, "ফৌজদারি দিবানি কঁহি গাড়ি নহি মিলা হুজুর। সব গাড়ি চলা গিয়া হ্যায়, চার বজেকা পহলে কোই গাড়ি নহি আবেগা।" (ফৌজদারি দেওয়ানি কোনো আদালতে গাড়ি পাওয়া গেল না হুজুর। সব গাড়ি চ'লে গেছে, চারটের আগে কোনো গাড়ি আসবে না।)

তারপর হাত জোড় ক'রে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললে, "মেহেরবানি করকে চলিয়ে হুজুর! দের হো রহা হ্যায়। আপ বহস্ নহি করনেসে জিহল হো যায়গা,—মর্ যাঙ্গে।" (দয়া করে চলুন হুজুর। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। আপনি বক্তৃতা না করলে জেল হ'য়ে যাবে, মারা পড়ব।)

মকদ্দমায় অভিযোগ যা, তা কাটাতে না পারলে দীর্ঘ-মেয়াদ জেল হবারই কথা। ধর্মভীরু মানুষ, বিবেকে আঘাত লাগল, রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "ক্যায়সে উঠেগা ঘোড়ামে?"

এ কথা শুনে মক্কেল হাতে স্বর্গ পেলে। উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বললে,

"হামলোগ উঠা দেগা, আপ বেফিকির রহিয়ে।" (আমরা উঠিয়ে দেবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।)

তারপর তিন চার মিনিট ধ'রে তোলাতুলি ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তির যে অদ্ভুত ব্যাপার চলল, তা দেখবার জন্য মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে জন পঞ্চাশেক কৌতুকোচ্ছল দর্শক জ'মে গেল। যেন একটা কোনো জাদু-মন্ত্রে মহেন্দ্রনাথের দেহ একটা ময়দার তালে পরিণত হয়েছে, দেহের মধ্যে কোনো কালে যে স্নায়ুমণ্ডলী নামে পদার্থ ছিল, তা তাঁর অতি শিথিল দেহ দেখে বোঝবার উপায় নেই।

যা হোক, বহু পরিশ্রমে মক্কেল দুজন ঠেলাঠেলি টানাটানি ক'রে ঘোড়ার পিঠে মহেন্দ্রনাথকে বসিয়ে দিয়ে বললে, "অব থোড়া সিধা হোকে বৈঠিয়ে ওকিল সাহেব।" (এবার একটু সোজা হ'য়ে বসুন উকিল সাহেব।)

মহেন্দ্রনাথের এক দিকের পাঁজর আর পাছা অকারণ খানিকটা বাইরের দিকে ঠেলে এসেছিল, আর ঠিক সেই অনুপাতে মুণ্ডখানা বিপরীত দিকে হেলে পড়েছিল। অবাক হ'য়ে তিনি ভাবছিলেন, কাঠের চেয়ারের ওপর তার যে-দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোজা হ'য়ে ব'সে থাকে, ঘোড়ার পিঠে উঠে তার এ কি আচরণ! সোজা হয় না কেন? মক্কেল-দিগকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "হম্ সিধা নহি হো সকতা হায়, তুম লোক সিধা কর দেও।" (আমি সোজা হ'তে পারছি নে, তোমরা সোজা ক'রে দাও।)

ক্ষণকাল সোজা করবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে মক্কেলরা মনে মনে স্থির করলে, হ'লেই বা একটু বাঁকা, নিয়ে গিয়ে ফেলা যাক তো ঐ অবস্থায়। বাঁকাকে সোজা করতে করতে ওদিকে পুকার যদি হ'য়ে যায়, তা হ'লে আসল জিনিসই যাবে বেঁকে।

ঘোড়াটা ছিল পুরোদস্তুর মামলাবাজ। অর্থাৎ আদালতে এলেই সে জানত, গৃহে ফেরবার পূর্বে রৌদ্র পীতাভ হ'য়ে অপরাহ্ণ সূচিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বার কয়েক দেওয়ানি থেকে ফৌজদারি এবং ফৌজদারি থেকে দেওয়ানি যাতায়াত করতেই হবে। সুতরাং বেলা সাড়ে বারোটার সময়ে তাকে দেওয়ানি আদালত থেকে ছেড়ে দিলে সে যে সোজা ফৌজদারি আদালতে গিয়ে হাজির হবে, তা একেবারে অবধারিত। মনে মনে এইরূপ বিচার ক'রে মক্কেলদের মধ্যে একজন অবিলম্বে লাগামটা মহেন্দ্রবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক হ'তে অপরে মুখে শব্দ ক'রে উঠল, হ্যাট হ্যাট। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র অভ্যাস অনুযায়ী ঘোড়া মৃদুমন্দ দুলকি চালে অগ্রসর হ'ল ফৌজদারি আদালতের অভিমুখে।

মহেন্দ্রবাবু জানতেন, নিস্তরঙ্গ জলে নৌকা চ'ড়ে যাওয়ার মতো, ঠাণ্ডা জানোয়ারের পিঠে চ'ড়ে মসৃণ গতিতে ফৌজদারি আদালতে গিয়ে উপস্থিত হবেন। কিন্তু এ কি! এ যে গা দোলায়! মাথা ঘোরায়! তবে?

দু হাত বাড়িয়ে মহেন্দ্রবাবু ঘোড়ার পিঠের উপর সটান শুয়ে পড়লেন, তারপর দুই বাহু দিয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধ'রে চক্ষু বুজে মনোযোগ সহকারে চিৎকার করতে লাগলেন, পকড়ো! পকড়ো! পকড়ো! পকড়ো!

পিছন দিকে বহুজনের মিলিত কণ্ঠের একটা উচ্চ হৈ-হল্লা শোনা গেল,—উপস্থিত উদ্ভট অবস্থার রসাস্বাদনের কৌতুকে, অথবা মহেন্দ্রনাথের শারীরিক বিপদের আশঙ্কার আতঙ্কে তা ঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে ঘোড়া সমানে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে। দুই চক্ষু বুজে তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধ'রে একমনে মহেন্দ্রবাবু হেঁকে চলেছেন, পকড়ো!

পকড়ো! পকড়ো! পকড়ো! আর ঘোড়ার সঙ্গে দুই পাশে দৌড়তে দৌড়তে মক্কেলরা মৃদু স্বরে ঘোড়াকে উত্তেজিত ক'রে চলেছে, হ্যাট্! হ্যাট্! হ্যাট! হ্যাট! তারা স্থির জানে, পথের মাঝখানে একবার নামালে আর মহেন্দ্রবাবুকে চড়ানো অসম্ভব হবে। সুতরাং সেরূপ কাঁচা কাজের চিন্তা পর্যন্ত না ক'রে তারা উৎসাহ ভরে ব'লে চলল, হ্যাট! হ্যাট! হ্যাট! হ্যাট! আর ঠিক যেন তার উত্তরেই একান্ত নিষ্ঠার সহিত মহেন্দ্রবাবু হেঁকে চললেন, পকড়ো! পকড়ো! পকড়ো! পকড়ো!

সে নিস্তেজ একটানা হাঁকার না ছিল ওঠা, না ছিল নামা,—না ছিল বিরাম, না ছিল বিরতি। এমন কি তার মধ্যে ক্রোধ অথবা বিরক্তির কোনো স্পর্শও যেন ছিল না—এমনই নির্বিকার এবং নির্বিকল্প সে হাঁক।

সমস্ত পথটা এই অদ্ভুত ব্যাপার চলতে চলতে অবশেষে ফৌজদারি আদালতের এজলাস ঘরের নিকটে ঘোড়া এসে স্থির হ'ল।

বিনীত কণ্ঠে ঈষৎ অপ্রতিভ স্বরে মক্কেল বললে, "অব উৎরা যায় হুজুর।" (এখন নামা হোক হুজুর।)

তখনও মহেন্দ্রবাবু চোখ বুজে ছিলেন, চেয়ে দেখে ঘোড়ার গলা ছেড়ে মক্কেলের গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে পড়লেন। তারপর মৃত্তিকার স্পর্শে সহসা যেন এক নিমিষে শিথিল স্নায়ুমণ্ডলীর সমস্ত হারানো শক্তি ফিরে পেয়ে কঠিন হ'য়ে উঠে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "উল্লু কাঁহা কা! হামারা আধা জান নিকাল দিয়া হ্যায়! যাও, তুমারা মুকদমা হম্ নহি করেগা।" (উল্লুক কোথাকার! আমার অর্ধেক প্রাণ বার ক'রে দিয়েছ। যাও, তোমার মামলা আমি করব না।)

হাত জোড় ক'রে অনুতপ্ত স্বরে মক্কেল বললে, "ছমা কিয়া যায় হুজুর।" (ক্ষমা করা হোক হুজুর।)

তীব্র কণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বললেন, "ছমা? হম্ তুমহারা 'বরখিলাপ'

তোর এক নম্বর ফৌজদারি দায়ের করে গা।" (ক্ষমা? আমি তোমার বিরুদ্ধে আর একটা ফৌজদারি মামলা দায়ের করব।)

ওদিকে ঠিক এই সময়ে এজলাসের বারান্দায় মক্কেলের নামে পুকার হয়েছে। দ্বিতীয় নম্বর ফৌজদারি মামলার ভীতি প্রদর্শন আপাতত মুলতুবি রেখে ধর্মভীরু মহেন্দ্রনাথ উর্ধ্বশ্বাসে এজলাসের অভিমুখে ছুটলেন। তাঁর উৎসাহদ্রুত গতির কাছে মক্কেলও পেছিয়ে পড়ল।

হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হ'য়ে আসল পালা। কেশববাবু ইতিপূর্বেই ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলেন, আমি এবং মোক্তার সাহেব—দুই প্রহসন—যখন অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হলাম, তখন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটা উদ্দাম কৌতুক রসের প্রবর্তনা হ'ল। আসল পালার করুণ রস আগেই চুকে বুকে গিয়েছিল।

আহত, অর্ধাহত এবং অনাহত আমাদের তিনজন পরাজিত সৈনিককে নিয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বন্ধুগণ ষ্টিমার ছেড়ে দিলেন। কথাবার্তায়, আহারে, গানে, মহেন্দ্রবাবুর বেহালা বাদনে দেখতে দেখতে প্রত্যাবর্তনের পালা জ'মে উঠল।

উপসংহারটুকু বলি। আমার দেহের বেদনা মরতে দিন তিনেক লেগেছিল। কেশববাবু কিন্তু দশ দিন কাছারি যেতে পারেন নি।

পূর্বেই বলেছি, দুর্ঘটনার ফলে জীবনে দুবার মৃত্যু একেবারে আমার সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়ে, কি কারণে বলতে পারি নে, হয়তো দয়াপরবশই হ'য়ে ফিরে গিয়েছিল। দুবারের একবারও মহিষারূঢ় দণ্ডপাণি যমরাজ নিজে উপস্থিত হবার নতি স্বীকার করেন নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ বিনা নোটিশে কোনও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে পরপারে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হ'লেই সম্ভবত তিনি নিজে উপস্থিত হ'য়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ ক'রে দেন। করোনারি থ্রম্বোসিস বোধ করি তাঁর খাস এলাকার ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে তিনি দুবারই দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বারের দূতের আয়ুধ ছিল ভীষণ এক গোক্ষুর সর্প; দ্বিতীয় বারের মত্ত হস্তী। মত্ত হস্তীর কথা সবিস্তারে বলেছি; এবার সর্পের কাহিনী বলি।

মানুষের পক্ষে যে-সকল জীবজন্তু সাংঘাতিক, এক দিক থেকে বিচার করলে তার মধ্যে সাপই বোধ হয় সবাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। সাবধানতা অবলম্বনের দ্বারা অপরাপর মারাত্মক প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাবার যতটা সুযোগ আছে, সাপের হাত থেকে তার তুলনায় প্রায় কিছুই নেই। লোকে তাই কথায় বলে, 'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা'। বাঘের সহিত সামনাসামনি দেখা না হ'লে ভয়ের কথা থাকে না; কিন্তু সাপের কথা যদি অদৃষ্টলিপিতে লেখা থাকে, তা হ'লে সাবধানতার কোন পরিমাণই তাকে নিবারিত করতে পারে না।

বাঘ বাস করে লোকালয় হ'তে দূরে গভীর অরণ্যে। সেখানে আমরা যদি না যাই, অথবা যথেষ্টরূপে অস্ত্রান্বিত হ'য়ে যাই, তা হ'লে বাঘের হাতে মৃত্যু এড়িয়ে চলতে পারি। কিন্তু সাপ নিয়ে আমরা গৃহে বাস করি, এমন কি, কখনো-সখনো সাপ নিয়ে শয়নকক্ষের হুড়কাও

লাগাই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের কথা, জামসেদপুরে এক অ-বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাত্রে তাঁর শয়নকক্ষের পালঙ্কে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে পায়ের আঙুলে কি যেন পিনের মতো ফুটল। আলো জেলে দেখা গেল, ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড গোখরো সাপ। অবিলম্বে ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যা কিছু উপায় অবলম্বন করবার ছিল সবই করা হ'ল, কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

বিষধর সর্পের দংশন মোটামুটি তিন প্রকারের দেখা যায়—টিপ, ছোবল আর ছড। টিপ-দংশন সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। গোখরে সাপ যখন মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় অথবা আক্রান্ত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ এবং হিংসাপরবশ হ'য়ে চরমতম অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে দংশন করে, তখন ডাক্তারের ইনজেকশন করার মতোই একটা ব্যাপার ঘটে। দুটি বিষদন্ত দিয়ে মানুষের শরীরের চর্ম বিদ্ধ ক'রে দন্তমূলে সঞ্চিত বিষ সে দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেয়। আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে শুধু দেখা যায়, ফুলস্টপের আকারের কালো রঙের পাশাপাশি স্থাপিত (. .) দুটি বিন্দু। এই চিহ্ন গভীর উদ্বেগের কারণ সূচিত করে।

উত্যক্ত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ হ'য়ে গোখরো সাপ যখন মানুষের দেহে ছোবল মারে, তখনও সে যথাসম্ভব বিষ অনুপ্রবিষ্ট করবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সময়ের অল্পতা এবং বাগের অসুবিধা হেতু ততটা পরিমাণে পারে না, যতটা পারে টিপ-কামড়ের বেলায়। ক্ষতস্থান থেকে খানিকটা চামড়া এবং মাংস উঠে আসে, যার ফলে সামান্য রক্তপাতও হয়। কিন্তু অনুরূপ টিপ-কামড়, ছোবল-কামড়ের স্থলে পাশাপাশি বিন্দু দুটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিচর্যা তৎপর এবং উচ্চাঙ্গের হ'তে পারলে ছোবল-কামড় থেকে অনেক রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা যায়।

তিন প্রকার কামড়ের মধ্যে ছড়-কামড়ই নিরীহতম। একমাত্র গৃহনিবাসী বাস্তু সাপের দ্বারাই খোসমেজাজে এবং ক্রীড়াচ্ছলে ছড়-কামড় সম্ভব। হয়তো আমি পালঙ্কের উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে গল্প করছি আর মৃদু মৃদু পা দোলাচ্ছি; ইত্যবসরে একটি গোখরো সাপ আমার পদ-আন্দোলনের দ্বারা প্রেরণা লাভ ক'রে তাঁর আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে আমার পায়ের নিকটে ফণা বিস্তার ক'রে ব'সে ঐকতালে দুলতে আরম্ভ করেছেন। দুলতে দুলতে হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে আনন্দাধিক্য ঘটায় দিলেন হয়তো আমার পা একটু আঁচড়ে। এই আঁচড়েরই নাম ছড়-কামড়। ছোবল-কামড় থেকে টিপ-কামড় যত উগ্র, ছড়-কামড় থেকে ছোবল-কামড়ও ঠিক ততই উগ্র। সুতরাং ছড়-কামড়ের মূলে আনন্দের উত্তেজনা যদি তেমন গভীর না হয়, তা হ'লে ছড়-কামড় থেকে উদ্ধার লাভ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার না হ'তে পারে।

উত্ত্যক্ত, আক্রান্ত অথবা ভীত না হ'য়ে শুধু অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই সাপ যে অনেক সময় অনিষ্ট করে, তার দৃষ্টান্ত জামসেদপুরের নিদ্রিত নিরীহ ভদ্রলোককে দংশন। হ'তে পারে সাপ যখন তাঁর পায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, সংযোগক্রমে ঠিক সেই সময়ে তিনি পা নেড়েছিলেন; কিন্তু তাই ব'লে নিদ্রিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চরমতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ক্রূরতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমার মনে হয়, সাপের বিষকোষে বিষের সঞ্চয় মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠার ফলে সাপ যখন অপরিমিত মাত্রায় উত্তেজনা বোধ করতে থাকে, তখন বাড়তি বিষটা পরিত্যাগ ক'রে নিজেকে খানিকটা সহজ ক'রে নেবার জন্যে সে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। সে সময়ে নিদ্রিত মানুষের নিরপরাধ পায়ের আঙুলও তার হিংস্র ব্যবহার থেকে রেহাই পায় না।

সর্পযোগ ব'লে কোন বস্তু একান্তই যদি থাকে, তা হ'লে আমার বাল্য

এবং যৌবনকালে কিছুদিন ধ'রে সে যোগের একটা সজোর পালা চলেছিল। এমনই জোরালো সে পালা যে, এক-এক সময়ে আমাকে মনে করিয়ে ছাড়ত, কোনদিন হয়তো সাপের হাতে (সাপের হাতে কেমন ক'রে হবে? —দাঁতে) প্রাণ দিয়েই-বা আমাকে সে সাংঘাতিক যোগের উদ্‌যাপন করতে হয়। নড়তে চড়তে, ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে আমার সজ্ঘর্ষ বাধত সাপের সঙ্গে।

ভাগলপুরে অবস্থান কালে বন্ধুবর অমরেন্দ্রনাথ দাস এবং আমি মাঝে মাঝে সান্ধ্য-ভ্রমণে নির্গত হতাম। আমাদের উভয়ের হাতেই একটি ক'রে ছড়ি থাকত। আমার মনে আছে, আমার ছড়ির সাহায্যে বন্ধুবর গোটা পাঁচ-ছয় সর্প হত্যা করেছিলেন। যখনই তিনি বলতেন "দিন তো আপনার লাঠিটা" তখনই আমি বুঝতাম, বুকে-হাঁটা মানুষের পরম শত্রু নিকটবর্তী হয়েছে। অমরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-আদর্শপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন ব'লেই যে নিজের লাঠির অহিংসত্ব বজায় রাখবার জন্য সর্পহত্যার কাযে আমার লাঠি ব্যবহার করতেন, এমন ইঙ্গিত নিশ্চয়ই করছি নে, আমাদের উভয়ের শারীরিক দৈর্ঘ্যের অসমতার সরল অনুপাতের হিসাবে আমার লাঠি তাঁর লাঠির চেয়ে ছয় ইঞ্চিটাক দীর্ঘতর ছিল ব'লেই তিনি আমার লাঠি ব্যবহার করতেন। বিষধর আততায়ীকে আমার লাঠির দ্বারা আরও ইঞ্চি ছয়েক দূরে রেখে হত্যা করা চলত। যে সাপগুলিকে আমার লাঠির দ্বারা মারা হয়েছিল, তার অধিকাংশই করেত। সব সাপই বধির, কিন্তু করেত নাকি এতই বধির যে, দুদান্ত সাপের রোজার মন্ত্রও তার কর্ণে প্রবেশ করে না।

এ সকল সামান্য কথা এখন থাক্, আমার সর্পযোগ পালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান কেমন ক'রে হয়েছিল, এবার সেই কথাটা বলি।

আমরা তখন পূর্ণিয়ায় থাকি। আমার বয়স বছর দশেকের বেশি

হবে না। বেলা বারোটার কাছাকাছি আমার সরোজিনীদিদি ও আমি আমাদের উঠানে খেলা করছি। বৃহৎ উঠান, নানা গাছপালা-ঝোপ-ঝাড়পূর্ণ। ইমারতের কোলে প্রকাণ্ড রক—গোটা চারেক সিঁড়ি ভেঙে রক থেকে উঠানে অবতরণ করতে হয়। সিঁড়ির দু পাশে যূঁই গাছের দুই বৃহৎ ঝাড়,—ফুল যখন ফোটে, তখন স্নিগ্ধ সুমিষ্ট গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আমাদের একটা ধারণা ছিল, যূঁই গাছের তলায় সাপ আশ্রয় বাঁধে।

পিতাঠাকুর মহাশয় বহুক্ষণ কাছারি গেছেন, সদ্যোমাত্র আহার সমাপন ক'রে উঠে রকে দাঁড়িয়ে মাতাঠাকুরাণী তাঁর প্রিয়-বান্ধবী সভ্যাগতা শশীবাবুর মার সহিত কথা কইছেন। শশীবাবু পূর্ণিয়ার কালেক্টারিতে কাজ করেন, তাঁর বাসা আমাদের গৃহের সন্নিকটেই।

প্রতিদিনই শশীবাবুর মা আমাদের গৃহে বেড়াতে আসতেন, কিন্তু তিনি আসতেন অপরাহ্ণকালে, ঘণ্টা দেড়েক-দুই গল্পগুজব ক'রে, কোনো-দিন বা মার মুখের গান শুনে, বাবুরা স্কুল অফিস আদালত থেকে ফেরবার পূর্বে বাড়ি ফিরে যেতেন। সেদিন অমন বেপোট সময়ে তাঁর নিজের কোনো কাজের জন্য এসেছিলেন কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু এ কথা বলতে পারি, আমার ভাগ্যদেবতা কর্তৃক প্রেরিত হ'য়েই সেদিন তিনি এসেছিলেন একান্তভাবে আমার রক্ষিকারূপে। সেদিন যদি তিনি না আসতেন, তা হ'লে সেদিনকার সম্ভাব্য শোচনীয় কাহিনী বহুদিন পূর্বেই বিস্মৃতির তিমিরগর্তে ডুব মারত।

সেদিন আমি ও আমার সরোজিনীদিদি কি খেলা খেলছিলাম তা বলতে পারি নে, হঠাৎ এক সময়ে আমার দক্ষিণ পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে কি যেন ফুটে গেল, আর সেইখানটা চনচন ক'রে জ্ব'লে উঠল। তাকিয়ে দেখি, একটি হাত দুই-আড়াই লম্বা সাপ আমার আঙুলের উপর দংশন-

কার্যটি সমাধা ক'রে লীলায়িতভাবে স'রে পড়ছেন। খুব যে ব্যস্ত হ'য়ে ত্বরিতগতিতে তা নয়; অল্প একটু জায়গা জুড়ে বেশ একরকম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঈষতোন্নত মুখ এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে চতুর্দিক দেখতে দেখতে এক অপরূপ ভঙ্গীতে। শুনেছি, দংশন করবার অব্যবহিত পরে বিষক্ষয় হেতু সাপ খানিকটা দুর্বল ও অলস হ'য়ে পড়ে, বেশি দূরে স'রে পড়তে পারে না, কাছাকাছিই ঘুরে বেড়ায়।

সাপ দেখামাত্র আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, "মা! আমাকে ঐ সাপটা কামড়ালে।"

আমার কথা শুনে আর সাপটাকে দেখতে পেয়ে "ও মা, আমার ছেলে গেল!" ব'লে মা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। গোলযোগ শুনে চাকররা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে সাপটাকে মেরে ফেললে।

এ সকল কিন্তু অবান্তর ব্যাপার—আসল কাজ চলছিল রকের উপর শশীবাবুর মায়ের দ্বারা। তাড়াতাড়ি আমাকে রকের উপর টেনে এনে সামনের একটা দড়ির আলনা এক টানে ছিঁড়ে নিয়ে তিনি আমার পায়ে অতিশয় শক্ত ক'রে বাঁধন দিচ্ছিলেন। শশীবাবুর মায়ের কাঁধে হাত রেখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন গুরগুর করছিল, আর সমস্ত দেহ মৃদু মৃদু কাঁপছিল; ভয়ে, না দুশ্চিন্তায়, না অসাধারণ ঘটনার তাড়নায় তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

বাঁধন দিতে দিতে শশীবাবুর মা আমাকে অভয় দিচ্ছিলেন, "ভয় কি বাবা? কোনো ভয় নেই। এখ্খনি ভাল হ'য়ে যাবে।"

ভয় যে নেই, সে কথা যেন শশীবাবুর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল। শশীবাবুর মার তখনকার মুখখানি বছর ষাটেক পরে আজও আমার মনের পটে সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হ'য়ে আছে।

চিত্রশিল্পী যদি হতাম, তা হ'লে সেই নিষ্ঠাগভীর স্থির ধীর মুখখানি কাগজের পটের উপরেও এঁকে দেখাতে পারতাম।

কালো মুখখানির চতুর্দিক বেষ্টিত ক'রে ধপধপে থান ধুতির শুচিতা, চার-পাঁচ খিলি পানের চর্বিত তাল গভীর মনোযোগের তাড়নায় নিশ্চল হ'য়ে এক দিকের গালে ঠোস মেরেছে, সমস্ত দেহ অধিকার ক'রে অপরাজেয় সঙ্কল্পের এবং স্থৈর্যের একটা সুদৃঢ় ব্যঞ্জনা। সে অপরূপ মূর্তি কোনদিনই আমার পক্ষে বিস্মৃত হবার বস্তু নয়।

আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই অম্বিকা সুর ডাক্তারের বাড়ি। অচিন্তিত বিপদের বিমূঢ়তায় হকচকিয়ে গিয়ে প্রথমটা কিন্তু ডাক্তার ডাকার কথা কারো খেয়ালই হয় নি। খেয়াল হওয়া মাত্র ডাক্তারের কাছে লোক যখন দৌড়ল, তখন ডাক্তার মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ ক'রে আচমন করছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুরি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র নিয়ে আমার পার্শ্বে উপস্থিত হ'য়ে ডাক্তার সুর প্রথমে আমার নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তারপর মৃত সাপটা একবার দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়ে ক্ষতস্থানে নির্দয়ভাবে কয়েকটা চির টেনে বেশ খানিকটা রক্তপাত করালেন, সর্বশেষে গোটা দুই ঔষধের দ্বারা ক্ষতস্থান বেশ ভাল ক'রে পুড়িয়ে দিলেন।

শশীবাবুর মা একটাই বাঁধন দিয়েছিলেন। প্রচুরভাবে সে বাঁধনের প্রশংসা করতে করতে ডাক্তার সুর 'অধিকন্তু ন দোষায়' নীতি অনুসরণ ক'রে আমার হাঁটুর নীচে ডিমের ওপর আর একটা বাঁধন দিয়ে দিলেন। এই অতিরিক্ত বাঁধনের যথার্থ মর্ম সেদিন কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি, বুঝেছিলাম পরে। এ-বাঁধন সেদিনের কথা ভেবে তত দেওয়া হয় নি, যত দেওয়া হয়েছিল পরদিনের কথা ভেবে। যা কিছু পরিচর্যা হ'তে

পারত, যা কিছু কর্তব্য করবার ছিল, মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যে সমস্তই শেষ হ'য়ে গেল।

কাছারিতে বাবার কাছে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। উন্মত্তের মতো ছুটতে পুড়তে বাবা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন অম্বিকা সুর আমাকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন। আমার বুকের গুরগুরুনি আর দেহের কাঁপুনি দুই ততক্ষণে বন্ধ হয়েছে। সেদিনের ভয়াবহ নাটকের আমি তখন বিজয়ী নায়ক।

বাবাকে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই ডাক্তার সুর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "ভয় নেই গাঙুলী মশায়, ছেলে আপনার ভাল আছে।"

দ্রুতপদে আমার নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বাবা প্রথমে আমার মাথায় হাত রেখে মুদিত নেত্রে মনে মনে বোধ হয় কি আশীর্বাদ করলেন, তারপর ডাক্তার সুরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে করজোড়ে বললেন, "আপনাকে কি বলব অম্বিকাবাবু?"

অম্বিকা সুর বললেন, "যা বলবেন ঐ শশীর মাকে বলুন। সৌভাগ্যক্রমে উনি সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, আর এই প্রথম বাঁধনটি এমন মোক্ষম ক'রে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষে। নচেৎ ছুরি-কাঁচি, ওষুধ-পত্র যেমন এনেছিলাম, তেমনি নিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হ'ত। তা হ'লে ব্যাপারখানা দেখবেন নাকি একবার?"

তারপর একজন চাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "লে আও তো আউর এক দফে।"

পর মুহূর্তেই চাকরটা একটা লাঠিতে মৃত সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হ'ল।

দেখে বাবা শিউরে উঠে চক্ষু বুজলেন। সর্বনাশ! এ যে সাক্ষাৎ কৃতান্ত! তাঁর অতি আদরের কনিষ্ঠ সন্তানকে প্রায় নিয়েছিল টেনে।

বাবার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবার ভয়ে শশীবাবুর মা এই সুযোগে স'রে পড়েছিলেন তাঁর গৃহে। অম্বিকা সুর আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রে প্রস্থান করলেন। যাবার আগে আমার নাড়ী, চোখের কোল, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন এবং উপদেশ দিয়ে গেলেন আমাকে যেন সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখা হয়—এমন কি, রাত্রেও।

এ উপদেশ না দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। বৈকালের দিক থেকে বাঁধনের যন্ত্রণা এমন বেড়ে উঠতে লাগল যে, সে অবস্থায় কার সাধ্য চোখের পাতা বোজে! রাত্রি এগারোটা আন্দাজ ডাক্তার সুর একবার আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে এলেন। কাতরভাবে আমি কাঁদতে লাগলাম, "খুলে দিন, ডাক্তারবাবু, খুলে দিন। ম'রে গেলাম!"

ডাক্তারবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "আচ্ছা, বেশ, এবার যখন আসব, খুলে দেব।" তারপর নাড়ী প্রভৃতি যথাপূর্ব পরীক্ষা ক'রে সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করলেন।

এলেন একেবারে পরদিন বেলা দশটার সময়ে একজন জুনিয়ার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। দুটি নূতন বাঁধন প্রস্তুত ক'রে রাখলেন—বাঁধন খোলার পর কিছু বৈলক্ষণ্য অনুভূত হ'লে পুনরায় তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

খোলা তো দূরের কথা, বাঁধন কাটা নিয়েই গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে। দু দিকের মাংস অসম্ভব রূপ ফুলে ওঠায় শশীবাবুর মায়ের বাঁধন এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মগোপন করেছে যে, কার সাধ্য সে বাঁধনের তলায় ছুরি ঢুকিয়ে কাটে! আড়াআড়িভাবে কাটা তো অসম্ভব, বহুক্ষণ ধ'রে অল্প অল্প ক'রে লম্বালম্বিভাবে ছুরি চালিয়ে চালিয়ে একটা জায়গায় কেটে

ফেলে ডাক্তার সুর কাটার এক প্রান্ত ধ'রে নির্মমভাবে চড়চড়িয়ে বাঁধনটা খুলে ফেললেন। সেই পাশবিক প্রক্রিয়ার তাড়নায় আমি এমন চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম যে, দূর থেকে সে চীৎকার শুনতে পেয়ে চাকরেরা ছুটে এসেছিল।

ষাট বৎসর পূর্বের কথা—কিন্তু দু-চার বৎসর পূর্বেও সে-বাঁধনের দাগ স্পষ্ট দেখা যেত। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষুর কাছে এখনো হয়তো তার অস্পষ্ট দাগ ধরা পড়ে।

প্রথম বাঁধনটা খুলে ডাক্তার সুর নিবিষ্ট মনে আমার নাড়ী টিপে ধ'রে বসলেন। বলা বাহুল্য, আজ এসে প্রথমেই তিনি আমার নাড়ী প্রভৃতি ভাল ক'রে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা নাড়ী ধ'রে ব'সে থেকে কোনো বৈলক্ষণ্য অনুভব না ক'রে তিনি তাঁর-বাঁধা দ্বিতীয় বাঁধনটি খুলে পুনরায় নাড়ী টিপে বসলেন। অবশ্য দ্বিতীয় বাঁধনটা খুলতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেগ পেতে হয়েছিল।

প্রথম বাঁধনের ন্যায় দ্বিতীয় বাঁধন খুলেও প্রায় আধ ঘণ্টা নাড়ী টিপে ব'সে থেকে উৎফুল্ল মুখে ডাক্তার বললেন, "নাঃ, আর কোনো ভয় নেই, ভাল হ'য়ে গেছে।" তারপর আমার দেহে একটু ঠেলা দিয়ে বললেন, "যাও খোকা, ভাল ক'রে খাও-দাও গে। বেঁচে গিয়েছ।"

সাপের বিষ থেকে হয়তো বেঁচে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাঁধনের জ্বালায় তখনো মারা যাচ্ছিলাম। সর্পদংশনের বিষয়ে কবির উক্তি আছে,—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে।"

সত্য কথা যদি বলি, আমার কিন্তু সর্পদংশনে ছুরিকা-চালনায়

অথবা ঔষধ-প্রয়োগে তত যন্ত্রণা হয় নি, যত হয়েছিল বাঁধনের তাড়সে। আমি যদি কবি হতাম, তা হ'লে নিশ্চয় লিখতাম—

কি ব্যথা বাঁধনে বোঝে সে কেমনে
কভু বন্ধনে বাঁধে নি যারে।

এ কথা শুধু রাজনৈতিক বন্ধনের বিষয়েই সত্য নহে, সাপের বাঁধনের বিষয়েও সত্য।

২১

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া
আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই
নাগেরি মাথায় নাচি।"

এ কথা কবি-কল্পনার খুব বেশি অতিশয়োক্তি না হ'লেও মুক্ত বন্ত গোক্ষুর যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ তা শুধু সেই জানে যে কখনো তেমন সাপের সামনা সামনি হ'তে পেরেছে।

আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনে, বিশেষত আমাদের নাগরিক জীবনে, সাপের সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ প্রধানত দুটি উপায়ে আমরা পাই,—প্রথমত সাপুড়ের বিসবিমুক্ত আফিম-খাওয়া সাপের খেলা দেখবার সময়ে, এবং দ্বিতীয়ত চিড়িয়াখানায় পুরু মজবুত কাচের ঘরে সাপ দেখতে দাঁড়িয়ে। এই দুই শ্রেণীর সাপই মানুষের অনিষ্ট সাধন করতে অক্ষম ব'লে মানুষকে তারা সে মূর্তি দেখাতে পারে না, যা পারে স্বাধীন মুক্ত কেউটে গোখরো। তাদের মূর্তিই আলাদা। যে সাপ প্রাণ হরণ করতে পারে না, মন হরণ করতেও সে অক্ষম। উদ্ধত-ছোরা রক্তনেত্র গুণ্ডা আর কোমরে-দড়ি বাঁধা নতমস্তক গুণ্ডার মধ্যে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ দংশনক্ষম মুক্ত গোখরো আর চিড়িয়াখানায় বন্দী গোখরোর মধ্যে। বন্দী গোখরোর খানিকটা পরের ব্যাপার হচ্ছে কাগজে-আঁকা গোখরো; অবশ্য শক্তিশালী শিল্পীর অঙ্কিত গোখরো

এমন সজীব দেখাতে পারে যে, তার মুখের কাছে হাত পড়লে শিউরে উঠতে হয়। তথাপি কাকঃ কাকঃ, পিকঃ পিকঃ।

একবার আমি তিন হাত সাড়ে তিন হাত লম্বা ভীষণ এক খয়ে-গোখরোর পাল্লায় পড়েছিলাম; আর সে পাল্লার মেয়াদ নিতান্ত কম ছিল না,—মিনিট পাঁচেক তো নিশ্চয়ই হবে। আমার জীবনের সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! সেবার আমি দংশন হ'তে রক্ষা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু পূর্ণিয়ার সর্পদংশনের ঘটনা আমার মনের উপর যে পরিমাণ রেখাপাত করেছিল, তার চেয়ে অনেক অধিক পরিমাণে করেছিল সেবারকার ব্যাপার।

পূর্বে বলেছি, আমার জীবনে সর্পযোগের মত একটা ব্যাপার দেখা দিয়েছিল। সেই যোগের গৌণ ঘটনা বিবৃত ক'রে মুখ্য ঘটনার অবতারণা করব।

সে বৎসর আমার খুড়তুত ভাই দেবেনদাদা এবং আমি দুজনেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'লে দেখা গেল, দুর্ভাগ্যক্রমে দেবেনদাদা উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নি। প্রথম দিকে তিনি খুব খানিকটা কান্নাকাটি আপনা-আপনি করলেন, তারপর বিষণ্ণ নির্বাক মুখে এমন এক দুর্মোচ্য গাম্ভীর্যের অবতারণা করলেন যে, মনে হ'ল তার চেয়ে কান্নাকাটি ছিল ভাল।

ফেল করতে না পারার অপরাধে দারুণ অপ্রতিভ হ'য়ে সারাদিন আমি নিঃশব্দ নির্বাক দেবেনদাদার পাশে পাশে দুঃখাত মুখে অবস্থান করছি। সন্ধ্যার পর আমাদের ভাগলপুরের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা ছোট বেঞ্চ পেতে মাটিতে পা রেখে পাশাপাশি দুজনে গভীর চিন্তায় আবিষ্ট হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে আছি। আমাদের পায়ের

ইঞ্চি ছয়েক নীচে সুদীর্ঘ সোপানের প্রথম ধাপ, তার দুটো ধাপ নিয়েই অঙ্গন।

হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের পায়ের নীচের ধাপের ওপর কিসের একটা লম্বা কালো ছায়া পড়েছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ; মাথার ওপর দড়ির আলনা-টালনা কিছু আছে নাকি? তাকিয়ে দেখলাম, না, কিছুই নেই তো। তারপর নীচের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখি, সর্বনাশ! কালো ছায়া কোথায়? এ যে সাক্ষাৎ জীবান্তক কাল সিঁড়ির এক দিক থেকে অপর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পাকা সিঁড়ির শীতলতা দেহে আরাম দান করছে ব'লেই বোধ করি গতি মন্থর, ধীর। আমাদের শরীরের ছয় ইঞ্চির মধ্যে মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হয়েছে, কোনো কারণে বিরক্তি বোধ ক'রে দুজনের দেহের উপর একটু ব্যবস্থা করলেই আর দেখতে নেই।

কিছুকাল পূর্বে দাদার মুখে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সর্পদংশনের কাহিনী শুনেছিলাম। সরকারী কাজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু ফেলে অবস্থান করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পখাটে ব'সে লেখাপড়ার কাজ করছেন, এমন সময়ে তাঁর পাচক লুচির থালা হাতে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখে, একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ খাটের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সে আছে। সাপ দেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে সে যদি লোকজন ডেকে এনে লাঠি-সোঁটা দিয়ে সেটাকে মারবার অথবা তাড়াবার ব্যবস্থা করে তা হ'লে কিছুই হয় না। তা না ক'রে উত্তেজিত কণ্ঠে সে চিৎকার ক'রে উঠল, "বাবু সাপ!"

আচমকা সাপের নাম শুনে "কোথায় ঠাকুর" ব'লে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খাটের উপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লেন, আর

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের উপর উপর্যুপরি তিন-চারবার পড়ল ভীত কুপিত গোখরোর মারাত্মক ছোবল।

ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিস্পন্দ হলেন। তাঁর কর্তব্যবিমূঢ় সন্ত্রস্ত কেরানীর তাড়নায় রোজা ডাকতে লোক ছুটল। ঘণ্টাখানেক দূরের গ্রাম থেকে রোজা এসে যখন দক্ষিণার পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি লাগালে, তার বহুক্ষণ পূর্বেই পরলোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন।

এই কাহিনী থেকে যেটুকু শিক্ষালাভ করেছিলাম, আমাদের বর্তমান অবস্থায় তা পুরোপুরি কাজে লাগালাম। দেবেনদাদার দিকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে গোড়া বেঁধে মৃদুস্বরে বললাম, "ন'ড়ো না, খবরদার! চুপটি ক'রে ব'সে থাকো। আমাদের পায়ের কাছে সাপ।" আগে সাবধান ক'রে দিয়ে সাবধানে সাপের নাম উল্লেখ করলাম; পাছে আমার কণ্ঠস্বর শুনে দেবেনদাদা উত্তেজিত হন, সেই উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র বেগ প্রয়োগ করলাম না।

সভয়ে দেবেনদাদা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে কাঠ হ'য়ে বসলেন। পর মুহূর্তেই সাপটা সিঁড়ির প্রান্তে উপনীত হ'য়ে মাটির দিকে মুখ নীচু করেছে কি করে নি, আর সঙ্গে সঙ্গে বিনা সলা-পরামর্শে পরিপূর্ণ ঐক-মত্যের সহিত আমাদের দু জোড়া পা ঠিক বৈদ্যুতিক সংযোগের ন্যায় সড়াৎ ক'রে বেঞ্চির উপর টেনে নেওয়া! আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের দুজনের পা টানার শব্দে অথবা স্পন্দনে ভয় পেয়েই বোধ হয়, মুহূর্তের মধ্যে সাপটার সিঁড়ির পাশে একটা গর্তর মধ্যে আত্মগোপন করা!

সাপের আবির্ভাবের মাহাত্ম্যে দেবেনদাদার ফেল হওয়ার দুঃখ

সিক্ষের উঠল। "ভাল ক'রে নজর রাখিস উপীন, পালাতে যেন না পারে, আমি লোক ডেকে আনি।" ব'লে দেবেনদাদা ছুট দিলেন।

দেখতে দেখতে গোটা চার-পাঁচ লণ্ঠন সহ বিশ-পঁচিশ জন লোক জ'মে গেল; তাদের মধ্যে চার-পাঁচ জনের হাতে মোটা মোটা লাঠি। গর্তের মুখে লাঠি আর ছড়ি দিয়ে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ হ'ল, কিন্তু সর্প-মহারাজের না পাওয়া যায় সাড়া, না পাওয়া যায় শব্দ। তিনি তাঁর উন্নত শ্রেণীর বিবেচনা-শক্তির সাহায্যে নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন, গর্তের বাইরের অবস্থা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়।

সকলের সমবেত যত্ন এবং প্রচেষ্টা প্রায় হার মানতে বসেছে, এমন সময়ে দীর্ঘ এক শাবল হস্তে রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হ'ল ধনপতিয়া। ধনপতিয়া আমাদের উত্তর দিকে অবস্থিত ঘোষেদের বাড়ির চাকর। তার নধর পুষ্ট দেহের রঙ আলকাতরাকে লজ্জা দেয়, আর দুই চক্ষুর সাদা ক্ষেত ফুলখড়িকে মলিন করে। ঘোষেদের কর্তা জমিদার হেরম্ব-চন্দ্রের খাস পেয়ারের চাকর ব'লে ধনপতিয়ার দেহের জন্য প্রত্যহ আধ-পোয়াটাক খাঁটি সর্ষপ তৈলের ব্যবস্থা; সে ব্যবস্থার সুচিহ্ন প্রমাণ সর্বদা সে নিজের চামড়ার উপর বহন ক'রে বেড়ায়।

ধনপতিয়া এসে সকলকে ঠেলে ঠুলে সরিয়ে নিজে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলে। ছড়ি ও লাঠির উপদ্রব যতটা সহ্য করা গিয়ে-ছিল, শাণিত শাবলের খোঁচা ততটা গেল না। মিনিট দুই-আড়াই মাটি খোঁড়ার পর গর্তর বাইরে একবার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখবার লোভে সর্পমহারাজ, অর্থাৎ একটা দুরন্ত বিষধর কেউটে, ছন্বরিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরেও সে কিন্তু সুবিধা করতে পারলে না, সেখানে তার জন্যে যে সাংঘাতিক ব্যবস্থা উদ্যত হ'য়ে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখা মাত্র সবেগে তা তার মাথা কোমর আর লেজের উপর আছাড়

খেতে আরম্ভ করলে, আর সেই নিরবসর লাঠি বর্ষণের মধ্যেই এক সময়ে ধনপতিয়া শাবল দিয়ে সাপের দেহ আর মাটি একসঙ্গে বিদ্ধ ক'রে গেঁথে ফেললে। নিরুপায় আক্রোশে মরণোন্মুখ সেই দুর্দান্ত বিষধর তিন-চার পাকে শাবলের ডাঁটিটা জড়িয়ে কামড়ে ধরলে। শাবলটার মানুষের মতো প্রাণ ছিল না তাই রক্ষে, নচেৎ হাজার শক্তিশালী রোজাও তাকে সেদিন বাঁচিয়ে তুলতে পারত না।

নিকটে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে দেবেনদাদা ধনপতিয়াকে উৎসাহিত করছিলেন, "এখনো বেঁচে আছে ধনপতিয়া, একেবারে মেরে ফেল্।"

দেবেনদাদার পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি বললেন, "কিছু খড় বিচুলি দেশলাইয়ের বাক্স আর কেরো-সিন তেল দিয়ে একটা চাকরকে গঙ্গার ঘাটে পাঠিয়ে দে।"

গঙ্গার ঘাট আমাদের বাড়ি থেকে আধ মিনিটেরও পথ নয়।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বল তো?"

দেবেনদাদা বললেন, "জানিস নে বুঝি? কেউটে গোখরো ব্রাহ্মণ। কেউটে সাপ মেরে সৎকার না করলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।"

মনে মনে মৃত সাপকে ধন্যবাদ জানালাম। সে বেচারা সাপ হ'য়ে আজ রোজার কাজ করছে,—দেবেনদাদার মন থেকে ফেল হওয়ার দংশনের সমস্ত বিষ সে নামিয়ে দিয়েছে।

আর একদিনের একটা সামান্য কথা বলি। কথাটা সামান্য শুধু এই কারণে যে, একটা বৃহৎ গোখরো সাপ নিয়ে সেদিন আমার জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার স্থিতিকাল বোধ করি সিকি মিনিটও ছিল না। কিন্তু সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্কটটা মারাত্মক পরিণতিও লাভ

করতে পারত। সুতরাং আসলে, কথাটা যত সংক্ষিপ্ত, তত সামান্য নয়।

পূজার ছুটিতে আমরা সপরিবারে ভাগলপুরে এসেছি। তখন আমি কলিকাতায় বি. এ. পড়ি। একদিন অপরাহ্নের দিকে বাইসিকেলে সাবোরের পথে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রত্যাবর্তন কালে ক্লীভল্যাণ্ড রোড দিয়ে পশ্চিম মুখে আসতে আসতে আমাদের গলি মানিক সরকার রোডের মোড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

ক্লীভল্যাণ্ড রোডের মোড় থেকে বাঙালীটোলার গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত সমস্ত পথটা গঙ্গার দিকে প্রায় একটানা ঢালু হ'য়ে নেমেছে। সে ঢাল পদব্রজে ততটা বোঝা যায় না, যতটা বোঝা যায় বাইসিকেলের উপর চ'ড়ে যেতে। মানিক সরকার রোডে প্রবেশ ক'রে বেশ দ্রুতগতিতে নেমে চলেছি। পথের প্রায় শেষপ্রান্তে আমাদের বাড়ি। বাড়ির অতি নিকটে এসে পড়েছি। দক্ষিণে রামবাবুর জঙ্গলে পোড়ো বাগান, বাঁ দিকে বাড়ুজ্জেদের বাড়ি,—আর শতাবধি হাত অগ্রসর হ'লেই আমাদের বাড়ির সামনে নেমে পড়া যায়,—এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে হাত দশ-বারো দূরে একটি বৃহৎ গোখরো সাপ বেশ বনিয়াদি চালে রাম-বাবুর বাগানের দিকে মুখ ক'রে রাস্তা অতিক্রম করছে।

এখন, এই গুরুতর সঙ্কটের অবস্থায় কোন্ উপায় অবলম্বন করলে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, তা ভেবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলাম। ব্রেক ক'ষে সাইকেল থেকে অবতরণ যদি করি, তা হ'লে খুব সম্ভব গোখরোর মুখের ওপরেই গিয়ে পড়ি। সে অবস্থায় দাঁতের সঙ্গে চামড়ার সঙ্গে যে নিদারুণ একটা কাণ্ড হ'তে পারবে, তার চিন্তা পর্যন্তও ভয়াবহ। পথ সেখানটা এমন প্রশস্ত নয় যে, লেজের দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে সব দিক বাঁচিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে যেতে পারি। সাপের

সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায়, সাপের দাঁত থেকে নিজেকে যথেষ্ট দূরে রাখবার আগ্রহে রামবাবুর বাগানের পাশে গভীর নালায় সাইকেল শুদ্ধ যদি পড়ি, সেও নিতান্ত কম বিপদের কথা হবে না।

বাকি রইল তা হ'লে দক্ষিণ ও বাম উভয় দিক বর্জন ক'রে সোজা বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে কার্য সম্পন্ন করবার কালে সাপ যদি কোনো-প্রকারে চাকার পাকির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, তা হ'লে যে যৎপরোনাস্তি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে, তার মধ্যে কে অধিকতর বিপন্ন হবে—সাপ, না, আমি, সে কথা চিন্তা ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠলাম।

এসকল কথা লিখতে যতটা সময় গেল, চিন্তা করতে বোধ করি তার শতাংশের এক অংশও যায় নি। আকাশে বিদ্যুদ্দামের মতো মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চিন্তা মনের আকাশে স্ফুরিত হয়েছিল। হঠাৎ দেখি, দুরবগাহ মনের গোপন পরামর্শে প্যাডেলে জোর দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়েছি। বায়ুবেগে গোক্ষুরকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেলাম। যাবার সময়ে টক্ টক্ ক'রে দুবার বাইসিকেলের চাকা সাড়া দিলে। বুঝতে বাকি রইল না, সর্পরাজকে দুবার চক্রদলিত ক'রে এসেছি।

যে সঙ্কট কিছু পূর্বে সুদুর্মোচ্য মনে হয়েছিল, অতি সহজেই তা থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম। অধিকন্তু, বৃহৎ স্বাধীন গোক্ষুর সর্পের চলন্ত দেহের উপর বাইসিকেল সহ অধিরূঢ় হওয়ার দুর্লভ অভিজ্ঞতা জীবনের সঞ্চয়-ভাণ্ডারকে খানিকটা সমৃদ্ধতর ক'রে তুললে।

তখনো সন্ধ্যার ছায়া খুব বেশি গাঢ় হ'য়ে নামে নি ; চতুর্দিক সুস্পষ্ট-ভাবেই দেখা যাচ্ছে। সাপটাকে দলিত ক'রে এসেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, রামবাবুর বাগানের দিকে সেটা এগিয়ে যাচ্ছে,—তবে আগেকার সে বনিয়াদি চালে নয়, কতকটা যেন ভীত হ'য়ে তাড়াতাড়ি।

খুশিই হলাম। সেও বেঁচে আছে, আমিও বেঁচে গেছি।

২২

আমার জীবনে সর্পযোগের যে কথা পূর্বে উত্থাপিত করেছিলাম, তৎসম্পর্কে ছোট বড কয়েকটি কাহিনীই বলেছি। একান্তে, সহায়সঙ্গীহীন অবস্থায়, পলায়নের পথ বর্জিত একটা অমুক্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে চার হাত সাড়ে চার হাত দীর্ঘ এক করাল গোখরো সাপের সহিত আবদ্ধ হ'য়ে অবস্থান করার যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, সে কথা বলা হ'লেই সর্প প্রসঙ্গের শেষ কাহিনী বলা হয়। সে দিন অমন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ার সময়ে মনে হয়েছিল, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য তখন আর কেউ ছিল না, কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যতবারই সে দিনের কথা স্মরণ করেছি, মনে হয়েছে ভাগ্যে সেদিন অমন বিপদে পড়েছিলাম!

আমি তখন ভাগলপুর গভর্মেণ্ট স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। চৈত্র মাস, শুক্লপক্ষের অষ্টমী অথবা নবমী তিথি; বারোয়ারিতলায় বাসন্তী দুর্গাপূজা চলেছে। তখনকার দিনে ভাগলপুরে বসন্তকালের এই বারোয়ারি পূজা কি বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হ'ত, ইতিপূর্বে তার কিছু বিবরণ দিয়েছি। পূজার কয়েক দিন ভাগলপুরের বাঙালী জনসাধারণের স্নানাহারের সময় থাকত না। বিখ্যাত যাত্রাদলের পালা, সুপ্রসিদ্ধা পান্নাসুন্দরীর কীর্তন, বাইনাচ, চণ্ডীর গান, কথকতা, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, একটা না একটা কিছু সব সময়ে লেগেই থাকত।

সেদিন খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালা ভূষণ দাসের অভিমন্যুবধের পালা। সন্ধ্যার সময়ে আরতির পর রাত্রের আহার সমাপন ক'রে আসবার জন্য

ঘণ্টা খানেকের বিরতি; তারপর ঘণ্টা দেড়েক দুই কীর্তনগান; তৎপরে রাত্রি দশটা থেকে যাত্রার আসর।

কীর্তন শেষ হওয়ার পর দর্শকগণকে সরিয়ে সরিয়ে বসিয়ে যাত্রার বৈঠকের উপযুক্ত ক'রে পুনরায় আসর নূতনভাবে সজ্জিত করা হ'ল, তারপর ক্রমশ ধীরে ধীরে বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বাদকগণ উপস্থিত হ'য়ে বাঁধাবাঁধি ঠোকাঠুকি আরম্ভ ক'রে দিলে। যৎপরোনাস্তি নীরস ও বিরস বাঁধাবাঁধির এই পালা আসল পালার অবশ্য দেয় মাশুল বিবেচনায় শ্রোতাগণ ক্ষণকাল হারমোনিয়মের সুরের সহিত তানপুরার তার, বেহালার তাত এবং তবলা ও পাখোয়াজের চামড়ার মিলন প্রচেষ্টা ধৈর্যসহকারে সহ্য করলে; কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রগুলির সুর মোটামুটি ভিড়ে আসার পরও যখন সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর মিলনের কাজ চলতে লাগল, যখন তবলার ঘাটে ঘাটে চাঁটি মেরে তবলাবাদক কান নুইয়ে নুইয়ে সুরের ঐক্য পরীক্ষা ক'রে চলল এবং বেহালা-বাদকগণ তাদের তাতে টুং টাং শব্দ ক'রে ক'রে বেহালার কানে মোচড় দেওয়া চালাতে লাগল, তখন অগত্যা ধৈর্য হারিয়ে দর্শকগণ নিজেদের মধ্যে গল্প আরম্ভ ক'রে দিলেন। দেখতে দেখতে কথোপকথনের ভন্‌ভনানিতে আসর সরগরম হ'য়ে উঠল।

কীর্তনগানের পর সামান্য কিছু লোক উঠে গিয়েছিল, এখন কিন্তু দলে দলে নূতন লোকের আগমনে আসর ঠেসে উঠতে লাগল। আমাদের বাড়ি থেকে সকলেই এসেছিলেন, শুধু বাবার শরীর অসুস্থ ব'লে তিনি বাড়িতে ছিলেন।

আমি ও আমার বন্ধু সুশীলকুমার মৈত্র আসরের এক জায়গায় স্থান ক'রে নিয়ে ব'সে গল্প করছিলাম। হঠাৎ সুশীল বললে, "ওরে উপীন, ভারি তেষ্টা পেয়েছে, লেমনেড খাওয়াবি?"

বললাম, "সঙ্গে পয়সা নেই তো সুশীল।"

সুশীল বললে, "এখনো তো দেরি আছে, চল্ না, বাড়ি থেকে নিয়ে আসবি।"

বুঝলাম, তৃষ্ণা নিবারণ সুশীলের মুখ্য কথা নয়—লেমনেড পান করাই আসল কথা; কারণ পয়সা ব্যতীতও বারোয়ারিতলায় তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। অল্পদিনের আবিষ্কারের বস্তু ব'লে লেমনেড তখনো তার নূতনত্বের গৌরব হারায় নি; তখনো লেমনেড শৌখিন ও ধনী ব্যক্তিদের বিলাসের সামগ্রী। বিহারের পান-সিগারেটের দোকানদারেরা তখনো লেমনেডকে লিম্নেড বলতে শেখে নি, বলে—মিঠা পানি। সুশীলের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে উভয়ে আসর ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।

সুশীল ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রুচির ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের ছিল পনের আনা মতৈক্য। যে গান আমার ভাল লাগত, সুশীল সে গান অপছন্দ করত না, যে সাহিত্য সুশীল পছন্দ করত, সে সাহিত্য আমাকেও আনন্দ দিত। শুধু রুচির ক্ষেত্রেই নয়, তদপেক্ষা একটা প্রবলতর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যের ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের ছিল মতের এবং কাজের আশ্চর্য মিল। আমার কাজের সময়ে সুশীল উপস্থিত হ'য়ে আড্ডা দিয়ে আমার কার্য পণ্ড ক'রে যেত, সে সহৃদয়তার ঋণ আমি পরিশোধ ক'রে আসতাম তার কাজের সময়ে উপস্থিত হ'য়ে আড্ডা দিয়ে তার সময় নষ্ট ক'রে। এ শোধ-পরিশোধ আমরা কিন্তু আদৌ কোনো প্রকার প্রতিশোধপরায়ণতার বশবর্তী হ'য়ে করতাম না; নিতান্তই সহজ সৌজন্যের আদান-প্রদানের হিসাবে করতাম।

সুশীলের মেধা ছিল তীক্ষ্ণ শ্রেণীর। সে মেধার ফুল ফুটত অবশ্য সুশীলের নিজের গাছেই; কিন্তু সে ফুলের ফল ফলত অপরের গাছে। সুশীলের কাছে পড়া বুঝে নিয়ে সুশীলের সহপাঠী পরীক্ষার খাতায় যতটা

ফল লাভ করত, নিজের খাতায় সুশীল তার অর্ধেকও লাভ করতে পারত না। আমার বিশ্বাস, কোনো দেবযানী কখনো সুশীলকে অভিশাপ দিয়েছিল—

"তুমি শুধু ভারবাহী হবে,
করিবে না ভোগ ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

কিন্তু সে যাই হোক, সুশীল যদি সাধারণ আয়ুর মধ্যে বেঁচে থাকত, যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দান্ত প্লেগ ব্যাধি তাকে যদি অকালে হরণ ক'রে নিয়ে না যেত, তা হ'লে অবহেলা অনাদরেও তার প্রতিভা সার্থকতার একটা পথ ক'রে নিতে পারত, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আর সে সম্ভাবিত সার্থকতার পথ যে সাহিত্যেরই পথ হ'ত, সে কথাও কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলতে পারি।

ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল সুশীলের। আমার যতটুকু ইংরেজী ভাষার বোধ ছিল, তাতে সুশীলের ইংরেজী কবিতা আমার ভালই লাগত। সে তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাত্র দুজনকে তার কবিতা দেখাত ;—আমাকে আর আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী পূর্বোক্ত হেরম্বচন্দ্র ঘোষের পুত্র অনাদিকে। আমি কবিতা প'ড়ে খুশি হ'য়েই নিরস্ত হতাম ; অনাদি কিন্তু আরও খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে তার সংশোধনকার্যও চালাত। আর, সে কি সাধারণ চালানো ? ছন্দঃপাত থেকে আরম্ভ ক'রে বৈয়াকরণ অশুদ্ধি ও অলঙ্কারবিভ্রাট পর্যন্ত চার-পাঁচ শ্রেণীর সংশোধনের দ্বারা অনাদি কবিতা বেচারার দেহে আর রাখত না কিছু। তারপর লাল কালির সংশোধনে রক্তাক্ত কবিতা সুশীলের হাতে ফেরত দিয়ে বলত, "তেমন সুবিধের হয় নি।" ম্লান মুখে কবিতাটা ভাঁজ ক'রে সুশীল পকেটে পুরত।

এক-আধবার নয়, সদা-সর্বদাই এমন ব্যাপার ঘটত।

বহুদিন আর সুশীলের কবিতার সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি। হয় আর লেখেই না, নয় লিখলেও আমাদের কাছে নিয়ে আসে না। একদিন সকালবেলা হাজির হ'য়ে আমার হাতে এক খণ্ড কাগজ দিয়ে সুশীল বললে, "প'ড়ে দেখ্ তো উপীন, কেমন হয়েছে।"

বলা বাহুল্য, কাগজখানা সুশীলের রচিত ইংরেজী কবিতা।

প'ড়ে দেখে সুশীলের হাতে কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "বেশ চমৎকার হয়েছে।"

সুশীল বললে, "তুই তো ফি বারই তাই বলিস। অনাদি কি বলে চল্ দেখা যাক।"

বললাম, "অনাদি তো আর আমার মতো শুধু ভাব দেখবে না; সে কঠিন সমালোচক, ভাষা ছন্দ ব্যাকরণ অলঙ্কার সব কিছুই দেখবে।"

সুশীল বললে, "চল্ না, এবার কি বলে দেখি। কিন্তু একটা কথা উপীন, এবারও যদি কেটে কুটে একশা করে, তা হ'লে ওকে আর কখনো কবিতা দেখাব না।"

বললাম, "এ অভিমান করা কিন্তু তোর অন্যায়। তুই যদি ভুল করিস, তা হ'লে ও বেচারা না কেটে কি করতে পারে, তা বল্?"

দুজনে পাশের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। অনাদি বাইরের বাড়িতেই ছিল, আমাদের দেখে খুব খুশি হ'ল। দেখতে দেখতে আমাদের ত্রিভুজ আড্ডা বেশ জ'মে উঠল।

ক্ষণকাল পরে পকেট থেকে কবিতাটা বার ক'রে সুশীল বললে, "ভাই অনাদি, আজ একটা কবিতা লিখে এনেছি। দেখবি?"

বহুদিন সুশীলের কবিতার উপর কলম না চালিয়ে অনাদি বোধ হয় হস্তকণ্ডূয়ন রোগে কষ্ট পাচ্ছিল। "কই, দেখি!" ব'লে সাগ্রহে

কবিতাটা নিয়ে মনোযোগের সহিত পাঠ করলে—তারপর সুশীলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তেমন সুবিধে করতে পারিস নি।"

সুশীল বললে, "কেন? ভুল আছে না-কি?"

"অনেক।"

"কিসে কিসে অনাদি?"

কবিতাটার উপর দৃষ্টিপাত ক'রে অনাদি বললে, "তিন-চার জায়গায় ছন্দঃপতন হয়েছে, ইডিয়মের ভুল গোটা চারেক আছে, তা ছাড়া একটা লাইন একেবারে বাঙালীর ইংরেজী হয়েছে, যা বলতে চাস তা মোটেই বোঝাতে পারিস নি।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সুশীল বললে, "জায়গাগুলো একটু দাগিয়ে দিবি ভাই?"

প্রশান্ত মুখে "দিই" ব'লে অনাদি লাল কালির দোয়াত খুললে। জমিদারের বাড়ি, প্রতি দোয়াতদানে কালো কালি ও লাল কালির ব্যবস্থা। তারপর মিনিট পাঁচেক প'রে সেই দোয়াতে কলম চুবিয়ে চুবিয়ে কবিতাটা ক্ষতবিক্ষত ক'রে সুশীলের হাতে অর্পণ করলে।

ততক্ষণে সুশীলের চোয়াল-ভাঙা কঠোর মুখে একটা নিঃশব্দ নির্মম হাসি জ'মে উঠেছিল। অনাদির প্রতি সেই মুখ স্থাপিত ক'রে শান্ত অথচ কঠিন স্বরে সে বললে, "একটা কথা শুনবি অনাদি?"

সুশীলের মুখে সঙ্কটের লক্ষণ উপলব্ধি ক'রে অনাদি ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"এ কবিতা আমার লেখা নয়।"

"তবে কার? উপীনের?" বিপদ দেখে অনাদি হালে পানি পাবার চেষ্টা করছিল।

সুশীল বললে, "না, উপীনেরও নয়। আমাদের ভারতবর্ষের কোনো কবিরই নয়।"

স্খলিত কণ্ঠে অনাদি জিজ্ঞাসা করলে, "তবে ?"

"ইংরেজ কবি শেলীর।"

সর্বনাশ!

ততক্ষণে অনাদি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। পকেট থেকে একখানা বই বার ক'রে সুশীল বললে, "শেলীর কবিতাটা নিয়ে এসেছি অনাদি। মিলিয়ে দেখবি ?"

প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে অনাদি বললে, "খুলে রাখ। আসছি এখনি।"

সুশীল বললে, "খুলতে আর কতক্ষণ যাবে। মিলিয়েই নে না।"

অন্দরের দিকে যেতে যেতে অনাদি বললে, "কি আশ্চর্য! তাড়া আছে। বোস্ না, আসছি।"

অনাদি অদৃশ্য হ'লে সুশীলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, 'তুই কিন্তু ভারি নিষ্ঠুর সুশীল।'

ঈষৎ অনুতপ্ত কণ্ঠে সুশীল বললে, 'কি করি বল ? যা লিখে আনি, তাই কেটে-কুটে একাকার ক'রে দেয়। মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে এই ফন্দি খাটালাম।

বললাম, "তাই ব'লে এমন নিষ্ঠুর ফাঁদে মানুষে মানুষকে ফেলে। সে যা হবার হয়েছে,—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্যে আর ব'সে থেকে কাজ নেই। চল্, পালাই।"

বইখানা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে সুশীল বললে, "চল্ "

দুজনে ধীরে ধীরে স'রে পড়লাম।

এই ঘটনা অবলম্বন ক'রে বহুদিন পূর্বে একটা ছোট গল্প লিখেছিলাম।

বারোয়ারিতলার যাত্রার আসর ত্যাগ ক'রে সুশীলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে মানিক সরকার রোড দিয়ে বাড়ির দিকে চলেছিলাম। নিস্তব্ধ জনহীন পথ, অনাবিল জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দিক ফুটফুট করছে।

বাড়ির সম্মুখে উভয়ে যখন উপস্থিত হলাম, তখন রাত্রি সাড়ে দশটার কাছাকাছি হবে।

দ্বারপাশের সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালের উপর ব'সে প'ড়ে সুশীল বললে, "কি রে, সঙ্গে যাব না কি? ভয় করবে না তো?"

তখনকার আমাদের ভাগলপুরের বাড়ি সাবেক চালের বড় পরিবারের উপযুক্ত বৃহৎ বাড়ি। সবশুদ্ধ চারটে মহল, তার মধ্যে অন্দর মহল সবশেষে অবস্থিত। ভয় পাবার জৈব ও অজৈব কারণ সম্বন্ধে সমস্ত বাড়িটার, বিশেষত অন্দর মহলের, এমন একটু গঠন আছে যে, রাত্রিকালে একাকী ঐ নির্জন পুরীর অঙ্গনগুলি অতিক্রম করবার কালে ভয় যদি একান্তই একটু করে তা হ'লে খুব বেশি অপরাধী করা চলে না। তাও যদি অন্ধকার রাত হ'ত তো কথা ছিল। আলো-ছায়াখচিত জ্যোৎস্নালোকের মায়াপাশের ন্যায় ভয়ের আশ্রয় আর দ্বিতীয় কিছু নেই।

কিন্তু প্রতিষ্ঠাহানির ভয়ে মনের এ সকল গোপন কথা মনের মধ্যেই চেপে রেখে বললাম, "ভয় আবার কিসের? তুই এখানে ব'স্—আমি আসছি।"

বৃহৎ সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সজোরে কড়া নাড়তে একজন দ্বারবাসী এসে দ্বার খুলে দিলে। বিলম্ব না ক'রে লঘু দ্রুত গতিতে এক এক তিনটি অঙ্গন পার হ'য়ে অন্দর মহলে উপস্থিত হলাম।

সিমেন্ট-বাঁধানো উঠান, তার এক প্রান্তে হাতখানেক উঁচু প্রশস্ত বারান্দা, বকের কোলে বন্ধ দালান। দালানের ভিতরে এক প্রান্তে দোতলা পর্যন্ত সিঁড়ি উঠে গেছে। দ্বিতলের ঘরে অসুস্থ পিতাঠাকুর মহাশয় খুব সম্ভব নিদ্রিত আছেন। নীচে দালানের ভিতর পিতাঠাকুরের পুরাতন প্রৌঢ় ভৃত্য সরধারী নিদ্রা দিচ্ছে।

বাইরে দরজার কাছে বকের উপর দাঁড়িয়ে তার প্রমাণ পেতে

লাগলাম প্রশান্ত গভীর নাসিকাধ্বনির একটানা ছন্দে। সারাদিন খেটে-খুটে পাকা আধ সের চালের ভাত এবং তদুপযুক্ত অড়হর দাল উদরসাৎ ক'রে কায়েমীভাবে সে শয্যা গ্রহণ করেছে। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ডাকাডাকি ক'রে তার ঘুম ভাঙানো সহজ হবে না, তা বুঝতে পারলাম; কিন্তু উপায়ও তো নেই। ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত ক'রে যথাসম্ভব মৃদুস্বরে ডাকতে লাগলাম, সরধারী! সরধারী! সরধারী! সরধারী!

কান খাড়া ক'রে লক্ষ্য করলাম, সরধারীর লয়বিশুদ্ধ নাসিকাধ্বনির মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পারি নি। সেই সরর্-সর্-সরর্-সর্-সরর্-সর্ ছন্দ অবিকল পূর্বের একটানা ভঙ্গিতে চলেছে। সে ভঙ্গির মধ্যে অব্যাহত পরিতৃপ্তির প্রগাঢ়তা। স্পষ্টই বোঝা গেল, মনের যে গভীর গহনে সরধারীর চৈতন্য বিলুপ্ত হয়েছে, অত সহজে সেখানে তাকে জাগানো সম্ভব নয়। আর একটু মাত্রা চড়িয়ে ডাকতে লাগলাম, সরধারী! সরধারী! সরধারী! সরধারী!

সরধারীর মধ্যে কোনো সাড়া দেখা দিয়েছে কি-না জানবার জন্য পুনরায় কান খাড়া করলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার! পিছন দিকে উঠানের উপর শুকনো পাতার ডাল কে টানে? ফিরে দেখে কাঠ হ'য়ে গেলাম। শুকনো পাতার ডাল কোথায়? এক বৃহদাকার ভীষণ খয়ে-গোখরো উঠানের শীতল সিমেন্টের উপর দশ বারো হাত স্থান জুড়ে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে, আর খোলস ছাড়বার অব্যবহিত পূর্বের তার দেহের শুষ্ক শিথিল আঁসের শ্রেণী শব্দ ছাড়ছে খস্ খস্ খস্ খস। আকারে যতই বৃহৎ হোক এবং দেহের আঁষ যতই শিথিল ও শুষ্ক হ'য়ে যাক, সাপ যে কোনো অবস্থায় এমন শব্দ ছাড়তে পারে, এ কথা আমি পূর্বে স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। চোখ বুজে শুনলে

নিশ্চয়ই মনে হবে, কঠিন ভূমির উপর দিয়ে কেউ শুকনো পাতার ডাল টানছে।

কিন্তু সে যাই হোক, এ নিদারুণ বিপদে থেকে উদ্ধার লাভ করি কোন্ উপায়ে? হুদ্দাড় ক'রে এঁকে-বেঁকে ছুটে যে পালাব, তার উপায় নেই। চার দিকের মধ্যে তিন দিকে কঠিন দেওয়ালের অবরোধ; একমাত্র যে দিক মুক্ত, ঘটনাক্রমে সেটা দক্ষিণ দিকই বটে, আর সে দিকের দিক্‌পাল সাক্ষাৎ যম সাপের মূর্তি গ্রহণ ক'রে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেদিক দিয়ে যদি পালাবার চেষ্টা করি, তা হ'লে বিষাক্ত দন্তে আর নিরুপায় দেহে যে মারাত্মক সংঘর্ষ বাধবে, তার চিন্তা পর্যন্ত ভয়াবহ।

ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকার অথবা দোরে সজোরে ধাক্কা মারার শব্দে আমার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় ভীত এবং ক্রুদ্ধ হ'য়ে সাপ যদি তীরবেগে ছুটে এসে একেবারে মাথার ওপরে ছোবল বসায়, তা হ'লে একমাত্র মারা যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার থাকবে না। এবার আর কোনো শশীবাবুর মায়েরই দেখা পাওয়া যাবে না। জীবনে শশীবাবুর মা একবারই দেখা দেন।

সুতরাং নিরুপায় অবস্থায় পাথরের মূর্তির মতো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে শোচনীয় পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সময় যেন আর কাটে না। সেকেণ্ড মিনিটে পরিণত হয়েছে, মিনিট ঘণ্টায়। বিপদের প্রাথমিক বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে ক্রমশ আত্মরক্ষার একটা প্রবল বাসনা এবং চেষ্টা জেগে উঠছিল। একান্তই মরতে যদি হয়, সহজে মরা হবে না। যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে যদি যায় তো বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু আক্রমণই যদি করে, তা হ'লে বেশ খানিকটা লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি ছুটোছুটি লুটোপুটি ক'রে অগত্যা আত্মসমর্পণ করতে হবে,

এবং সে আত্মসমর্পণের পরও দাঁতে আর হাতে এমন একটা সাংঘাতিক লড়াই চালাতে হবে যে, কে আগে মরে, আর কে পরে, সেটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে।

স্তব্ধ হ'যে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত বিষধরের অপরূপ মূর্তি দেখছিলাম। কি ভীষণ, অথচ কি সুন্দর। দুঃসহ গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বিবর থেকে নির্গত হ'য়ে এসে সমস্ত দেহ ভ'রে সে সুশীতল সিমেণ্টের শৈত্য গ্রহণ করছিল। কিছুতেই তার আশ মিটছিল না। লীলায়িত বক্রগতিতে সাপ সামনের দিকে এগিয়ে চলে, এতদিন তাই জানতাম, অবস্থাবিশেষে সে যে আবার লাঠির মতো সোজা হ'য়ে ডাইনে বাঁয়ে আন্দোলিত হ'তে পারে, আজ তা প্রথম দেখলাম।

আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা যাতে বিলম্বিত না হ'তে পারে, সেইজন্য সর্পের গতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'ল, সে যেন মুখ তুলে ঈষৎ ফণা দুলিয়ে তীক্ষ্ণনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনেও হওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে রক্ত যেন জল হ'তে আরম্ভ করা। মনে হ'ল, চরম মুহূর্ত এবার নির্ঘাত ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু কি কারণে বলতে পারি নে, পর মুহূর্তেই সর্পরাজ মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে তার সুনিশ্চিত গতি প্রবর্তিত করলেন। আশার কিরণে মন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। সাপ চলেছে উঠানের উপর দিয়ে নীচে নীচে, আমি চললাম সন্তর্পণে ইঞ্চি দশেক উপর দিয়ে পিছনে পিছনে। শেষে একেবারে পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হ'য়ে যে মুহূর্তে দেখলাম পুরাতন মাটকোঠার ভগ্নস্তূপ লক্ষ্য ক'রে সাপ সিঁড়ির উপর মুখ ফেলেছে, অমনি অগ্র-পশ্চাৎ কোনো কিছু বিবেচনা না ক'রে, বোধ করি সাপের দেহের উপর দিয়েই একটি পরিচ্ছন্ন লাফ মেরে উঠানে প'ড়ে একেবারে দুদ্দাড় ক'রে ছুট দিলাম যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে। সাপ আমাকে তাড়া

করেছে অথবা নিজের গন্তব্য পথেই অগ্রসর হচ্ছে, দেখবার জন্যে পিছন ফিরে তাকিয়ে দুর্লভ সময়ের এক মুহূর্তও নষ্ট করলাম না। উঠি তো পড়ি ক'রে ছুটতে ছুটতে তিনটি অঙ্গন অতিক্রম ক'রে সুশীলের সামনে এসে যখন ব'সে পড়লাম, তখন সুশীল মৃদুস্বরে গান গাচ্ছে,—বোধ হয় অচিরে লেমনেড পান করবার কল্পনারই আনন্দে।

আমাকে ওরূপ উত্তেজিত অবস্থায় আসতে দেখে সুশীল বললে, "কি রে? ভয় পেয়েছিস না-কি?"

তখন কথা কইবার শক্তি ছিল না, হাত নেড়ে সুশীলকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত ক'রে দম সামলাতে লাগলাম।

লেমনেড পানের প্রস্তাব তুলে আমাকে অমন বিপদে ফেলেছিল ব'লে সেদিন সুশীলকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছিলাম, কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ ক'রে সামলে ওঠার পরই মনে মনে তাকে ধন্যবাদও দিয়েছিলাম যথেষ্ট। ভাগ্যে প্রস্তাব তুলেছিল! নচেৎ সেদিনকার অমন ভীষণ ও সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে জীবন নিঃসন্দেহ খানিকটা দীনতর হ'য়ে থাকত।

আশঙ্কার দিক দিয়ে পূর্ণিয়ার সর্প দংশনের ঘটনা নিশ্চয়ই বড; কিন্তু মনকে উত্তেজিত ও সমৃদ্ধ করবার দিক দিয়ে ভাগলপুরের সর্প দর্শনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি মূল্যবান। বিশেষত সাপ যখন মুখ উঁচু ক'রে ফণা তুলে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেছিল, সে মুহূর্তের তো তুলনাই হয় না।

———